এই লেখকের লেখা

ছোট গল্প
অগ্নি অবন্ধনে, কী মায়া, গল্প শুধু গল্প

●

ভ্রমণের গল্প
সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে

●

ভ্রমণ কাহিনী
রূপমতীর দেশে, কানাড়া দেখা হল না, তীর্থ পরিচয়

●

ভ্রমণ সঙ্কলন
শ্রীসুষমা চক্রবর্তীর সহযোগিতায়
শতবর্ষের পথযাত্রা

●

ভ্রমণ উপন্যাস
মণিপদ্ম, তুঙ্গভদ্রা, আরও আলো, কুটিল কুমায়ুন, কাশ্মীরী বাহার,
অন্য এক দেশ, আশ্চর্য আরাবল্লী, মানস সরোবরের পথে (যন্ত্রস্থ)

●

উপন্যাস
রূপম ?, সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কল্কিরুবাচ,
আয় চাঁদ, তারার আলোর প্রদীপখানি, বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন মন,
তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম, একটি নাটক নিয়ে,
বিনিময়, তিনজন নায়িকা (যন্ত্রস্থ) খ্যাবাখ, বেদের একটি কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

●

ছোটদের জন্য ভ্রমণ কাহিনী
আমাদের দেশ
উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহিসুর ও তামিলনাড়ু

●

শাশ্বত ভারত
দেবতার কথা, ঋষির কথা, অসুরের কথা, উপদেবতার কথা ও তীর্থের কথা

●

রম্যাণি বীক্ষ্য
অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাট, কালিন্দী, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র,
কোঙ্কণ, অবন্তী, উৎকল, মগধ, কোশল, হিমাচল, কাশ্মীর, কামরূপ, গৌড়,
ভাগীরথী, হিমালয়, মরুভারত, প্রাচী, কিষ্কিন্ধ্যা ও অরণ্য পর্ব

●

কোথায় ঈশ্বর
বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কল্কিপুরাণ, শ্রীমদভাগবত ও দেবীভাগবত

পুরাভারতী

কালিন্দী পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA :
Kalindi Parva
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত উষাকুমার দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মাস্টারমশাই,

হাতের লেখার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখাও শিখিয়েছিলেন। এই সত্যটুকু প্রকাশ করে দিয়ে আজ আনন্দ পাচ্ছি।

স্নেহধন্য

সুবোধকুমার

অন্তায় বহুবাদিনম্ অনন্তায় মূকম্ ।

যজুর্বেদ, ৩০।২৯

For the finite eloquent man,

For the infinite the mute.

Yajurveda. 30-29.
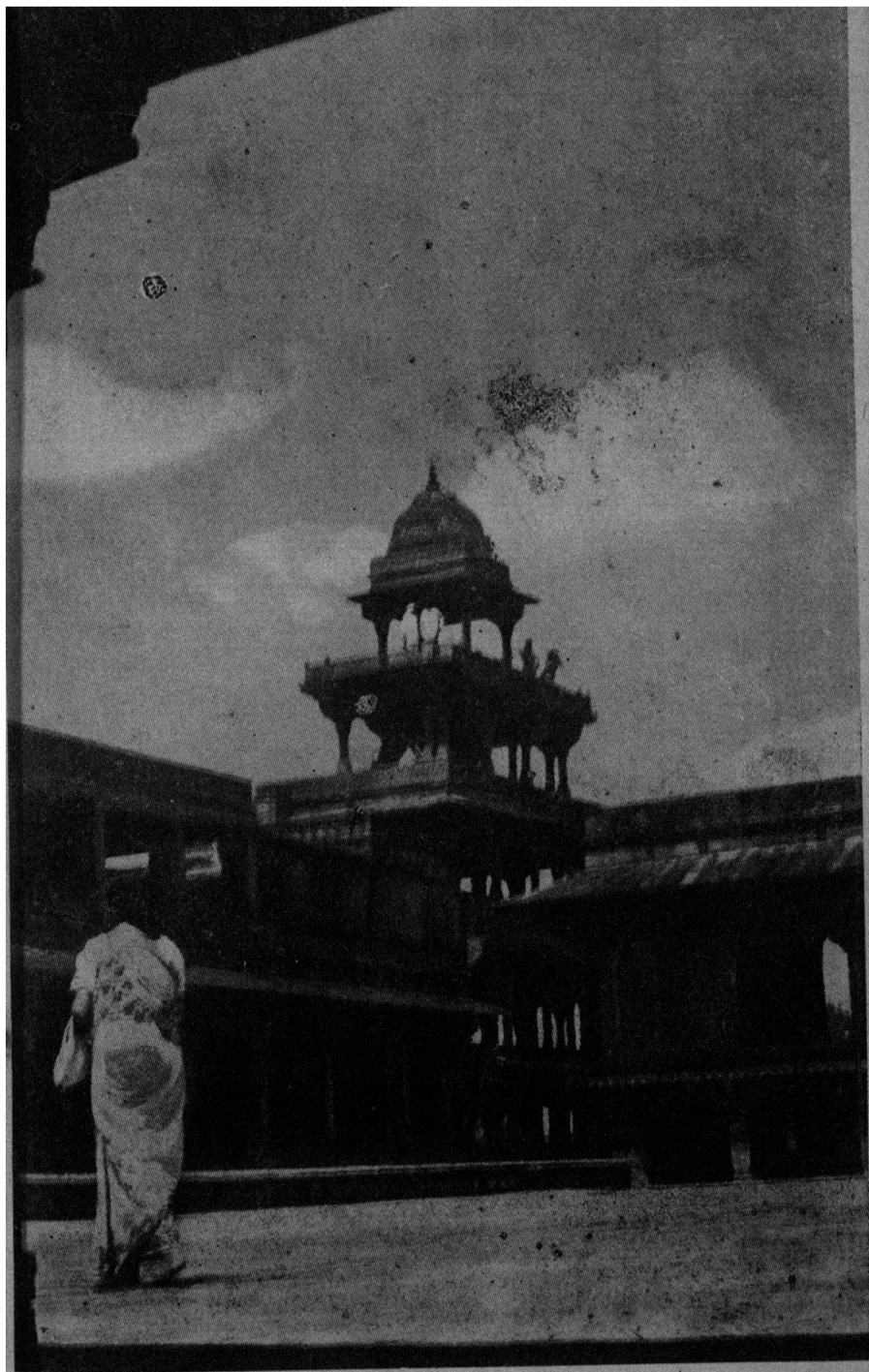
ফতেপুর সিক্রি
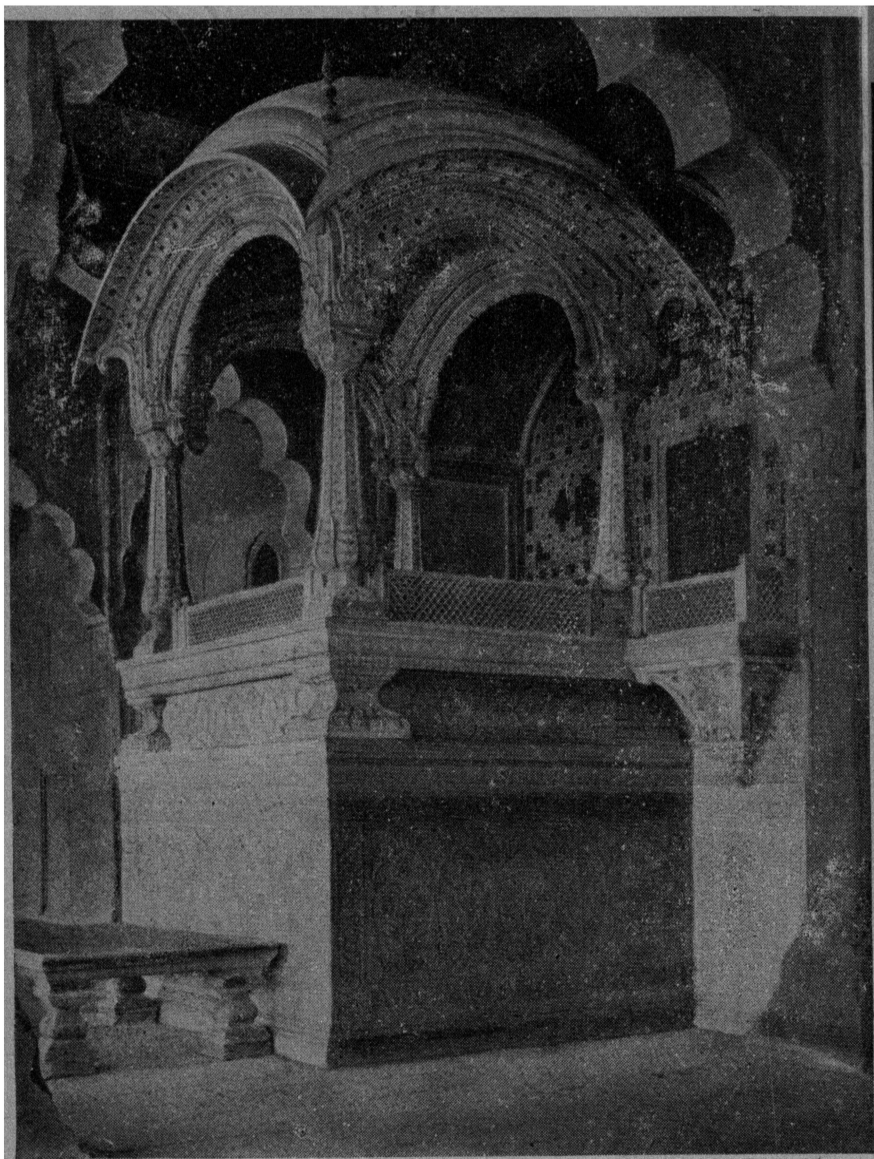
দিল্লীর লাল কিলার ভিতরে দেওয়ান-ই-আম
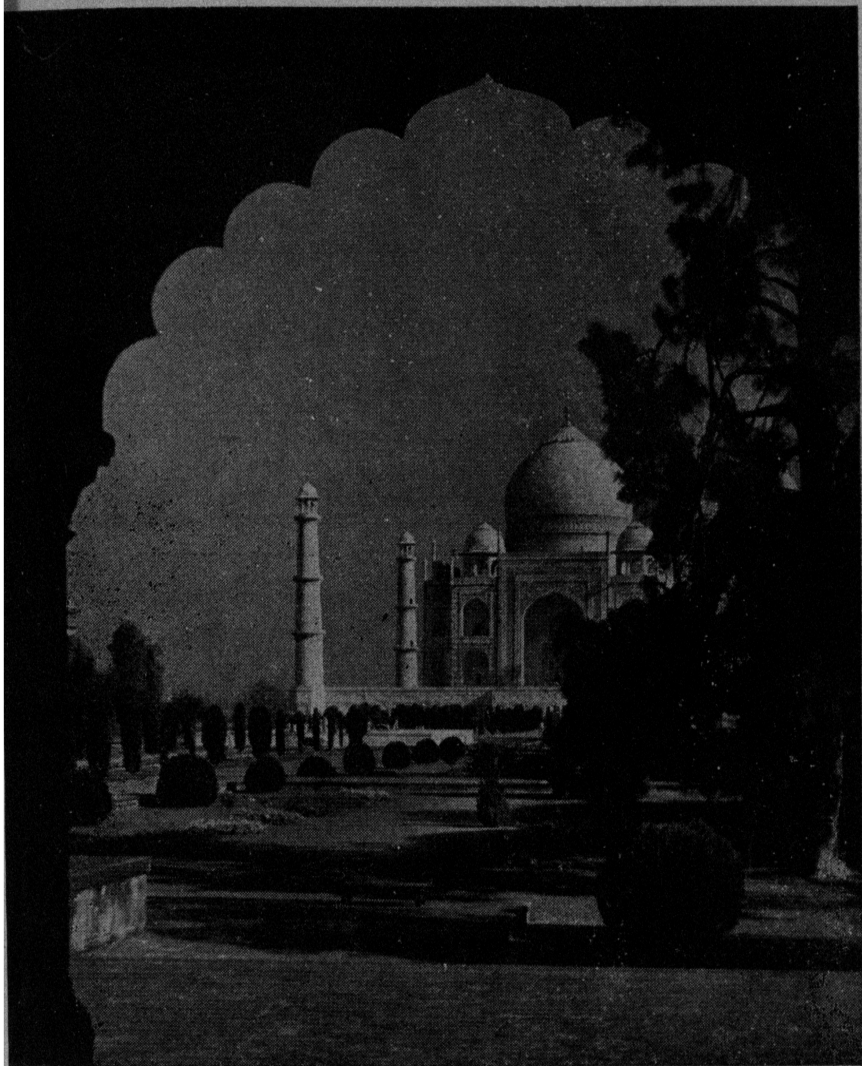
আগ্রার তাজমহল　　　　ফটো : প্রদ্যোৎ চৌধুরী
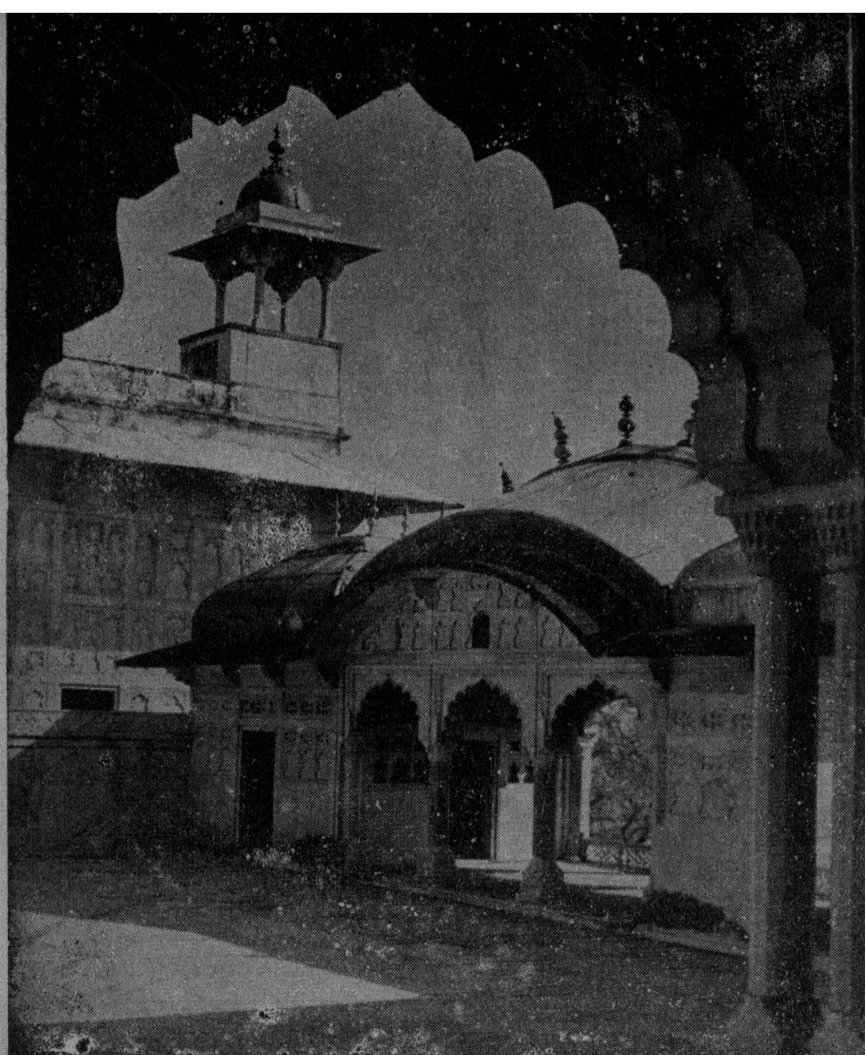
আগ্রার দুর্গ—ভিতরের দৃশ্য ফটো : প্রদ্যোৎ চৌধুরী
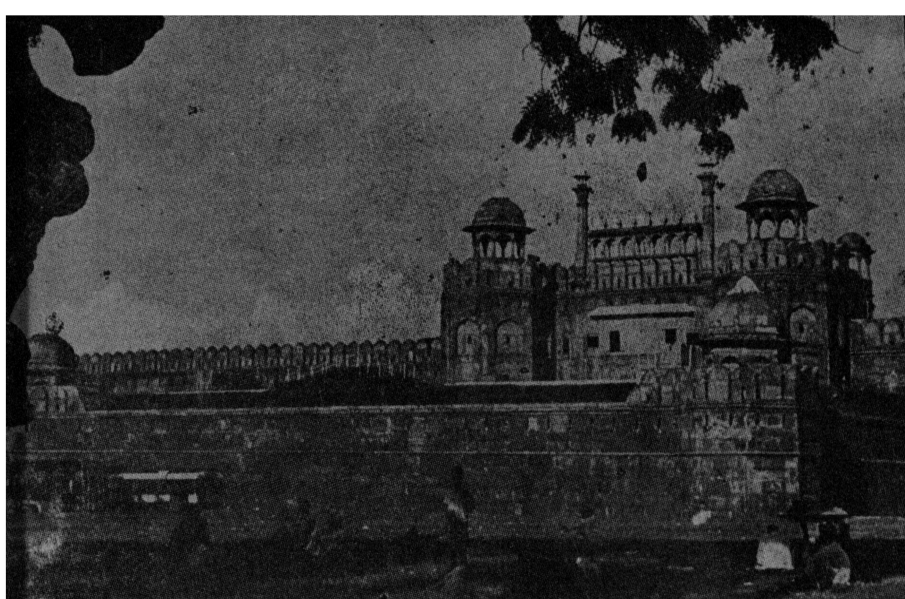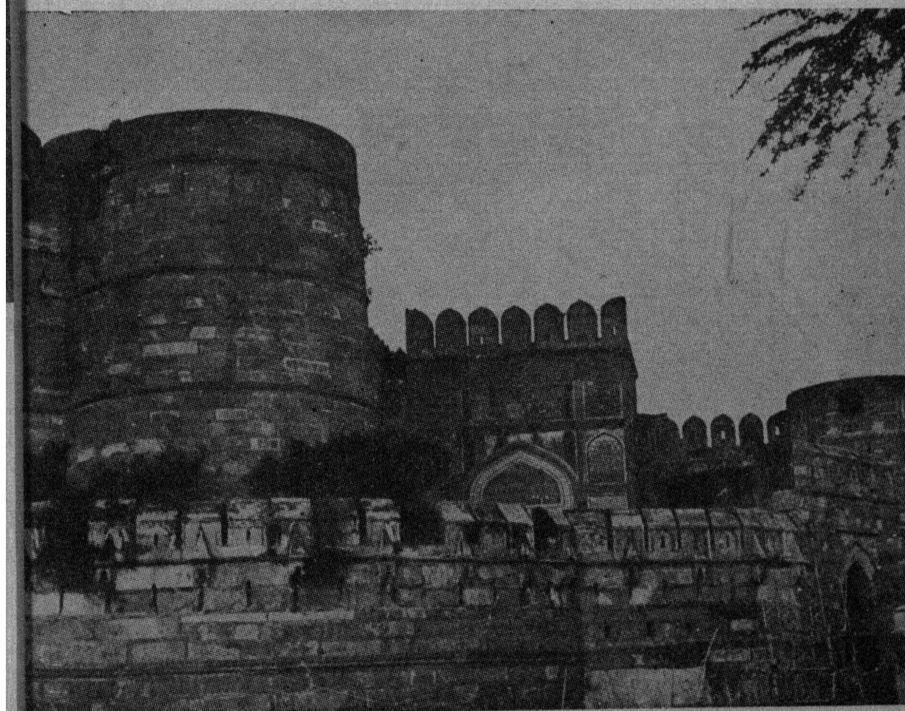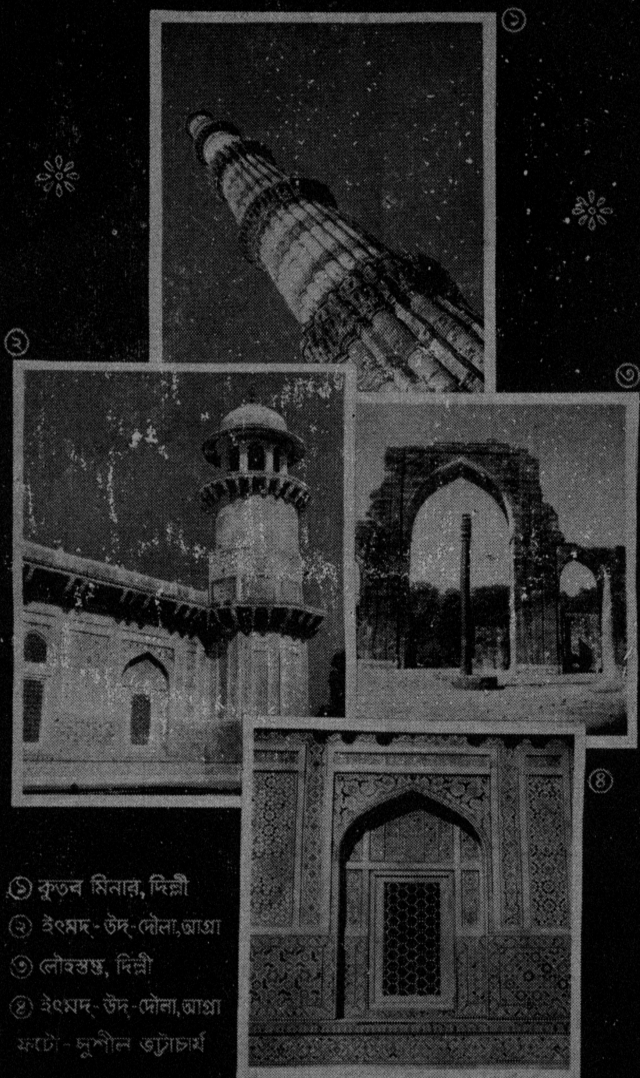
(উপরে) দিল্লীর লাল কিলা

(নিচে) আগ্রার দুর্গ

দিল্লী—আগ্রা   ফটো : সুশীল ভট্টাচার্য
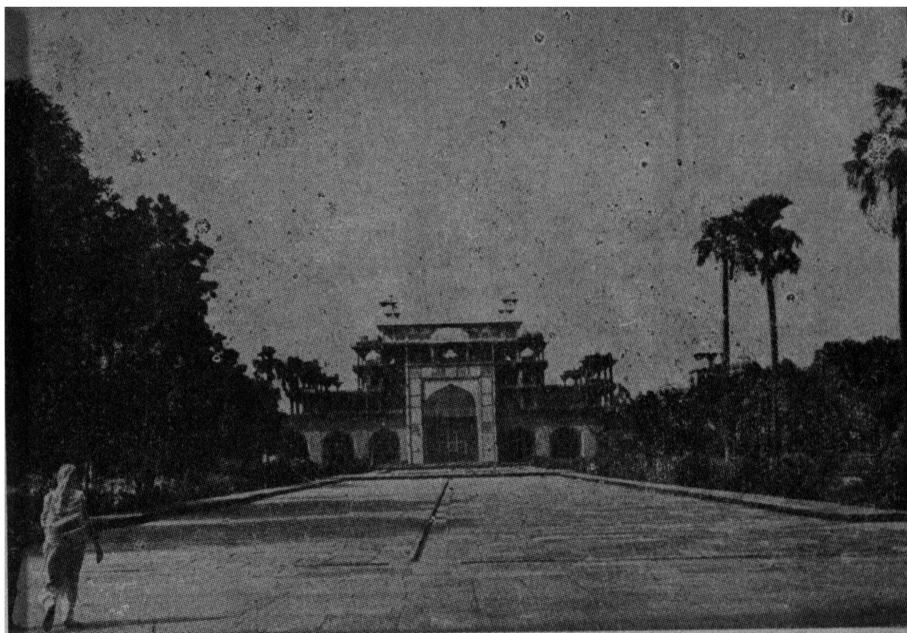
(উপরে) আকবর বাদশাহর সমাধি, সিকান্দ্রা
(নিচে) মথুরায় যমুনার ঘাট

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির

১
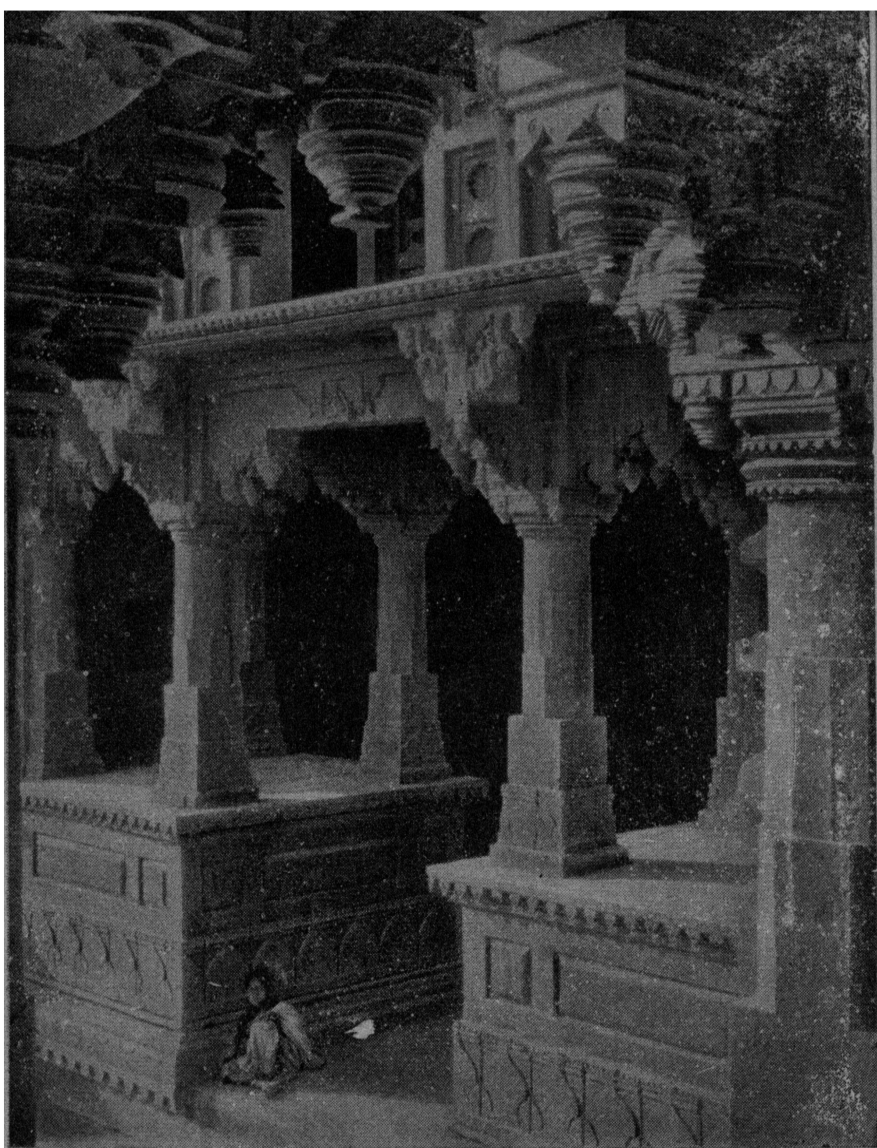
যমুনার তীরে দিল্লী শহর। কিন্তু তুফান এক্সপ্রেসে নতুন দিল্লী ছেড়ে যমুনার পুল দেখতে পেলুম না।

দিল্লীতেও যমুনা দেখেছিলুম। ফিরোজ শাহ কোটলায় অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে। দূরের সেই জলস্রোতের নামেই ভয়ে শিহরে উঠেছিলুম। মামা তার আগেই আমাদের যমুনার গল্প বলেছিলেন: যমুনাকে ফাঁকি দিয়েই তো জ্ঞানশঙ্করের আজ এমন দুর্গতি।

ফাঁকি দিয়েছেন যমুনাকে!

আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম।

দিয়েছেই তো!

বলতে বলতে খোলা মাঠের মধ্যে মামা নেমে এসেছিলেন।

আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে নেমে এলুম। একটা চমকপ্রদ গল্প শোনবার আশায় সবাই তাঁকে ঘিরে বসলুম।

শিরশিরে হাওয়ায় বাউলির জল তখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমার বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। জ্ঞানশঙ্করবাবুর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে যে হঠাৎ জড়িয়ে ফেলেছি, সেই কথাটাই তখন মনে পড়ে গেল।

রবিবারের সকালে আমরা দিল্লী ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। আমরা মানে রায় সাহেব অঘোর গোস্বামী এম. পি., বাঙলা দেশের জমিদার, মিসেস গোস্বামী আর তাঁদের মেয়ে স্বাতি। সঙ্গে আছে দিল্লীর ছেলে রাণা, কমার্স মিনিস্ট্রির নতুন অফিসার, আর তার বোন মিত্রা। কলকাতা থেকে আমি এসেছিলুম এলাহাবাদে, এখানে বেড়াতে এসেছি। রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবু মামা। এঁদেরই নিমন্ত্রণে এসেছি বলে অন্যত্র উঠি নি।

কিছু দিন থেকে পার্লামেন্টের সেসন চলছে। কাল কী একটা ছুটি। তাই নিজের গাড়ি এনে রাণা আমাদের শহর দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। রয়ে বসে ধীরে সুস্থে দিল্লী দেখব। রাণার সঙ্গে আছে এক গোছা কাগজপত্র ম্যাপ গাইড বই, এক খণ্ড 'দৃষ্টিপাত' পর্যন্ত। এই বাউলির ধারে মাটিতে বসে চা খেতে খেতে আমাদের প্রোগ্রাম তৈরি হবে।

মামা বললেন: যমুনা তো গঙ্গা নয় যে সারা জীবন পাপ কাজ করে মরণকালে গঙ্গাযাত্রা করলেই সশরীরে স্বর্গলাভ হবে। যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা আর যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর।

মামা উত্তেজিত হয়ে বললেন: কেন আজ তার বংশ লোপ পাচ্ছে? গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে জন্মেই মারা গেল, সন্তানই হল না দ্বিতীয় পক্ষের। ভাইএর ছেলে পোষ্য নিল, সে বাঁচল না। উপযুক্ত সংসারী ছেলে আনল বোনের কাছে চেয়ে। অসুখ নেই বিসুখ নেই, টুপ করে এক দিন সেও মরে গেল।

আমার দিকে চেয়ে বললেন: এবারে তোমাকে ডেকেছে। তাই গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।

মামী তাঁর ফ্লাস্ক্ আর খাবারের জায়গাগুলো চাকরের হাত থেকে সংগ্রহ করছিলেন, আর রাণা সুযোগ খুঁজছিল তার মানচিত্র খোলবার। এঁদের উপেক্ষা করেই মামা তাঁর গল্প শুরু করলেন।

তাঁদের যৌবনের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখতে বেরিয়েছিলেন দুই বন্ধুতে। তিনি আর জ্ঞানশঙ্করবাবু। কলকাতা থেকে এলাহাবাদে এলেন বন্ধুর কাছে, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে দেরাদুন। তারপর মসুরী।

আমার কাছে হিমালয় এক বিরাট বিস্ময়। দূর থেকে আমাকে টানে, কিন্তু পয়সার অভাব হয় প্রতিবন্ধক। তাই এতদিন শখ মিটিয়েছি

ভ্রমণকাহিনী পড়ে। বললুম ঃ সে সব কথা কি আপনার আজও মনে আছে ?

মামা তাঁর স্মৃতিশক্তির গর্ব করেন। বললেন ঃ আছে বৈ কি! আজকের আনন্দ লোকে কাল ভুলে যায়, গভীর দুঃখও ভোলে মানুষে। তবে তার জন্যে সময় লাগে। কিন্তু হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন, জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। ভগবান কোথায় ? কে দেখেছে ভগবান ? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! এখানে ত্যাগ কোথায় ? প্রাণ ভরে এখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

মনসা হিমালয়ং গচ্ছতি—ব্যাকরণের উদাহরণ মুখস্থ করেছিলুম ছেলেবেলায়। আজ মামার দৃষ্টিতে সেই সত্য উপলব্ধি করলুম। মনে হল যে তিনি আবার তাঁর যৌবনে ফিরে গেছেন। পিঠে ঝোলাঝুলি, হাতে লাঠি নিয়ে পাহাড় ভাঙতে শুরু করেছেন যমুনার উৎস সন্ধানে।

সে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মসুরী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধরাসু গ্রাম ভাগীরথীর তীরে। লোকে আজকাল ঋষিকেশ থেকেই বাসে চেপে এইখানে আসছে। মূলধারা নামে আর একটি ধারা এসে মিলেছে সেখানে। কী অবিরাম তরঙ্গভঙ্গ, কী গভীর কল্লোচ্ছ্বাস! মানুষে মন্দিরে, নদীতে সঙ্গমে, পাহাড়ে পাইনে মায়ায় আচ্ছন্ন একটি সুন্দর গ্রাম।

যমুনার দেখা পাওয়া যায় আরও পঁচিশ মাইল উত্তরে হেঁটে, গাঙ্গনানিতে। এই শস্যশ্যামল গ্রামখানি ঠিক যমুনার তীরেই। গাড়োয়াল রাজ্যের স্ত্রীপুরুষ কুৎসিত নয়, কিন্তু এমন রূপ বুঝি এ তল্লাটে নেই। এই শ্রী তাদের অন্তরেও খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষকে তারা শ্রদ্ধা করে, অতিথিকে ভাবে নারায়ণ।

যমুনোত্রী এখান থেকে মাইল চব্বিশেক দূরে। শুনেছি, এ পথেও বাস এগিয়েছে। চার মাইল পথ বাকি থাকতে খরশালি গ্রামে তখন রাত্রিবাসের বিধি ছিল। যমুনোত্রীর প্রচণ্ড শীতে রাত্রিবাস অসাধ্য বলেই বুঝি এই বিধি। পথে যমুনা পার হতে হয় তুবার। খরস্রোতা যমুনার কলভাষণ এখানে শোনা যায় না, শোনা যায় গর্জন। নিচে খাদের ভিতর থেকে তার গর্জন গুমরে গুমরে উপরে উঠে আসে। বেশ বর্ধিষ্ণু এই খরশালি গ্রাম। দোকানে বাড়িতে মন্দিরে ধর্মশালায়, সহায় ও পাণ্ডাতে সারাক্ষণ গমগম করছে।

এর পরের পথটুকু বুঝি স্বর্গের সিঁড়ি। সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চার মাইল পথ মনে হবে চারশো মাইল। কী কঠিন চড়াই, মানুষকে মনে হবে পিঁপড়ের মতো পথ বেয়ে চলেছে। আর শেষ পর্যন্ত উঠেই কি পথের শেষ হয়! যমুনা বয়ে যাচ্ছে অনেক নিচে খাদের ভিতর দিয়ে। সেইখানে মন্দির আর ধর্মশালা। পথহীন পাহাড় ভেঙে যমুনার তীরে নেমে দেখা গেল, ধর্মশালায় পৌঁছতে হলে আবার খানিকটা চড়াই ভাঙতে হবে।

সমুদ্রতল থেকে এ স্থান প্রায় এগার হাজার ফুট উপরে। চার পাঁচটি প্রবল ধারায় যমুনা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সেই অপ্রশস্ত ধারাগুলি পেরিয়ে যমুনোত্রীর মন্দির। গল্পের শেষে যেমন তার ক্লাই-ম্যাক্স, তীর্থের শেষে তেমনি মন্দির। ক্লাইম্যাক্স জানবার জন্যে আমরা গল্প পড়ি, তেমনি মন্দিরে পৌঁছতে ভাঙি দুস্তর পথ নদী ও পর্বত। সত্যিকার রসিক যে, তার অন্য দৃষ্টি। শেষের পরেও সে আরও কিছু চায়। যমুনোত্রী পৌঁছেও মনে হবে, সবই যেন বাকি রয়ে গেল। মন্দিরের পিছনে ঐ যে চিরতুষারের রাজ্য, ঐশ্বর্য লুকানো আছে তারই দুর্গমতার ভেতর। মনে হবে, এখান থেকে ফিরে গেলে সে হবে একটা মস্ত পরাজয়।

মামা বলে যাচ্ছিলেন: যারা তীর্থলোভী, তারা পূজো পাঠ শেষ করে বেলাবেলি খরশালিতে ফিরে যায়। কিন্তু আমরা রয়ে গেলুম।

মন্দিরের পূজারীর কাছে আশ্বাস পেয়েছিলুম আশ্রয়ের। অল্প নিচে একটা গুহার ভেতরে তিনি থাকেন। তার তলা দিয়ে পাঁচ ছটি উষ্ণ জলের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই শীতের রাজ্যে পূজারীর গৃহকে বাসের উপযোগী করে যমুনার ধারার সঙ্গে তারা মিলিত হচ্ছে। আগুনে চাল সিদ্ধ করবার প্রয়োজন এখানে হয় না, কাপড়ে বেঁধে এই কুণ্ডের জলে ফেলে দিলেই তা ভাত হয়ে ভেসে ওঠে।

উত্তরে বরফের যে বিপুল বিস্তার, যমুনার ধারা তার তলা দিয়ে গলে আসছে। তুষারের উপর দিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে দেখা যায় যে সামনের পাহাড় থেকে নেমেছে তিনটি জলধারা। মহাদেবের ত্রিশূলের মতো তারাই মিলিত হয়ে পায়ের নিচের বরফের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে পাওয়া যায় বন্দর-পুঁছ পর্বতচূড়া, আর তার পাশের চম্পা সরোবর। এই হ্রদেই জন্ম নিয়েছে কালিন্দী যমুনা।

এই পর্বতের নাম বন্দরপুঁছ কেন হল, সে সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলুম। লঙ্কা দহনের পর তাঁর লেজের আগুন নেভাবার জন্যে মহাবীর হনুমান এই পর্বতে ছুটে এসেছিলেন। এখানকার হিমবাহেই তাঁর জ্বালা জুড়িয়েছিল।

মামা বললেন: রাতে আমরা পূজারীর গুহাতেই আশ্রয় পেলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল সারা দিন। এবার পেঁজা তুলোর মতো তুষার পাত শুরু হল। বাইরে নিস্তব্ধ নির্জন পৃথিবী। দেবাদিদেবের ডমরুর মতো যমুনার গর্জন আসছে গুহার ভেতর। আগুন জ্বেলেছেন ভক্ত পূজারী। মনে হল, জগতে বুঝি এমন আরামের বাসস্থান আর নেই।

মামী তখন পেয়ালায় ঢেলে ঢেলে চা এগিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা পেয়ালা হাতে আসতেই মামা যেন জেগে উঠলেন। ঘন ঘন চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললেন: সকালে উঠে জ্ঞানশঙ্কর কী বলেছিল জান?

উত্তর নিজেই দিলেন। বললেন: তার স্বপ্নের কথা বলেছিল

আমাদের। দেখেছিল যমভগিনী যমুনা তার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। দু হাত বাড়িয়ে কিছু চাইছেন তার কাছে। এই স্বপ্নের কথা শুনে অভিভূত হয়েছিলেন সেই গাড়োয়ালি ব্রাহ্মণ পূজারী। বলেছিলেন, প্রয়াগে তোমার বাড়ি। যদি কখনো সন্তান হয়, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে তোমার প্রথম সন্তান উপহার দিও।

আবার খানিকটা চা খেলেন মামা, তারপর বললেন ঃ জ্ঞানশঙ্কর কিছুই দেয় নি আমি জানি। পূজারীর কথা শুনে সেদিন সে হেসেছিল। তার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে আজও সে হাসে। লোকটা নাস্তিক নয়। বেশি পড়াশুনো করে সংস্কারে বিশ্বাস হারিয়েছে।

তারপর বুঝলে গোপাল, মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ বিশ্বাসে যুক্তি নেই, কিন্তু সুখ আছে। গভীর দুঃখের দিনেও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়। ভগবানের প্রয়োজন তাই কোন দিন ফুরবে না।

আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। সংস্কারে বিশ্বাস যদি তাঁর এতই প্রবল, তবে কেন তিনি আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন! জ্ঞানশঙ্করবাবুকে আমার সন্ধান তো তিনি নিজেই দিয়েছেন, নিজেই আমাকে ডেকে এনেছেন কলকাতা থেকে। এক অপরিচিত আত্মীয়ের পোষ্যপুত্র হতে আমি তো তাঁরই আগ্রহে স্বীকৃত হয়েছি। তবে কি—

হয়তো তাই। আমার ঔদ্ধত্যেরই শাস্তি দিচ্ছেন তিনি। আমি তাঁর নকল ভাগনে, তাঁর পাতানো দিদির ছেলে। এক সঙ্গে সমস্ত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে ফিরে এসেও আমি তাঁর অনুগ্রহ নিয়ে বড় হতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? ঐ যে মেয়েটা নিঃশব্দে বসে স্যাণ্ডুইচ চিবোচ্ছে, সে-ই কি আমায় বারণ করে নি? সেদিন সে-ই কি আমায় সাহায্য করে নি মামার প্রলোভনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে? আজ সে-ও কি দূরে সরে দাঁড়িয়েছে!

রাণা তখন তার গাইড বই খুলে বসেছে, আর মিত্রা গল্প শুরু করেছে স্বাতির সঙ্গে। আমার মনে পড়ল কন্যাকুমারীর কথা।

কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাতে সমুদ্রের তটে বড় একখানা পাথরের উপরে বসে ছিলুম। এক সময় অলক্ষিতে স্বাতি আমার পাশে এসে বসেছিল। কথা হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যক। সেদিনের অত জল অত আলো, অমন আকাশ অমন অসীম উদার পরিবেশের ভিতরেও স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। বলেছিল : গোপালদা, একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট কোরো না।

আমি তার উত্তর দিই নি, কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করেছি। মামার জমিদারী গেছে, কিন্তু ব্যবসা আছে। সেই ব্যবসায় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, আমার দশটা-পাঁচটার খাতা লেখা বন্ধ হলে সম্বন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠ করা যেতে পারে।

কিন্তু আমি রাজী হই নি। মামা তাতে শুধু ক্ষুব্ধই হন নি, অপমানিতও বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন : গোপাল, এ তোমার দোষ নয়, তোমার পৈতৃক গুণ। তোমার বাবাও আমায় উপেক্ষা করে-ছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন, তা কোন দিন বলেন নি।

আমি জানি, স্বাতি খুশী হয়েছিল সেদিন। তার চোখের দৃষ্টিতে মনেরও পরিচয় পেয়েছি খানিকটা। খুশিতে সিক্ত একটা মৌন মনের কোমল পরিচয়। মনে হয়েছিল, এমন পাওয়া বুঝি এর আগে কখনও পাই নি।

এবারে দিল্লীতে আমি অন্য এক স্বাতিকে দেখছি। নতুন এক স্বাতি। পুরনো পরিচয়ের কোন বালাই সে সঙ্গে আনে নি, নীরবে থেকে অস্বীকার করছে আমাদের অতীতটাকে। কেন করছে, এই সত্যটুকু জেনে নেবার সুযোগ এখনও পাই নি।

মনে হয়েছিল, তার বিয়েটা ভেঙে গিয়ে সে সুখী হয়েছে। সুখী হবারই কথা। মনে পড়ছে, সে-ই এক দিন আমায় বলেছিল যে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে যে লোক, তাকে সে মানুষ ভাবে না। লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে, মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাহেবি-আনা

এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে সঙ্গিনীর। আর সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব। কেন বিয়েটা ভাঙল, সে খবর আমি জানতে পারি নি।

রাণা তখন বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। খসখস করে কী সব টুকে ফেলেছে তার চামড়ার নোট বুকে। চশমার ফাঁক দিয়ে সেদিকে একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে মিত্রা বলল: দাদার জন্যেই আজ এলুম। কিছুতেই ছাড়ল না। নইলে দিল্লী আমরা একশো আটবার দেখেছি।

স্বাতি জবাব দিল: দিল্লী আমরাও দেখেছি। আর গোপালদা হয়তো না দেখেও আমাদের চেয়ে বেশি জানে।

মিত্রা আড় চোখে আমায় একবার দেখে নিয়েই মৃদু স্বরে একটা বক্রোক্তি করল, বলল: কলকাতার একজন হিরো বলে শুনেছি।

কথাটা আমার কানে যাবে জেনেই যে বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, স্বাতির সাদা কানের ডগা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

মিত্রাদের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র একটি সন্ধ্যার। আমি দিল্লীতে নেমেছিলুম পরশু বিকেলে, আর কাল সন্ধ্যায় এরা বেড়াতে এসেছিল। ব্রিটিশ আমলের দুঁদে সিভিলিয়ান ব্যানার্জি সাহেবের পুত্র কন্যা, রাণা ও মিত্রা। মামার পুরনো পরিচিতও বটে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই বেড়াতে এসেছিল নর্থ অ্যাভেন্যুর সরকারী কোয়ার্টার্সে। মিত্রা খুশী হয় নি, কিন্তু ভাল লেগেছিল রাণার। বলেছিল: দিল্লী দেখেন নি, গোপালবাবু? আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।

বলে তাকিয়েছিল স্বাতির দিকে।

কাল রবিবার, কালই ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন? আমার ছোট গাড়ি, কাল বাবার নতুন গাড়িটাই নিয়ে আসব। সবাই মিলে পা ছড়িয়ে বসলেও অনেক জায়গা থাকবে।

রাণার উৎসাহেই এই দিল্লী দেখার ব্যবস্থা। সে-ই আমাদের গাইড, সে-ই আমাদের গার্ডিয়ান। তার কাজ শেষ হলেই আমাদের উঠতে হবে।

এক সময় হলও তার কাজ শেষ। তারপর পকেটে কলম গুঁজে এক চুমুকে নিঃশেষ করল ঠাণ্ডা চা-টুকু। বলল : এখনও হয় নি আপনাদের ?

কথাটা আমাকেই বলল। আমিই আর একটু চা চেয়ে নিয়েছিলুম মামীর কাছ থেকে। মামী তখন সব গুছিয়ে তুলছিলেন। তাড়াতাড়ি চা-টুকু গলাধঃকরণ করে পেয়ালাটা আমি ফিরিয়ে দিলুম।

ধীরে সুস্থে পাইপ ধরিয়ে মামা উঠবার চেষ্টা করলেন। পিছনে একটা হাত দিয়ে বেশ একটু কসরৎ করেই উঠে দাঁড়ালেন।

তুপুরে বাড়ি ফিরেই খাওয়া যাবে।

বলে মামী জিনিসপত্র সুদ্ধ চাকরকে ছুটি দিলেন।

রাণার সঙ্গে মিত্রা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। স্বাতি ইশারায় আমায় পিছিয়ে পড়তে বলল। তারপর ভর্ৎসনার সুরে বলল : তোমার কি ইজ্জৎ জ্ঞান কোন দিন হবে না গোপালদা ?

আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বল তো ?

ক্ষুব্ধ স্বরে স্বাতি জবাব দিল : তাও আমায় বলে দিতে হবে। তুমি নিজে কিছুই বুঝতে পার না ?

মিত্রার মন্তব্যটুকু যে তার ভাল লাগে নি, তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু তার নেপথ্যের ঘটনা আমার জানা নেই। তাই চুপ করে রইলুম।

স্বাতি তার অনুযোগ আমায় জানিয়ে দিল, বলল : কাল নিজের পরিচয়টা অমন ফলাও করে দেবার কী দরকার ছিল !

দরকার ছিল না মানি, কিন্তু ঐটুকুই তো আমার অহংকার। মিত্রা

আমার পরিচয় চায় নি, কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেই কৌতূহল দেখেছিলুম। তাই নিজেই আমার পরিচয় দিয়েছি—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন,. আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভিতর একখানা কাঠের চেয়ার।

অট্টহাস্য করেছিল দিল্লীর অফিসার রাণা, মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরও একটু ধার দেখেছিলুম যেন।

সকলের পিছনে চলতে চলতে স্বাতি আমায় সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল। নিজের ত্রুটি মেনে নিয়ে বললুম: এবারে কী করতে হবে বল।

কঠিন ভাবে স্বাতি বলল: অন্যের মান নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই, এইটুকুই তোমায় জানিয়ে দিলাম।

বলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল।

২

আমরা যখন এগিয়ে এলুম, রাণা তখন মামা-মামীকে অনেক কিছু শুনিয়ে ফেলেছে। ফিরোজ শাহ কোটলার অশোক স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কাছে আসতেই পাকা গাইডের মতো বক্তৃতা শুরু করল। বলল: এই রকমের অশোক স্তম্ভ ফিরোজ শাহ দিল্লীতে দুটো এনেছিলেন। মীরাট থেকে যেটা আনেন, সেটা আছে সব্জিমণ্ডির কাছে রিজের ওপর। তার গায়ে উৎকীর্ণ লেখা এখন আর ভাল পড়া যায় না। আর এই স্তম্ভটি ফিরোজ শাহ এনেছিলেন আম্বালা জেলার টোপরা থেকে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: টোপরা না খিজিরাবাদ?

রাণা চট করে একখানা বইএর পাতা উল্টে দেখে বলল: খিজিরা-বাদ তো নয়, টোপরাই বলেছে এই বইএ।

তারপর বলল: তিনি এই প্রাসাদ দুর্গ কোটলা নির্মাণ করেন তেরশো চুয়ান্নতে। এর ভেতর স্তম্ভটি কেমন উঁচু করে বসিয়েছেন দেখুন।

চশমার ফাঁক দিয়ে মিত্রা আমায় একবার দেখে নিল। আমি চুপ করে গেলুম।

উঁচু উঁচু ধাপ বেয়ে সাবধানে আমরা উপরে উঠলুম। ব্রাহ্মী অক্ষরে অশোকের অনুশাসন লেখা আছে স্তম্ভের গায়ে। আজ তা পড়ার মতো বিদ্যা আমাদের নেই। ঝির ঝির করে বাতাস আসছিল যমুনার নীল ধারার দিক থেকে, হঠাৎ শিহরে উঠল দেহটা।

রাণা তখন পাশের মসজিদের ভগ্নাবশেষ সবাইকে দেখাচ্ছিল। সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল সকলের দৃষ্টি। শুধু স্বাতি আমায় লক্ষ্য করেছে, আর লক্ষ্য করেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মসজিদের দিকে।

উপর থেকে নেমে আসবার সময় রাণা বলল: সাত রাজার রাজধানী দিল্লী, ফিরোজ শাহ কোটলা তার ভেতর পঞ্চম।

পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সাবধানে সবাই নামছিলেন। একেবারে নিচে নেমে এসে স্বাতি প্রশ্ন করল: প্রথম চারটে রাজধানী কি আরও অনেক পুরনো দিনের?

স্বাতির আগ্রহ দেখে রাণা খুশী হল, বলল: সবই প্রায় সমসাময়িক। প্রথম রাজধানী পৃথ্বীরাজের মেহরৌলিই যা একটু পুরনো, তার সময় হল দ্বাদশ শতাব্দী। এর পর আলা-উদ্-দীন খিলজী সিরিতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে তৃতীয় রাজধানী হল ফিরোজাবাদ। তারপর পাগলা রাজা যে রাজধানী স্থাপন করলেন, তার নাম হল জাহানপন্না।

একটু যেন গোলমেলে ঠেকল আমার, বললুম: হিসেবে একটু ভুল হল না রাণাবাবু? ফিরোজ শাহ তুঘলুকই তো ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এই কোটলা নির্মাণের গৌরব তাঁকেই দিতে হলে ফিরোজাবাদকে দিল্লীর তৃতীয় রাজধানী বলা চলে না।

চলতে চলতে সবাই আমার মুখের দিকে চাইলেন। আরও একটু বুঝিয়ে বললুম আমার কথাটা: ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা যে ফিরোজ শাহ, তাঁরই প্রাসাদ এই কোটলা। কাজেই আপনার হিসেব মতো এই স্থান যদি পঞ্চম রাজধানী হয় তা হলে তৃতীয় রাজধানী ছিল অন্য কোন স্থানে।

এবার রাণা একটু বিচলিত হল। বলল: ঠিকই তো!

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে তার বইএর পাতা উল্টে গেল অনেকগুলো। দৃষ্টিপাত করল খানকয়েক পাতার উপর। তারপর সেখানা বন্ধ করে একখানা ইংরেজী গাইড বই খুলল।

অকপটে রাণা স্বীকার করল: সত্যিই তো, একটু গোলমেলে লাগছে ব্যাপারটা।

বললুম: আমার কী মনে হয় জানেন? আলা-উদ্-দীন খিলজী

ও পাগলা রাজা মুহম্মদ তুঘলুকের মাঝখানে ছিলেন ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলুক, তাঁর রাজধানী তুঘলুকাবাদই দিল্লীর তৃতীয় রাজধানী।

রাণা যেন লাফিয়ে উঠল, বলল: ঠিক বলেছেন আপনি। কুতব মিনার থেকে সূর্যকুণ্ডে যাবার পথে রাস্তার বাঁয়ে সেই তুঘলুকাবাদ। মাইল সাতেক জুড়ে সেই জায়গাটা। শুনেছি সেখানে নাকি ভারি দেয়ালে ঘেরা ছিল রাজপ্রাসাদ আর শয়ে শয়ে বাড়ি আর মসজিদ।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: শেষ তুটো রাজধানীর কথা কিছু বললেন না?

এ কথার জবাব দিল মিত্রা। বাঁ হাতের পুড্‌ল্ কুকুরটাকে ডান হাতে নিয়ে বলল: চলতে ফিরতে তুবেলা সে তুটো দেখতে পাচ্ছি—পুরনো দিল্লী শাহজাহানাবাদ আর আমাদের নতুন দিল্লী।

মিত্রার দৃষ্টিতে সেই দৃপ্ত ভঙ্গিটি আবার দেখতে পেলুম। কাল সন্ধ্যে বেলায় মামার বসবার ঘরে তার এই ভঙ্গিটি প্রথম লক্ষ্য করেছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে মামী তার হাতের কুকুরটা লক্ষ্য করছিলেন। ফর্সা ধবধবে হাতের কব্জির উপর তার চেয়েও ফর্সা একটি জীব। নীল চোখ তুটো মেলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। মামী বলেছিলেন: খাসা বেরালের বাচ্চাটি তো!

মিত্রা হেসেছিল তাঁর কথা শুনে। সেই হাসিতেই তার ঐ ভঙ্গিটি দেখেছিলুম।

এমন কুকুর স্বাতিও বোধ হয় আগে কখনও দেখে নি। কিন্তু বেরাল যে নয়, তা বুঝতে পেরেছিল। লজ্জা পেয়েছিল মায়ের প্রশ্নে। মানুষ অনেক কিছুই জানে না, তার জন্য কারও এতটুকু লজ্জা নেই। কিন্তু আর কেউ যখন সেই অজ্ঞানতা দেখে কৃপা প্রকাশ করে, তখনই আসে লজ্জা। মিত্রার চোখে সেই ভাবটিই বোধ হয় ফুটে উঠেছিল। তাই মামীও লজ্জা পেয়েছিলেন।

আমি বলেছিলুম: ওটা কুকুর মামীমা। চীনা পুড্‌ল্ দেখেছেন,

ওটা পকেট পুড্‌ল্‌।

ওমা, ওটা কুকুর নাকি! খরগোশ গিনিপিগ বললেও যে লোকে বিশ্বাস করবে!

মিত্রা বলল: এ জাত এর চেয়ে বড় হয় না।

বলে ব্লাউসের গলায় তাকে ঝুলিয়ে দিল।

রাণা তখন প্রবল উৎসাহে মামার সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। বলছে: কদিন থেকেই বাবা আসব আসব করছেন, কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে রোজই দেরি হয়ে যায়। যা কাজ! সাহেবরা চলে যাবার পর অফিস একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। এ গভর্নমেণ্ট আর বেশি দিন চলবে না। পুরনো লোক বলতে তাঁরাই কয়েক জন আছেন, তাঁরা অবসর নিলেই অফিস বন্ধ।

পাইপে খানিকটা ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মামা বললেন: তা বটে।

রাণা বলল: আমরা তো নিজের চোখেই এ সব দেখতে পাচ্ছি, বাইরের লোকও আজকাল স্বীকার করছেন।

মামা গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাতে লাগলেন।

রাণা বলল: আমার আর কত দিনের চাকরি বলুন! তবু ভাগ্যি যে ব্রিটিশের শেখানো অফিসার এখনও দু চার জন আছেন, তাঁদের কাছেই কিছু কাজকর্ম শিখতে পাচ্ছি। তাঁরা না থাকলে তো চোখে অন্ধকার দেখতুম।

বলে স্বাতির দিকে তাকাল।

মিত্রার দৃষ্টিতে বুঝি খানিকটা ভর্ৎসনা দেখলুম। তার দাদার বাচালতায় বিরক্ত হয়েছে, এমনি ভাব। রাণা তা লক্ষ্য করেও বিচলিত হল না। আমার দিকে ফিরে বলল: গোপালবাবু কাল এসেছেন, তাই না?

সংক্ষেপে আমি জবাব দিলুম: ঠিক তাই।

কোন্‌ পথে এলেন? মথুরা হয়ে, না আলিগড়ের ওপর দিয়ে?

বললুম: বৃন্দাবন থেকে।

রাণা যেন লাফিয়ে উঠল, বলল : বলেন কি। এই বয়সে বৃন্দাবনে নেমেছিলেন নিজের ইচ্ছেয়!

হেসে বললুম : প্রাণের টানে। দ্বাপরে যেখানে লীলা করেছিলুম, সেই স্থানগুলো আবার দেখে এলুম।

মিত্রা কঠিন দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। বুঝতে না পেরে রাণা বলল : সেকি কথা!

বললুম : আমি যে গোপাল!

সকলের হাসি ছাপিয়ে গেল মামার অট্টহাসি। শুধু মিত্রাকে হাসতে দেখলুম না। সে তার কাঁধ থেকে ঝোলানো চামড়ার থলিটা একবার কোলের উপরে টেনে নিল। একখানা রুমাল বার করে মুছে নিল তার নাকের পাশ ত্বটো।

আমি হাসি নি, তাই অবসর পেলুম তাকে ভাল করে লক্ষ্য করবার। থলির ভিতর রুমালখানা পুরে যখন সকলের দিকে চাইল তখনও সেই ভঙ্গিটি দেখেছিলুম তার কঠিন দৃষ্টিতে।

গাড়িতে বসে মামা বললেন : এবারে গোপাল কিছু বল।

আমি লজ্জা পেয়ে বললুম : রাণাবাবুর মতো পাকা গাইড থাকতে আমি কী বলব বলুন!

মামা অব্যাহতি দিলেন না, বললেন : তোমার কিছু বলবার নেই, এমন হতেই পারে না।

আমি রাণার সঙ্গে সামনে বসেছিলুম। মামা বসেছিলেন পিছনে, মেয়েদের সঙ্গে। ফিরে একবার তাঁর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম। আমার সঙ্গে যে তিনি পরিহাস করছেন না তা জানি, স্বাতির চোখেও খানিকটা আগ্রহ দেখলুম। গাড়ি চালাতে চালাতে রাণাও বলল : কুতব মিনার তো এখান থেকে অনেকটা পথ। বলুন না কিছু!

ভাবতে গিয়ে আমার মন গেল অতীতের দিকে, পৃথ্বীরাজের যুগ ডিঙিয়ে অনঙ্গপালের যুগে, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীতে।

যদুকুলের শাখা তোমর বংশ। সেই বংশের প্রথম অনঙ্গপাল এলেন ইন্দ্রপ্রস্থের পোড়া মাটির দেশে। ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের রাজধানী। একান্ত ভাবে হিন্দুর নগরী। তাঁর উত্তর পুরুষেরা চলে গিয়েছিলেন কনৌজ, কিন্তু দ্বিতীয় অনঙ্গপাল একাদশ শতাব্দীতে আবার দিল্লীতে ফিরে এলেন। এই বংশের রক্ত ছিল পৃথ্বীরাজ চৌহানের দেহে। দিল্লীকে দুর্ভেদ্য করবার জন্য তিনিই নির্মাণ করেছিলেন কিলা রায় পিথোরা। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা তখন হিন্দুর প্রতি বিমুখ হয়েছেন। তাই গাড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেও পৃথ্বীরাজ তাঁর আনুকূল্য পেলেন না। কখন কী কারণে তাঁদের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐতিহাসিকেরা তার কারণ খুঁজে পান নি। শোনা যায়, জয়চন্দ্র তাঁর রাজধানী কনৌজে এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই সভাতেই তাঁর কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা হল। ভারতের সমস্ত রাজা এলেন চার দিক থেকে। নিমন্ত্রণ ছিল না শুধু পৃথ্বীরাজের। জয়চন্দ্র তাঁর পাথরের প্রতিমূর্তি গড়িয়ে দ্বাররক্ষীরূপে স্থাপন করলেন। আর রাজকন্যা সংযুক্তা সেই মূর্তির গলাতেই দিলেন বরমাল্য। ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজ সেইখান থেকেই তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। ভারতের ইতিহাস লিখতে বসে অনেকে আজ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে জয়চন্দ্রের সাহায্য পেলে পৃথ্বীরাজ হয়তো তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধেও শিহাব্-উদ্-দীনকে পরাজিত করতে পারতেন। মুসলমান এক দিন আসত, কিন্তু অত শীঘ্র ভারত পরাধীন হত না।

আমি এই গল্প শোনালুম সবাইকে, শোনালুম যমুনার তীরে ভারতের প্রথম রাজধানীর গল্প, রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। খাণ্ডব বন দাহন করে পঞ্চপাণ্ডব প্রতিষ্ঠা করলেন জগতের শ্রেষ্ঠ নগর ইন্দ্রপ্রস্থ। হুমায়ুন যেখানে নির্মাণ করেছেন তাঁর পুরানা কিলা, সেইখানে ছিল পাণ্ডবদের সভামণ্ডপ। আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশ এমন সভা তৈরি করে নি, স্বপ্নেও ভাবে না তৈরি করার কথা।

মহাভারতের সভা পর্বে এই মণ্ডপের বর্ণনা আছে। পাঁচ হাজার হাত বিস্তৃত সভার চারি দিকে ছিল বহুলচিত্রান্বিত রত্নের প্রাচীর আর তার ধারে ধারে সোনার গাছ। নিচে স্ফটিকের সোপান আর শিলাপট্টের বদ্ধ বেদী, উপরে যেন মেঘাবৃত আকাশ। পুষ্পিত বৃক্ষ ছিল, ছিল হংস-চক্রবাক-মুখর কুমুদ-কহ্লার-কীর্ণ স্বচ্ছ জলাশয়। কৃত্রিম পুষ্করিণীও ছিল একটি। তাতে মণির মৃণাল আর বৈদূর্যের পত্রশোভিত কাঞ্চন কমল। সৌরভ-আকুল মন্দ বায়ে আন্দোলিত জলের মধ্যে মৎস্য ও কূর্মের ক্রীড়া দেখে দুর্যোধনের মতো অভিজ্ঞ রাজাও ভ্রমে পড়েছিলেন। সভা থেকে ফিরে এসে নিজের অপমানের কথা ব্যক্ত করেছিলেন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। কৃত্রিম সরোবর দেখে বস্ত্র উৎকর্ষ করেছিলেন, আর শিলাভ্রমে প্রকৃত জলাশয়ে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। দেওয়ালকে দ্বার ভেবে রক্তাক্ত করেছিলেন নিজের ললাট, আর পাণ্ডবের শরণ নিতে হয়েছিল প্রকৃত দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য। আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে এই সভামণ্ডপ শুধু রত্নালোকিতই ছিল না, তাপ-নিয়ন্ত্রিতও ছিল। সদা উজ্জ্বল সদা স্নিগ্ধ সভামণ্ডপ। ময় দানবের মতো ইঞ্জিনিয়ার পৃথিবীতে আজও বোধ হয় জন্মায় নি।

দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের একটা সহজাত শ্রদ্ধা আছে, আছে খানিকটা দুর্বলতাও। মনের এই কোমল বৃত্তিটুকুর পুরোপুরি সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলুম। পিছন ফিরে দেখলুম, খানিকটা বোধ হয় সফল হয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। মিত্রা তার চশমাজোড়া পিছন দিকে একবার ঠেলে দিয়ে বলল ঃ এ সব কথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

কোন চিন্তা না করেই জবাব দিলুম ঃ করি।

মিত্রার ঠোঁটের কোণে এক রকমের অদ্ভুত হাসি দেখলুম। শুধু অবিশ্বাসের হাসি নয়, শিক্ষা পেয়েও আমার কুসংস্কার যে ঘোচে নি, তারই ইঙ্গিত পেলুম সে হাসিতে। মিত্রা কোন কথা না বলেই যেন

আমায় বেশি অপমান করল।

মুখ ফিরিয়ে সবাইকে আমি একবার দেখে নিলুম। আমার মুখের দিকে স্বাতি চেয়ে ছিল। মনে হল, তার মনের কথাটি যেন আমি পড়তে পেরেছি। বললুম: বেশি দিন নয়, একশো বছর আগে বাদশাহ বাহাদুর শাহর দরবারে সভাকবি ছিলেন আমাদের এক পূর্ব-পুরুষ। এক সময় হিন্দুর রামায়ণ শোনার শখ হল বাদশাহর, আর মুখে মুখে তিনি রামায়ণের অনুবাদ শোনাতে লাগলেন। যেদিন পুষ্পক রথের গল্প তাঁকে বললেন, রাবণ বধের পর রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে সানুজ সানুচর আকাশ পথে ফিরলেন অযোধ্যায়, নাক সিঁটকে বাদশাহ বললেন, গাঁজা। সেদিন রামেশ্বরমে স্বাতিকে যখন আমি এই বাদশাহর গল্প বলছিলুম, স্বাতি এই অবিশ্বাসের কথা শুনেই বলে-ছিল, গাঁজা। অর্থাৎ আকাশে ওড়া যায় না, কী করে বাদশাহ এ কথা ভাবতে পারল!

রাণা বলল: ঠিকই তো। এমন বেকুব বাদশাহর কথা তো আম শুনি নি।

হেসে বললুম: শুনবেন কোথা থেকে! এ যে আমার নিজেরই বানানো গল্প!

মামা হেসে উঠলেন। মিত্রার চোখের দৃষ্টি আরও একটু কঠিন হল।

৩

রাণা গাড়ি চালায় ভাল। জনবিরল প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে এল কুতব মিনারে। গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি আমায় আক্রমণ করল। রাণার দিকে চেয়ে বলল ঃ সারা রাস্তা ধরে বিরাট একটা বক্তৃতা দিলে গোপালদা। কিন্তু আসল কথাটাই জানা গেল না।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে রাণা তার মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল ঃ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে শুরু করে নয়া দিল্লী পর্যন্ত অনেকগুলো নাম শোনা গেল এই জায়গাটার, কিন্তু দিল্লী নামটা কবে কোথা থেকে এল, সে পরিচয় তো পেলাম না।

সত্যিই তো!

রাণা তখুনি কথাটা মেনে নিয়ে বলল ঃ খুব ইন্‌টেলিজেণ্ট প্রশ্ন করেছেন, ইণ্টারেস্টিংও বটে। আমার মাথায় আজও এ প্রশ্ন আসে নি।

বলেই তার বইএর পাতা উল্টোতে শুরু করল।

মিত্রা তার পকেট পুড্‌ল্‌টাকে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল ঃ ওতে নেই।

অ্যাঁ, নেই এতে!

দুর্ভাবনায় দমে গেল রাণা। সশব্দে ভাবতে লাগল ঃ দিল্লী-দিল্লী—যত দূর মনে পড়ছে, ইতিহাসের গোড়া থেকেই তো দিল্লী নাম।

এগোতে এগোতে মামা বললেন ঃ গোপাল কী বল?

আমি আবার লজ্জা পেলুম ঃ আমায় কি আপনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পেয়েছেন?

কথা না বলে তিনি হাসলেন একটুখানি।

সেই হাসিটুকু লুফে নিয়ে স্বাতি বলল ঃ নিজেকে তো তুমি সবজান্তা ভাব, চুপ করে রইলে কেন!

স্বাতির মুখে এমন ব্যঙ্গ আমি আশা করি নি। তবু হাসলাম। হেসে বললুম: যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

ঘাড় ফিরিয়ে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করল: মানে?

বললুম: ঠিকই বলছি। শ্বাস থাকতে হার স্বীকার করব না, এই আশাটুকু দিনে দিনে বাড়িয়েই এসেছি। একে আমার অহংকার বললে আমি একটুও আপত্তি করব না।

কথা না বলে মিত্রা কঠিন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইল। রাণা বলল: ঠিকই বলেছেন আপনি, সামান্য কারণে কেন হার স্বীকার করবেন!

তখন আমরা কুওৎ-উল ইসলাম মসজিদের আঙিনায় পুষ্করণরাজ চন্দ্রবর্মণের লৌহস্তম্ভের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। একেবারে খাঁটি লোহার স্তম্ভ। তেইশ ফুট আট ইঞ্চি উঁচু আর ব্যাস ষোল ইঞ্চি। দেড় হাজার বছরের রোদে জলেও এতটুকু মরচে পড়ে নি কোনখানে। বললুম:

কিল্লি তো ঢিল্লি ভই।
তোমর ভয় মত হিল।

মামাবাবু বললেন: সে আবার কী?

মিত্রা শুধু কটমট করে চাইল আমার দিকে।

বললুম: কিল্লি শব্দটা এসেছে কীল বা কীলক থেকে। তার মানে গোঁজ বা স্তম্ভ। অর্থাৎ স্তম্ভ তো ঢিল্লি মানে ঢিলে রয়ে গেল, তোমরের ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না। এই তোমর হল কানিংহাম সাহেবের প্রথম অনঙ্গপাল, যিনি ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশানের ওপর আজকের দিল্লী নির্মাণ করেন। এঁদের বংশপরম্পরায় যে প্রবাদ চলে আসছে, তাতে জানা যায় যে ব্যাসদেব রাজাকে এই স্তম্ভের কথা বলেন। বলেন, এর দৃঢ়তার উপরই রাজলক্ষ্মীর অচলতা নির্ভর করছে। তাঁরই কথায় পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ এই স্তম্ভটি অতি যত্ন সহকারে মাটিতে পোঁতা হল। পরীক্ষা করে ব্যাস বললেন যে চমৎকার পোঁতা হয়েছে, স্তম্ভের পাদমূল

একেবারে বাসুকির মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। স্তম্ভ অচল এবং রাজলক্ষ্মীও অচল হলেন। কিন্তু রাজার এ কথা ঠিক বিশ্বাস হল না। ব্যাসের অলক্ষ্যে মাটি খুঁড়েই তাঁর চক্ষু স্থির, সত্যিই বাসুকির রক্ত লেগে আছে স্তম্ভের পাদমূলে। আবার পুঁতলেন সেটা, কিন্তু আগের মতো আর শক্ত হল না। ব্যাস এসে বললেন,

কিল্লি তো ঢিল্লি ভই।

তোমর ভয় মত হিল।

এ বংশের রাজলক্ষ্মী অচিরেই সচল হবে। হলও তাই। আর এই ঢিল্লি থেকেই দিল্লী নাম।

মামা বলে উঠলেন: শাবাশ!

কিন্তু মিত্রার বিশ্বাস হল না এই কাহিনী, বলল: তৈরি গল্প!

বললুম: যা তৈরি নয়, তাও বলি। এই দিল্লী বা দিল্লীপুর নামের উৎপত্তি খ্রীষ্টের জন্মের পঞ্চাশ বছর আগে। জেনারেল কানিংহাম ফেরিস্তার মত সমর্থন করে বলেছেন যে রাজা দিল্লীর নামেই নগরের এই নাম। যুধিষ্ঠিরের পর তাঁর অধস্তন ত্রিশ পুরুষ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। তারপর এই সিংহাসন অধিকার করেন পাণ্ডব মন্ত্রী বিসর্ব। এঁরই বংশে পঞ্চদশ পুরুষে গৌতম রাজা হলেন পাঁচশো বছর পরে। গৌতম বংশের পর ময়ূর বংশ। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়ূর বংশের শেষ রাজা দিলু।

স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে আমি হেসে বললুম: এই স্তম্ভের গায়ে যে সংস্কৃত অনুশাসন তার পাঠোদ্ধার করেছেন প্রিন্সেপ সাহেব। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব তাঁর নিজেরই কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। গুপ্ত যুগের অনুরূপ অক্ষর দেখে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে ধাবের কাল সম্ভবত ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

স্বাতির এ গল্প পছন্দ হল না। মুখ ফিরিয়ে বলল: কী কী দেখবার আছে এখানে?

রাণাও যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা বোঝা গেল তার আচরণে। বলল : দেখবার ? তা অনেক কিছু আছে বৈকি !

বলেই তার পকেট-বই খুলে ফেলল। গুন্‌গুন্‌ করে পড়ল : কুতব মিনার, আলাই মিনার, কুওত-ও-তুল ইসলাম মসজিদ, আয়রন পিলার, আলাই দরওয়াজা, ইলতুৎমিশের কবর, মাদ্রাসা আর খাজা কুতব-উদ্‌-দীনের দরগা।

নোট-বই বন্ধ করে বলল : আসুন একে একে সব দেখিয়ে দিই আপনাদের।

আমরা কথা না বলে সবাই তার কাছে সরে এলুম।

পেশাদার গাইডের মতো রাণা বলল : এই যে প্রাঙ্গণের মধ্যে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, এটা কুওত-ও-তুল মসজিদের প্রাঙ্গণ।

খানিকটা এগিয়ে একটা খিলানের সামনে এসে বলল : এইখানে ফার্সীতে লেখা আছে, ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুতব-উদ্‌-দীন আইবেক এই মসজিদ নির্মাণ করেন। চারি দিকের শিল্পকলা লক্ষ্য করছেন তো! এই থামগুলোর কারুকার্য! পাঠান স্থাপত্যের নমুনা এ সব নয়। হিন্দুদের তৈরি সাতাশখানা বাড়ি থেকে এ সব সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল।

আলাই দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হয়ে রাণা বলল : কুতবের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুলতান ইলতুৎমিশ আফগানিস্থান আর পারস্য থেকে কারিগর আনলেন এই মন্দিরের বিস্তারের জন্য। নতুন জোড়াতাড়াগুলো চিনতে পারছেন স্বাতি দেবী ?

বলে স্বাতির দিকে চাইল রাণা ব্যানার্জি।

কয়েকটা থাম দেখিয়ে স্বাতি বলল : এগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন মনে হচ্ছে।

আমি বললুম : চেনবার সহজ উপায় হচ্ছে অন্য। একবার সেই সুত্রটি ধরতে পারলে কোথাও আর কষ্ট হবে না। হিন্দুদের ছাদ

সমতল, আর্চ সমান্তরাল আর স্তম্ভ চতুষ্কোণ। তার গায়ে ফুল লতাপাতা আর দেবদেবীর নানা কারুকার্য।

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম : অঙ্কের সেকেণ্ড ব্র্যাকেট মনে পড়ছে? তাকে উপুড় করে ফেললে যা হয়, মুসলমানের আর্চ তেমনি। আর ছাদ গম্বুজওয়ালা। দেয়ালে কোরাণের বাণী আর ইউক্লিডের জ্যামিতি। এইবারে মিলিয়ে নাও।

স্বাতি একবার আমার মুখের দিকে চাইল, তারপর তাকাল অর্ধ-সমাপ্ত আলাই দরওয়াজার দিকে।

রাণা বলল : আলা-উদ-দীন চেয়েছিলেন এই মসজিদটাকে আরও বড় করতে, কিন্তু এর বেশি আর কিছু করতে পারেন নি।

মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান ইলতুৎমিশের কবর দেখাল রাণা, বলল : এই কবরটাকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কবর মনে করবেন না। তাঁর ছেলের কবর তৈরি হয়েছিল এরও আগে, ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

স্বাতি কি সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাণার দিকে চাইল!

মসজিদের দক্ষিণে আমরা মাদ্রাসার ভগ্নবিশেষ দেখলুম। রাণা বলল : এও আলা-উদ-দীন খিলজীর তৈরি। লোকে বলে, আলা-উদ-দীনের সমাধিও আছে এরই ভেতর। তাঁর আরও একটি কীর্তি আছে কাছে।

বলে আমাদের আলাই মিনারের কাছে নিয়ে এসে বলল : বাদশাহর শখ ছিল দ্বিতীয় কুতব তুলবেন অদ্বিতীয়, আকারে ও উচ্চতায় তা প্রথম কুতবের দ্বিগুণ হবে। নিজের জীবনটাকেও দ্বিগুণ করতে পারলে হয়তো একদিন সফল হতেন।

বললুম : কুতবকে যাঁরা হিন্দুর কীর্তি বলেন তাঁদের মত অন্য। তাঁরা বলেন যে পৃথ্বীরাজ নিজের গঙ্গা দর্শনের জন্য এই মিনার নির্মাণ শুরু করেছিলেন।

সকলের কাছেই বোধহয় এ কথা নতুন ঠেকল। তাই বললুম :

কুতবকে যে যমুনা স্তম্ভ বলা হয় তা অনেকেই জানেন। পৃথ্বীরাজের কন্যার গুরুর আশ্রম ছিল যমুনার তীরে। এই যমুনা স্তম্ভের শিখরে উঠে তিনি প্রত্যহ যমুনা ও তার তীরবর্তী গুরুর আশ্রম দর্শন করতেন। অনেকে বলেন, পৃথ্বীরাজ নিজেই প্রত্যহ গঙ্গার দর্শন চাইতেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন। কিন্তু নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে দেখলেন যে গঙ্গা এত দূরে যে তার জন্যে আরও উঁচু স্তম্ভের প্রয়োজন। অকালে তাঁর মৃত্যু না হলে এই মিনারে উঠে আমরাও আজ গঙ্গার শোভা দেখতুম, প্রণাম করতুম সেই পাপনাশিনীকে।

রাণা ফ্যালফ্যাল করে চাইল আমার মুখের দিকে। মিত্রার চোখের দিকে চেয়ে দেখলুম, এ কথাও তার বিশ্বাস হয় নি।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: কুতব মিনারের কতগুলো সিঁড়ি রাণাবাবু?

রাণা জবাব দিল: তিনশো উনআশি। উঠবেন নাকি ওপরে?

উঠব বৈকি!

বলে তরতর করে স্বাতি এগিয়ে গেল।

তবেই হয়েছে!

বলে মামা পেছু হঠতে লাগলেন। আর মামীও তাঁর সঙ্গে রইলেন।

মিত্রা বলল: আমার ও ছেলেমানুষী নেই।

বলে সেও দাঁড়িয়ে রইল।

রাণা হাসি মুখে এগিয়ে গিয়েছিল। আমায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বাতি বলল: গোপালদাও কি ভয় পেলে নাকি?

বললুম: ত্রিচির রক টেম্প্‌ল কি এর চেয়ে নিচু হবে?

সে হিসেব পরে করব, এবারে চলে এস তো।

বলে স্বাতি ভিতরে ঢুকে গেল।

আমিও এগিয়ে গেলুম।

আড়ালে গিয়ে রাণা একটা সিগারেট ধরাল, বলল: উঃ, হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমি বললুম : সিগারেট খান, তাতে সঙ্কোচ কিসের ?

রাণা বলল : বাবার বন্ধু, তায় একেবারে কনজারভেটিভ মানুষ। সিগারেটের লোভে কি ঠ্যাঙানি খাব ?

উপরের ধাপ থেকে স্বাতির হাসির শব্দ পেলুম।

দোতলার বারান্দায় এসে আমরা হাঁপাতে লাগলুম। মামা-মামীকে দেখতে পেয়ে স্বাতি তার হাত দুলিয়ে দিল। বলল : কত দূর উঠলাম রাণাবাবু ?

রাণা বলল : দুশো আটত্রিশ ফুটের ভেতর মাত্র পঁচানব্বই ফুট।

আমি কুতবের গা দেখছিলুম ভাল করে। আমাকে বলল : নিচের তিনটে তলার সঙ্গে ওপরের দুটো তলার তফাতটা দেখবেন ভাল করে। নিচের দিকটা কুতব-উদ্-দীন আইবেক গেঁথেছেন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর ওপরটা তৈরি করেছেন ফিরোজ শাহ তুঘলুক ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে। নিচে লাল পাথর, তার গা ঢেউখেলানো। ওপরটা ছোট বটে, কিন্তু মার্বেল পাথরের।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার উঠতে লাগলুম। দোতলা থেকে তিনতলা, তারপর চারতলা। একবার করে বারান্দায় বেরিয়ে নিচের লোকজন আর চারি দিকের দৃশ্য দেখে নিচ্ছি। এক সময় পাঁচ-তলার উপরেই পৌঁছে গেলুম। কিন্তু ভাল করে কিছু দেখবার আগেই স্বাতি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল : ওপরটা দুলে উঠল যে !

সকলের পিছনে উঠছিল রাণা। সে কেমন হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর আমি বললুম : কই, দুলছে না তো !

ততক্ষণে স্বাতি আমার ডান হাতটা টেনে ধরে সিঁড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। বলল : শীগগির নেমে এস গোপালদা, আর এক মুহূর্তও ওপরে নয়।

পিছন ফিরে আমি রাণাকে ডাকলুম।

স্বাতি আমায় টেনে নামাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশ দিয়ে

যাঁরা উঠছিলেন, শশব্যস্তে তাঁরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। একবার ধাক্কা লাগলে আর রক্ষে নেই, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

শ দেড়েক সিঁড়ি নেমে স্বাতি দাঁড়াল, বলল : এস, একটু বিশ্রাম করা যাক।

বলে বাহিরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। রাণা তখনও এসে পৌছয় নি।

খানিকটা দম নিয়ে স্বাতি বলল : কী ভয়ই পেয়েছিলুম!

আমি হেসে ফেললুম।

স্বাতি চটে উঠে বলল : তুমি হাসছ! তোমার নিজের মাথাই তখন দুলছিল কিনা, বাইরের দুলুনি তাই টের পাবে কী করে!

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম : সত্যিই তো!

উঁকি মেরে স্বাতি একবার সিঁড়ির ভিতরটা দেখে ফিরে এসে বলল : একটা কথা বলবার জন্যে তোমাকে টেনে নামালাম।

তা বুঝেছি।

কী বুঝেছ বল তো!

মিত্রার সম্বন্ধে কিছু বলবে।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ না করে বলল : বড্ড অহংকারী ঐ মেয়েটা। কাল নাক সিঁটকেছিল তোমার পরিচয় জেনে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি গোপালদা, ওর অহংকার তুমি ভেঙে দাও।

খচ করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দে পিছন ফিরে তাকালুম। রাণা আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

কিছু না ভেবেই আমি স্বাতিকে আশ্বাস দিলুম : তাই হবে।

৪

তাই হবে, কিন্তু কী করে তাই হবে!

কুতব থেকে নেমে মামা-মামীর পাশেই আমি ঘাসের উপরে বসে পড়লুম। স্বাতি বসল মিত্রার কাছে। রাণা বসতে এসেও বসল না, বলল : একটু চায়ের চেষ্টা দেখি।

স্বাতিকে মামী কী একটা প্রশ্ন করলেন, আমার কান সেদিকে গেল না। আমি ভাবছিলুম আমার সংকল্পের কথা। না ভেবে চিন্তে স্বাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললুম, কী করে তা রক্ষা করব।

কাল সন্ধ্যাবেলার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। মনে হল, আমিও যেন মিত্রাকে কাল লক্ষ্য করেছি। গাড়ি থেকে যখন নেমেছিল, তখন খানিকটা কৌতূহল দেখেছিলুম আমার সম্বন্ধে। কঠিন দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করেছে। আমার ওঠাবসা কথাবার্তা নিরীক্ষণ করে গেছে পরীক্ষকের মতো। এই কৌতূহলটা বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। মামার কাঁচি ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবির পাশে আমার মোটা খদ্দরের জামাকাপড় বড় বেয়াড়া দেখায়। তার চেয়েও বেমানান দেখাচ্ছিল রাণার পাশে। তার সাটিন ড্রিল আর শার্কস্কিনের চাকচিক্য খানিকটা বিদ্রূপ ছড়াচ্ছিল। রাণা তাদের পরিচয় ঘোষণা করেছিল বেশ একটু গর্বের সঙ্গে, আর আমার পরিচয় দিতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য মামা থেমে পড়েছিলেন। সামলে নিয়ে বলেছিলেন : গোপাল আমার ভাগনে।

তাঁর সেই দ্বিধা আমার নজর এড়ায় নি। তাই স্পষ্ট করে সম্বন্ধটা জানিয়ে দিয়েছিলুম : নকল ভাগনে। নিজের ভাগনে নেই বলে অনাত্মীয় হয়েও আমি তাঁর স্নেহের অধিকারী হয়েছি।

মামা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, খুশী হয়েছিলেন কিনা

বুঝতে পারি নি। স্বাতি আমার সামনে বসে ছিল, তার দৃষ্টিতে ছিল প্রসন্নতা।

আমার সম্বন্ধে মিত্রার তখনও খানিকটা কৌতূহল ছিল। নিজের পরিচয়ের সবটুকুই তো বাকি রয়ে গেছে। সাধারণ সৌজন্য রক্ষায় সেটুকু জানতে চাওয়া চলে না। আমার মনে হয়, এই রহস্য ভেদ করার জন্য কিছু অস্থিরতা জেগেছে মিত্রার মনে। তাই গায়ে পড়ে নিজের পরিচয় ঘোষণা করে দিয়েছিলুম।

রাণা জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ কদিন থাকবেন এখানে ?

আমি সহজ ভাবে বলতে পারতুম, দু-চার দিন। কিংবা কবিত্ব করে, যত দিন ভাল লাগে। তা না বলে উত্তর দিয়েছিলুম ঃ কিছু দিন থাকলেই হল। আমি তো নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

শেষের দিকটা যে নিতান্তই অবান্তর তা নিজের কাছেই ধরা পড়েছিল। ধরা পড়েছিল স্বাতির কাছেও। রাণার উচ্চকিত অট্টহাসিতেও স্বাতির ক্লিষ্ট দৃষ্টি আমার নজর এড়ায় নি।

মিত্রার পরিবর্তনটা আরও স্পষ্ট। তার সমস্ত কৌতূহল যেন নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কাঁধের পুড্‌ল্‌টা হাতে নিয়ে বলল ঃ অনেক রাত হল দাদা, এবারে ওঠা যাক।

ও মা, এখুনি উঠবে কি ঃ বলে মামী লাফিয়ে উঠেছিলেন ঃ এই তো এলে ! একটু বোসো, জলটল খাও !

জলটলের ব্যবস্থা করতে মামী যখন সত্যিই বেরিয়ে গেলেন, তখন আপত্তি সত্ত্বেও তাদের অপেক্ষা করতে হল।

আমি তো লক্ষ্য নই, উপলক্ষ্য। সেদিন এই ভেবে আমার আশ্চর্য লেগেছিল যে আমি কেন প্রাধান্য পেলুম ! তারা তো আমার কাছে আসে নি, এসেছিল তাদের বাপের বন্ধুর কাছে। তবু আমার

জন্যই এই দিল্লী দেখার ব্যবস্থা হল—এই আয়োজন আর এই পরিশ্রম। রাণার ক্লান্তি নেই, কিন্তু সম্মতি দেখছি না মিত্রার। তার সংযত ব্যবহারে কোথায় যেন একটুখানি অবজ্ঞার আভাস পাচ্ছি।

এই ভাবটি স্বাতির ভাল লাগছে না, বরং পীড়া দিচ্ছে। ফিরোজ শাহ কোটলায় তার এই মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, স্পষ্ট ভাষায় এখানে তার বাসনা জানিয়ে দিল। স্বাতির সঙ্গেও আমার পরিচয় দীর্ঘ কালের নয়। তবে অল্প দিনের অন্তরঙ্গ মেলা-মেশায় ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছি। এক দিন তার স্বচ্ছ মনটি দেখেছি দর্পণের মতো, জেনেছি তার আদর্শের কথা। মানুষকে সে ভালবাসে মানুষ বলে, শ্রদ্ধা করে তার ব্যক্তিত্বকে। লৌকিক সংস্কার আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর তার আস্থা সামান্য। বলেছিল, গোপালদা, সূর্য জ্যোতির্ময় বলেই আমাদের দেবতা, তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস আমাদের কাছে মূল্যহীন। স্বাতী রোমান্টিক, এ তার বয়সের ধর্ম। মিত্রার নির্বাক অবজ্ঞায় আজ সে যথার্থ আঘাত পেয়েছে।

কিন্তু আমি কী করতে পারি! সেই ভাবনায় খানিকটা অস্থিরতা এসেছিল। চমক ভাঙল রাণার কণ্ঠস্বরে। রাণা বলল: ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি গোপালবাবু? এই নিন, একটু চা খেয়ে নিন। গায়ে আবার জোর পাবেন।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে পেয়ালাটা হাতে নিলুম। দেখলুম, মিত্রা চকিতে তার চোখ ফিরিয়ে নিল।

এক চুমুক চা মুখে নিয়েই স্বাতি আমাদের পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল, বলল: কুতব-উদ্-দীনের নাম থেকেই কি কুতব মিনার নাম রাণাবাবু?

মিত্রা হাসল।

রাণা বলল: কুতব-উদ্-দীনের বিজয়-স্তম্ভ যে!

স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলুম। প্রশ্নটা করে ফেলেই সে অপ্রস্তুত বোধ করছে। রাণার জবাবটা আমার খারাপ লাগে নি, খারাপ

লাগল মিত্রার হাসিটা। বললুম: আমরা যা জানি, তা কি সত্য! কানিংহাম সাহেব বলেন যে সন্ন্যাসী কুতব-উদ্-দীন উশীর নামে জামা মসজিদের নাম কুতব-উল-ইস্‌লাম আর তাঁর আজান দেবার মাজিনা স্তম্ভের নাম কুতব মিনার। এই জামা মসজিদ যে শাজাহানের বিখ্যাত জামা মসজিদ নয় তা সহজেই বোঝা যায়। কেন না চতুর্দশ শতাব্দীর আবুল ফেদা আর শামসি সিরাজের লেখাতেও কুতব মিনারের উল্লেখ আছে জামা মসজিদের মাজিনা বলে। এই শতাব্দী-তেই লেখা ফতুহাত-ই-ফিরোজশাহী! এই ইতিহাস বলে যে মুইজ-উদ্-দীন শাহর মিনার বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ে। তার সংস্কার ও বিস্তার করেন ফিরোজ শাহ। এই সময়েই ভারতের প্রথম উর্দু কবি আমির খসরু লিখেছেন যে ফিরোজ শাহর ভাঙা চূড়াকে নতুন করে গাঁথেন সিকান্দার লোদি। আর যাঁরা ফার্সী পড়তে পারেন, তাঁরা বলেন যে এই কুতবের গায়েই আছে শিলালিপি যা পড়ে জানা যায় যে গজনীর রাজা মহম্মদ-বিন-শাহর আমলে এর নির্মাণ শুরু করেন কুতব-উদ্-দীন আইবেক, তিনি বোধহয় একটি তলাই নির্মাণ করেছিলেন। কুড়ি বছর পরে ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম চার তলা নির্মাণ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উপরের তলাটা বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়বার পর ফিরোজ শাহ দুটো তলা নির্মাণ করে দেন মার্বল পাথরে।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাণা আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, বললুম: আরও একজনের হাত আছে এই কুতব মিনারে, তা লর্ড বেন্টিঙ্কের। ১৮০৩-এর ভূমিকম্পে গেট সমেত এর চূড়া আর বারান্দাটা ভেঙে পড়ে। লর্ড বেন্টিঙ্ক বিলিতি কায়দায় তা মেরামত করিয়ে দেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

স্বাতি যে খুশী হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারলুম। কিন্তু ভাবান্তর দেখলুম না মিত্রার। চোখের চশমা খুলে সে তার শাড়ির আঁচলে মুছছিল পরিষ্কার কাঁচ দুটো, বলল: সন্ন্যাসীর নামে কুতব নাম, এতে কি তাই প্রমাণ হয়?

বললুম : হয় না।

কিন্তু মিত্রা তার পরবর্তী প্রশ্ন নিক্ষেপ করবার আগেই বললুম : তবে সুলতান কুতুব-উদ্‌-দীনের নামে কুতুব মিনার নাম হয়ে থাকলে আজ এর নাম হত আলাদিন মিনার বা বেন্টিঙ্ক মনুমেন্ট।

কেন?

মিত্রা আমার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করল।

বললুম : কুতব মিনারের পর নাম হত ইলতুতমিশ মিনার, তারপর ফিরোজ মিনার—

কথা শেষ করবার আগেই মামা হেসে উঠলেন। আর রাণা বলল : ঠিক বলেছেন। সন্ন্যাসীর নামে নাম বলেই এ নাম এতদিন টিকে আছে।

মিত্রা বিরক্ত হয়ে বলল : তাজমহলের নাম বদলে গেছে, না বদলেছে ফিরোজ শাহ কোটলার নাম!

বললুম : দশচক্রে ভগবান ভূত হন শুনি। পাঁচজনের হাত পড়লে ও নামের কী অবস্থা হত, তা কি বলা যায়?

মিত্রা কথা কইল না, হাসল স্বাতি।

মামা তাঁর পকেট ঘড়ি বার করে সময় দেখছিলেন। সে দিকে লক্ষ্য করে রাণা বলল : এ বেলা বাড়ি ফেরার আগে এ দিকের অন্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলোও দেখে নেওয়া যাক।

বলে তার ম্যাপ খুলে বিছিয়ে বসল ঘাসের উপর। আমি কাছেই ছিলুম, আরও একটু ঘন হয়ে বসলুম। স্বাতিও সরে এল।

রাণা বলল : আমরা এখন এইখানটায় কুতব রোডের ওপর। মেহরৌলিও এইখানেই, পৃথ্বীরাজের প্রাচীর বেরোচ্ছে মাটি খুঁড়ে। এই যে রাস্তাটা পূব দিকে বেরিয়ে গেছে দিল্লী-মথুরা রোডের দিকে, সূর্যকুণ্ড যেতে হয় এই পথে। খানিকটা এগিয়ে বাঁ ধারেই তুঘলুকাবাদ। সেখানে আদিলাবাদ ফোর্ট আর ঘিয়াস-উদ্‌-দীনের সমাধি।

স্বাতি বলল : সূর্যকুণ্ডে কী দেখবার আছে ?

রাণা হেসে বলল : মজুরি পোষায় না। তুঘলুকাবাদ থেকেও প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটা পাথুরে জায়গার ওপর একটা বিরাট কুণ্ড। রাজা অনঙ্গপালের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এর কাছেই।

আমি অন্য কথা শুনেছিলুম। হিন্দু যুগের সব চেয়ে সুন্দর আর সব চেয়ে বড় স্মৃতি স্তম্ভ এইখানেই। ভারতে সূর্যের মন্দির মাত্র অল্প কটি, তার একটির চিহ্ন আছে এখানে। পাছে অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কথা কইতে সাহস পেলুম না।

রাণা বলল : ফেরার পথে রাস্তার ডান দিকে পড়বে জাহানপন্না, সিরি আর বিজয় মণ্ডল। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা পূবে হাঁটলে দেখতে পাব খিড়কি মসজিদ, বেগমপুর মসজিদ আর রোশন চিরাগ দিল্লীর দেওয়াল। রাস্তার বাঁ ধারে ফিরোজ শাহর কবর আর হাউস খাস। মথ কি মসজিদ আর একটু এগিয়ে রাস্তার ডান ধারে।

মামা বললেন : রোদ যেমন তাতিয়ে উঠছে, তাতে বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না।

মামী বললেন : খাবার সময় বাড়িও পৌঁছতে হবে।

রাণা তার ঘড়ি দেখে বলল : তা হলে চলুন, হাউজ খাস দেখেই বাড়ি ফেরা যাক।

চলতে চলতে স্বাতি বলল : হাউজ খাস দেখেছি কিনা আমার মনে পড়ছে না!

রাণা বলল : মারাত্মক এমন কিছু নয়। বিরাট একটা পুকুর, সিরিতে জল সরবরাহের জন্যে আলা-উদ্-দীন খিলজী এটা নির্মাণ করেছিলেন। ফিরোজ শাহরও এ জায়গাটা ভাল লেগেছিল। তাই একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এর দক্ষিণ পূর্ব কোণে। এই-খানেই তাঁর সমাধি।

একটু থেমে রাণা বলল : পাঠানদের ভেতর ফিরোজ শাহই

ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। শুধু বিদ্বান ধর্মপরায়ণ নন, প্রজাবৎসলও ছিলেন। সেই অত্যাচারের যুগে কী করে এমন সম্ভব হয়, তার একটা সদুত্তর পাওয়া যায়। ইনিই ভারতের প্রথম মুসলমান রাজা, যাঁর ধমনীতে হিন্দুর রক্ত ছিল। তাঁর মা ছিলেন রাজপুত রমণী।

আমি বললুম: ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ঘিয়াস-উদ্-দীন-তুঘলুক ছিলেন ফিরোজ শাহর জ্যাঠামশাই, তাঁর মা ছিলেন জাঠ-কন্যা। কাজেই ঘিয়াস-উদ্-দীনই সে গৌরবের প্রথম অধিকারী।

রাণা খানিকটা বিচলিত হল। বললুম: প্রজাহিতকর যত কাজই করে থাকুন, ফিরোজ শাহকে আমি প্রজাবৎসলও বলব না, ধর্ম-পরায়ণও না। হিন্দু প্রজার উপর তাঁর অত্যাচারের সীমা ছিল না। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে সেই প্রাঙ্গণেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু প্রজার ওপর ছিল জিজিয়া কর। ধর্মান্তরিত হলে কর দিতে হবে না—এই আশ্বাসে শত শত প্রজার ধর্ম নষ্ট করেছেন।

কী একটা মনে পড়তেই রাণা দাঁড়িয়ে পড়ল, একখানা বই খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি। কয়েকখানা পাতা উল্টে খানিকটা পড়ে ফেলেই বলল: তাহলে তো ভুলই লিখেছে এই বইএ। কিন্তু আশ্চর্য! কেউই কোন প্রতিবাদ করেন নি এ সব ভুলের!

বললুম: ইতিহাসের বই হলে ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন।

আমি মিত্রার দিকে চাইলুম। আমার কথা তার বিশ্বাস হয়েছে কিনা বুঝতে পারলুম না।

স্বাতি বলল: তুমি প্রতিবাদ কর না কেন?

বললুম: যারা খ্যাতি চায়, বাদানুবাদ তারাই করুক।

গাড়ির কাছে পৌঁছে রাণা তখন পিছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে গেছে। মামা আমাকে বললেন: তোমার সঙ্গে এইখানে আমার মতের মিল নেই। আমার বিশ্বাস যে খ্যাতির প্রয়োজন বোধ যার ফুরিয়ে গেছে, সংসারে তার আর প্রয়োজন নেই।

প্রতিবাদ করে বললুম: আমি অন্য রকম শিখেছি। সংসারে খ্যাতির মোহ যাদের নেই, তাদের প্রয়োজনই অপরিহার্য।

মিত্রার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমার উপরে। বললুম: মোহ স্পর্শ না করলেই সাধনার পথ হয় নিষ্কণ্টক। আমার এখন জানবার সময়, আমাকে সব কিছুই নিঃশব্দে জানতে হবে।

গাড়িতে মামী উঠলেন সকলের আগে, তার পর মিত্রা আর স্বাতি, সকলের শেষে মামা নিজে। দরজা বন্ধ করবার আগেই আমি উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে রাণার পাশে বসলুম। ইচ্ছা করলে একজন আমাদের সঙ্গে সামনে বসতে পারতেন। তাতে আরাম পেতেন।

গাড়ি চালাতে শুরু করে রাণা বলল: পাঠান যুগের সব কিছুই প্রায় দেখা হয়ে গেল। লোদি গার্ডেন আর নিজাম-উদ্-দীনের দরগা দেখিয়ে দেব ওখলা যাবার পথে। বাকি যা থাকবে তা না দেখলেও চলবে। কালান মসজিদ, কুশক্-ই-শিকার বা টিন বুর্জ এমন কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু নয়।

স্বাতি হেসে বলল: আপনার মতো গাইড বোধহয় সারা দিল্লীতে মিলবে না।

মিত্রা বলল: কাল অনেক রাত অবধি দাদা নিজের যোগ্যতা বাড়িয়েছে।

রোদে তখন উত্তাপ ঝরছে, বাতাসেও লেগেছে তার স্পর্শ। সোজা সমতল পথে বায়ুর বেগে গাড়ি ছুটিয়েছিল রাণা ব্যানার্জি। হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। নিঃশব্দে যে গাড়ি চলে, সে হঠাৎ বিপুল রবে গর্জে উঠল, কিছুতেই থামতে চায় না। আতঙ্কে রাণার মুখ গেল শুকিয়ে, পিছন থেকে মেয়েদের আর্তনাদ শুনলুম। কিছু ভেবে না পেয়ে চাবি ঘুরিয়ে আমি ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলুম। শব্দ থেমে গেল। আর খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল রাণা। আমরা দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়লুম।

রাণা প্রথমেই আমাকে ধন্যবাদ জানাল, বলল: আপনিই আজ প্রাণ বাঁচালেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিত্রা বলল : ভেবেছিলুম, ইঞ্জিনটা বুঝি ফেটেই যাবে।

হেসে উত্তর দিলুম : ইঞ্জিন ফাটে না, বেগড়ালে অচল হয় শুধু।

চিন্তিত ভাবে রাণা বলল : নতুন গাড়ি নিয়ে যে এমন বিপদ হবে কে জানত। ধারে কাছে একটা টেলিফোনও নেই যে ড্রাইভারকে ডাকতে পারি।

আমি সাহস দিয়ে বললুম : আসুন না, আমরাই চেষ্টা করে দেখি!

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন : তুমি মোটরের কাজও জান নাকি ?

আমি লজ্জা পেয়ে বললুম : ছি ছি, কী যে ভাবেন আমাকে!

মামা হতাশ হয়ে বললেন : তবে সারাবে কী করে!

স্বাতির সাহস খানিকটা ফিরে এসেছিল, বলল : বুদ্ধি দিয়ে।

আমি জবাব দিলুম : ঠাট্টা করছ তো! কিন্তু ঐটেরই দরকার সব চেয়ে বেশি।

তারপর পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে বললুম : বনেটটা খুলতে পারেন রাণাবাবু ?

রাণা বনেট তুলল।

বললুম : আপনার ঐ অ্যাক্সিলারেটরের তারটা একবার দেখুন তো! খুলে টুলে যায় নি তো ?

রাণা খানিকক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরেই চেঁচিয়ে উঠল, বলল : সত্যিই তো, এই তারটাই খুলে গেছে।

খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল : কিন্তু পারব কি ঠিক মতো লাগাতে!

উৎসাহ দিয়ে বললুম : কেন পারবেন না!

আরও খানিকক্ষণ কাজ করে বলল : দেখুন তো, ঠিক লাগল কিনা!

আমি কিছুই জানি না। তবু উঁকি দিয়ে বললুম : দিব্বি লেগেছে।

এইবারে উঠে আসুন।

আড়ষ্ট ভাবে মিত্রা বলল : আমার ভয় করছে কিন্তু দাদা।

আমি বললুম : আপনারা নীচেই থাকুন আমরা একবার স্টার্ট দিয়ে দেখি।

স্টার্ট দেবার আগে রাণা আমাকেও তার পাশে বসাল। কিন্তু কোন বিপদ হল না। আমি বললুম : আস্তে আস্তে ফিরলেই হবে।

সবাই উঠে বসলেন বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ আর কোন কথা কইলেন না। রাণা টেলিফোন তুলে প্রথমেই তাদের বাড়ির ড্রাইভারকে ডাকল।

৫

মুখ হাত ধুয়ে খাবারের টেবিলে বসেই স্বাতি বলল : মিত্রাদি কী বলছিলেন জানো গোপালদা ?

মিত্রা বোধ হয় বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি বললুম : কী করে জানব বল।

স্বাতি বলল : বলছিলেন যে মোটরের কারখানায় তুমি নিশ্চয়ই কখনও কাজ করেছ।

মিত্রা আপত্তি জানিয়ে বলল : কারখানায় কাজ করেছেন নয়, মোটরের কাজ যে নিশ্চয়ই শিখেছেন তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

বললুম : সে একই কথা। তবে কারখানার কাজ আমি অসম্মানের মনে করি নে।

স্বাতি বলল : অসম্মানের তুমি কিছুই মনে কর না, করলে ভাল কিছু করবার চেষ্টা থাকত।

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

রান্নাঘরে মামী তখন খাবার সাজাচ্ছিলেন, আর কাপড় ছেড়ে মামা বসেছিলেন পাশের ঘরে আহ্নিক করতে। রাণা বলল : খেয়ে উঠে কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো !

প্রবল ভাবে আপত্তি জানাল মিত্রা, বলল : তোমার জ্ঞানের বহর দেখে ইতিমধ্যেই আমি ঘেমে উঠেছি। এ বেলা বিশ্রাম করতে দাও।

আমি বললুম : সত্যিই তো, দিল্লী দেখবার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়, তখন ঠিক হয়েছিল যে শহরটা দেখা যাবে শুয়ে বসে রয়ে সয়ে। কিন্তু এখন দেখছি অন্য রকম। বেড়াবার আনন্দ ছাপিয়ে গেছে আমাদের দেখবার নেশা। একটু রাশ টানাই ভাল।

স্বাতি বলল : তোমার কচকচি কারও ভাল লাগে না গোপালদা। সন তারিখ খ্রীষ্টাব্দ শতাব্দ শুনিয়ে মেরে ফেলেছিলে দক্ষিণ ভারতে। এখানেও তাই শুরু করেছ। বাড়িতে বসে থাকলে তোমার বিদ্যা জাহিরের চেষ্টা থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পাবে।

স্বাতির এই কথাটা যে কত সত্য তা আমার চেয়ে সে বোধ হয় বেশি জানে না। একবার কলেজ পত্রিকার জন্য আমার কাছে একটা প্রবন্ধ চেয়েছিলেন আমাদের সম্পাদক বন্ধু। 'সৃষ্টিকর্তার জন্ম' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। লেখাটা ছাপা হয় নি। ফেরৎ দেবার সময় সম্পাদক বলেছিলেন, এই প্রবন্ধটা বোঝাবার জন্যে আর একটা প্রবন্ধ লেখ।

রাণারা সশব্দে হেসে উঠল।

আমি বললুম : আপনারা হাসছেন, কিন্তু আমি জানি যে এই দোষটিই আমার চরিত্রে চারি দিক থেকে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আমি সহজ হতে পারি নে, সহজ ভাবে কথা কইতে বা মিশতেও পারি নে মানুষের সঙ্গে। আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার অহংকার।

স্বাতিকে বিষণ্ণ দেখাল। আঘাত দিয়ে কি সে দুঃখ পেয়েছে!

রাণা বলল : এই তো বেশ সহজ ভাবেই আমাদের সঙ্গে মিশছেন।

অসংলগ্ন ভাবে স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল : আপনার ড্রাইভার কখন আসবে রাণাবাবু?

আমার মনে হল যে সে আমাদের আলাপের মোড় ফেরাতে চায়। পাঁচজনের সামনে নিজেদের নিয়ে আলোচনায় তার স্পষ্ট অসম্মতি লক্ষ্য করেছি। তার জন্য নাকি স্থান কাল পাত্রের বিচার আছে। একদিন বলেছিল, যখন দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী আর আকাশে জল ঝরে অনিবার, তখন মনের আগল খোলা যায় অসংকোচে। কেন না, সে কথা শুনিবে না কেহ আর। আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ তার এই কথাটি বিশ্বাস করে ফেললুম। চৈত্রের এই রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে এই সরকারী কোয়ার্টারের খাবার টেবিলে বসে মনে

হল, এই দুটি স্বল্প-পরিচিত তরুণের সামনে আমার চারিত্রিক দোষগুণ বিশ্লেষণ করে শুধু নির্বুদ্ধিতার কাজই করেছি। তারা আমাকে জানতে আসে নি, এসেছে বেড়াতে। সেই সত্য কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মনে মনে স্বাতিকে ধন্যবাদ জানালুম।

রাণা বলল : এই এসে পড়ল বলে।

আহ্নিক সেরে মামা এসে টেবলে বসলেন। ঠাকুর খাবার আনতে লাগল থালায় করে। আমি আর স্বাতি বসেছিলুম এক ধারে, অন্য ধারে রাণা আর মিত্রা। মামার সামনের চেয়ারটা পড়ে রইল, মামী বসলেন না। তিনি যে বসবেন না আমি তা জানতুম, কিন্তু রাণারা তবু অপেক্ষা করতে লাগল।

এস শুরু করি।

বলে মামা ভাতে হাত দিলেন। রাণা ও মিত্রা তবু হাত গুটিয়ে বসে রইল। মিত্রা ঘন ঘন চাইতে লাগল রান্নাঘরের দরজার দিকে।

বললুম : মামীমা এখন খেতে বসবেন না।

ওমা, মার জন্য অপেক্ষা করছেন বুঝি!

বলে স্বাতি হেসে ফেলল।

না না, অপেক্ষা করব কেন!

বলেই রাণা খেতে শুরু করল।

অল্লক্ষণ পরেই মামী বেরিয়ে এলেন। চেয়ারখানা আরও একটু তফাতে টেনে খাওয়া দেখতে বসলেন।

মিত্রা তার কুকুরকে টেবলে বসাবে না মাটিতে, ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিচেই রাখল। দু টুকরো মাংস মেখে একমুঠো ভাত দিল নিচে। বড় বড় চোখে মামী তার কাণ্ড দেখছিলেন। আমি জানি, পরে তিনি সমস্ত ঘরটা জল দিয়ে ধোয়াবেন।

মিত্রা ঠিক আমার সামনেই বসে ছিল। প্রথমটায় টেবলের উপর কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করল, তাতে ব্যর্থ হয়ে খেতে শুরু করল। দেখছিলুম, তার সরু সরু আঙুলের ডগা দিয়ে শাক শুক্ত

সরিয়ে রাখল। এক টুকরো মাছ ভেঙে ছেলেমানুষের মতো কাঁটা বাছতে লাগল।

রাণা বলল: খাবার কষ্ট পেয়েছিলুম বিলেতে গিয়ে। সে কষ্ট জীবনে ভুলব না।

মামী দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: সে কি, সে দেশে খাবার কষ্ট!

শ্রোতা পেয়ে রাণা বলল: আর বলেন কেন! এক বুড়ির বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ছিলুম। সব খাবার একেবারে মাপা জোখা। নিজেরাও কম খায়, আমাকেও না খাইয়ে মেরেছে।

মামীর চোখের দৃষ্টি সিক্ত হল। বেশ বুঝতে পারলুম যে মনে মনে তিনি রাণার খাবার কষ্ট অনুভব করতে পারছেন। বললেন: কেন কম খায় তারা?

রাণা বলল: যুদ্ধের সময় কণ্ট্রোল ছিল সব কিছুর ওপর। কম খাবার অভ্যাসকে তারা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

মামী বললেন: কিন্তু কম খেয়ে শরীর কী করে চলবে?

রাণা তখুনি জবাব দিল: আমার চলত না, বাইরে কিছু খেতেই হত।

এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল দেখে মামী বেশ আশ্বস্ত হয়ে বললেন: ঠাকুর, আর দুটি ভাত দাও তো এই পাতে।

রাণা আপত্তি করে বলল: না না, আর ভাত নয়, এ কটাই খেতে পারব না দেখছি।

মামা হেসে বললেন: অনেক দিন কম খেয়েছ কিনা, তাই উনি তোমায় পুষিয়ে নিতে বলছেন।

আমরাও হেসে ফেললুম।

মিত্রার নিজের খাওয়ার চেয়ে তার কুকুরের খাওয়ার উপর দৃষ্টি বেশি ছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অল্প কটি ভাত মুখে দিয়েছিল। সে দিকে লক্ষ্য করে মামী বললেন: তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না মা!

মিত্রা তার ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিয়ে একটা ঢেকুর তুলল।

বলল : দেখছেন, কত খেয়েছি !

মামী হেসে ফেললেন : ছেলে মানুষ কর নি কিনা, তাই ওই ঢেকুরের মানে জান না।

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামী বললেন : ছোট ছেলে কোলের ওপর ফেলে যখন ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াবে, তখন এক বাটি খাওয়াবার পর ছেলেকে একটু উঁচু করে আলতো ভাবে নাড়া দেবে। একটা ঢেকুর উঠলেই নিশ্চিন্ত মনে আর এক বাটি খাওয়াও।

আমরা হাসলুম, কিন্তু মিত্রার মুখ রাঙা হল। এমনি ধরনের কথা শোনায় সে বুঝি আদৌ অভ্যস্ত নয়। এর পর আর কথা কইল না অনেকক্ষণ।

মামা বললেন : দু বাটি দুধ খাওয়াবার নমুনা দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল। শরীর তার রোগার দিকেই, কিন্তু ফ্যাকাশে নয়। জীবনের চাঞ্চল্য আছে দেহের রক্তবিন্দুতে। নতুন লোকের সামনে নিজের প্রসঙ্গ এড়াতে চায় বলেই চুপ করে রইল। কিন্তু মামা নিজের কথারই জের টানলেন, বললেন : ঝড়ের টানে উড়েই যাচ্ছে।

আমি বাধা দিয়ে বললুম : কেন ওর দিকে নজর দিচ্ছেন মামাবাবু !

বলে ডান হাতের এঁটো কড়ে আঙুলটা দাঁতে কাটলুম।

রাণা হেসে উঠল, মিত্রা আরও গম্ভীর হল। স্বাতির চেয়েও সে বেশি রোগা, বেশি ফর্সা। পায়ে চঞ্চলতা নেই, মুখে নেই বাচালতা। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তার যে দৃষ্টি দেখি, তাতে স্নিগ্ধতাও নেই। কাচের উপর আলো পড়ার মতো দৃষ্টিটা সারাক্ষণ তীব্র দেখায়। তাকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য বললুম : আপনার কুকুরটার পেট ভরেছে তো ?

মিত্রা স্বস্তি পেল কিনা জানি নে, তবে আবার একবার নিচের দিকে তাকাল।

মামী বললেন : ওমা ভুলেই গিয়েছিলুম তোমার কুকুরটার কথা। খানিকটা দুধভাত মেখে দেব ?

মিত্রা বলল : না না, কী দরকার অত হাঙ্গামা করবার !

মামী উঠে এসেছিলেন, বললেন : কিছুই যে খায় নি !

বলে বেরিয়ে গেলেন।

রাণা বলল : খাওয়ার ফষ্টি নষ্টি ঠিক তোরই মতো। মাংসে একটু মসলা আর ঘি পড়েছে, মুখে রুচবে কেন ?

মামী একটা শান্‌কিতে খানিকটা দুধভাত এনে কুকুরের মুখের সামনে রাখলেন।

আমরা দইএর প্লেট টেনে নিয়েছিলুম। মিত্রাকে মামী বললেন : তুমিও তো কিছুই খেলে না মা, দুটি ভাত মেখে দইটা খাও।

আড় চোখে মিত্রা একবার টেবলের উপরটা দেখে নিল। আমার মনে হল যে হাত দিয়ে খেতে তার অসুবিধে হচ্ছে, কাঁসার থালাতে খেতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না। বললুম : একটা চামচে চাই আর একটা প্লেট ?

তার উত্তরের আগেই মামী কয়েকখানা চামচ এনে দিলেন।

৬

রাণাদের ড্রাইভার এসে বাইরে অপেক্ষা করছিল। খেয়ে উঠেই তারা চলে গেল। পাইপে অনেকখানি ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মামা বললেন ঃ একটা কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগছে।

আমি একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা লবঙ্গ চিবোচ্ছিলুম; কোন প্রশ্ন না করে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

ঘরে আর কেউ ছিল না। মামীর সামনে বসে স্বাতি তাঁর খাওয়া দেখছে। মুখে আর খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে মামা বললেন ঃ নীতিশ বাঁড়ুজ্জের কথাই ভাবছিলুম। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি. এ. পাশ করে সে বিলেত গেল, ফিরল সিভিলিয়ান হয়ে। আমি বাপের জমিদারী দেখছি শুনে বলল, ফুল। সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে। আস্কারা দিয়ে গভর্নমেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

মামা একটু থেমে বললেন ঃ বাঙলার জমিদারদের সম্বন্ধে এই তার মনোভাব। কিন্তু এই মনোভাব বদলাবার মতো কোন কারণ ঘটেছে বলে তো শুনি নি।

মামী খেতে খেতে মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলেন। তাঁদের টুকরো কথা কানেও আসছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মামার মনটি যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। তাঁর কলেজের বন্ধু ব্যানার্জি সাহেব আজ হঠাৎ কেন ভাব করতে চাইছেন, সেই প্রশ্নই তাঁর মনে জেগেছে। অনেক ভেবেও একটা সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

মামা বললেন ঃ এই বনের মোষ তাড়ানো কাজে দিল্লীতে যাতায়াত তো কম দিন করছি নে। সেও এখানে দীর্ঘ দিন আছে। হঠাৎ এই ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া দেখে মনে কেমন খটকা লাগছে।

খটকা তিনি আমার মনেও লাগিয়ে দিয়েছেন। তবু ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্য বললুম ঃ বুড়ো হয়েছেন তো, হয়তো পরিবর্তন এসেছে। অবসর নিতে আর কতই বা দেরি!

মামা বললেন ঃ তুমি জান না গোপাল, আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত করেছেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে মামা বললেন ঃ যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকত, তা হলেও বা ভাবতুম—

বলে তিনি থেমে গেলেন।

উপযুক্ত ভাগনে আছে, এ কথা ভাববার সাহস আমার হল না। শুধু বিদ্যায় ও বয়সে উপযুক্ত হলেই হয় না। পাত্রের প্রথম যোগ্যতা হল তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সেখানে আমার যোগ্যতার অঙ্ক শূন্য। ব্যানার্জি সাহেব যে তাঁর মেয়ে নিয়ে জলে পড়ে যান নি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। তবু একটা প্রশ্ন আমার মনে এল। বললুম ঃ জ্ঞানশঙ্করবাবুও কি আপনার সহপাঠী ছিলেন?

এ কথার জবাব না দিয়ে মামা খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে, আর গভীর ভাবে চিন্তা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে আমার সন্দেহকেই সমর্থন করে বললেন ঃ তোমার কথাই হয়তো ঠিক। জ্ঞানশঙ্করও পাস করেছে আমাদের সঙ্গে, তারপরে চাকরি না করে বাপের ব্যবসা দেখতে এ দেশে এসেছিল। নীতীশকে কোন কালেই আমল দেয় নি, আর এই জন্যেই নীতীশ তাকে শ্রদ্ধা করেছে। জ্ঞান-শঙ্করকে সে আজও টাকার কুমীর বলে জানে।

পাইপের আগুন শেষ হয়ে এসেছিল। বড় ছাইদানীর ভিতর

ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন: তোমাকে পোষ্য নিচ্ছে, সে খবর হয়তো কারও কাছে পেয়েছে।

স্বাতি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। মামা শোবার জন্য উঠে পড়লেন। বলে গেলেন: এ কথা আগে মনে হলে যমুনার গল্প তাদের শোনাতুম না।

স্বাতি মামাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। আমার পাশে একখানা চেয়ারে বসে বলল: কী কথা গোপালদা?

চারিধারটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললুম: তোমার বিয়ের কথা।

স্বাতি একটুও লজ্জিত হল না, বলল: চমৎকার কথা তো! তা আমার আড়ালে কেন?

তারপর হেসে যোগ করল: কত দূর কী হল শুনি।

বলে চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসল।

কথার ভিতর বেশ খানিকটা গাম্ভীর্য এনে বললুম: রাণাকে তোমার পছন্দ হয়?

স্বাতিও তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল: আমার আবার পছন্দ কী, তোমাদের পছন্দেই আমার পছন্দ।

বললুম: মামা বলছিলেন যে অমন ভাল ছেলে নাকি তিনি আজ পর্যন্ত দেখেন নি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আর এইটুকু বয়সেই অত বড় অফিসের ভেতর আলাদা ঘর পেয়েছে। একদিন হয়তো সারা অফিসটারই মালিক হয়ে বসবে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো?

স্বাতি বলল: বিলেত-টিলেত তো ঘুরেই এসেছে, কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললুম: যা বলেছ।

স্বাতি বলল: কিন্তু মা কী বলছিলেন জানো? বলছিলেন, ভাগ্য তোর গোপালদার। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পেল রাতারাতি।

মিত্রাদিকে পছন্দ হয়েছে তো গোপালদা ?

অর্ধেক চোখ বুজে বললুম ঃ আহা।

স্বাতি সশব্দে হেসে উঠল। আমিও যোগ দিলুম তার হাসিতে। তার পরেই তার বিষণ্ণ মুখ দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলুম ঃ কী হল ?

স্বাতি বলল ঃ তুমি কি রাজী হয়ে গেছ গোপালদা ?

তার প্রশ্নে আমি বেদনার আভাস পেয়ে বললুম ঃ কিসে বল তো ?

কেন, জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হতে ?

সত্যি কথা লুকোবার ইচ্ছা আমার ছিল না, বললুম ঃ রাজী না হয়ে উপায় কী বল! ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমায় রাজী হতে হয়েছে।

গল্পটা কী ভাবে শুরু করব ভাবছিলুম। স্বাতি বলল ঃ বাজিতে আমি হেরে গেছি। বাবা যখন চিঠি লিখছিলেন তোমাকে, আমি জোর গলায় বলেছিলাম যে এমন প্রস্তাবে গোপালদা কিছুতেই রাজী হবে না। বাবা বিশ্বাস করেন নি আমার কথা, বলেছিলেন যে আর্থিক সচ্ছলতা এমন জিনিস যে তার জন্যে সকলেরই কিছুটা মোহ আছে। সেই মোহ যার নেই, সে অতি-মানুষ, তেমন মানুষ দুনিয়ায় আজ বিরল। এরই সঙ্গে যোগ করেছিলেন যে জ্ঞানশঙ্করের পুরো ইতিহাসটা শুনলে কী করবে বলা শক্ত, ভয়ে হয়তো পিছিয়েও যেতে পারে। আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম যে ভয়ে পিছিয়ে যাবার ছেলে গোপালদা নয়, গোপালদা রাজী হবে না অন্য কারণে।

স্বাতি চুপ করল। আমিও আর কথা খুঁজে পেলুম না। মনে হল, স্বাতিই শুধু হেরে যায় নি, আমিও হেরে গেছি। বিত্তের যূপকাঠে আদর্শকে বলি দিয়ে আমি নিজের পরাজয় বরণ করেছি শোচনীয় ভাবে। আমার নূতন ভাগ্যোদয়ে আর যারাই করতালি দিক, পরিষ্কার বুঝতে পারলুম যে এই মেয়েটির কাছে আমি আজ নিশ্চিত রূপে অপদার্থ প্রতিপন্ন হয়ে গেছি।

এমন যে হবে আমি ভাবতে পারি নি। যখন রাজী হয়েছিলুম, তখন কি নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছি! মনে পড়ে না। হয়তো ভেবেওছি। তাতে আপত্তির কিছু ছিল না। তুনিয়াটা আজ চাঁদির পিছনে ছুটেছে। ধর্ম মোক্ষ সম্মান প্রতিষ্ঠা সবই আজ চাঁদির খেলায়। কিন্তু চাঁদি পেয়ে যে চাঁদ হারাতে হবে, তা কি সেদিন ভেবেছিলুম!

গভীর ভাবে বললুম: তুমি আমায় ভুল বুঝলে?

স্বাতি সে কথার উত্তর দিল না, বলল: বাবা তোমাকে সবই দিতে পারতেন, দিতেনও। প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে ধাক্কা দিয়েছিলে, তাতেও আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার মর্যাদা জ্ঞান দেখে। বাবা বিষয়ী লোক, খানিকটা সন্দেহ ছিল তোমার আচরণে। বলেছিলেন আমার কাছে মাথা নোয়াল না, নোয়াবে পরের কাছে। জগতের রীতিই এই। ত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। সংসারের অভাব অভিযোগ নয়ার লোকে দেখে যাক, তাতে বাধা নেই। আত্মীয় বন্ধুতে দেখলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। তোমাকে যখন আসতে লিখেছিলেন, আমার মনে হয় যে বাবা তখন বিশ্বাস করতেন যে তুমি রাজী হবে।

মনে মনে আমিও মামার কথা মেনে নিলুম। যত আপন তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। তুনিয়ার লোক কে কী ভাবছে আমি গ্রাহ্য করি না, আমি মরে গেলুম স্বাতি কী ভেবেছে মনে করে। মনে হল, আজ এই মুহূর্তে যদি স্বাতির কাছে এই সত্যটা গোপন রাখতে পারতুম, তা হলে চিঠি লিখে জ্ঞানশঙ্করবাবুকে আমার মতের পরিবর্তন জানিয়ে দিতে দ্বিধা হত না। কিন্তু হাতের ঢিল গেছে বেরিয়ে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই।

অনেক ক্ষণ ধরে অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়ে বললুম: কেন রাজী হতে হয়েছে সে কথা যদি শোন তো, আমি নিশ্চয়ই জানি, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে।

স্বাতি হেসে বলল: সে কথা কি আজ অবান্তর নয় গোপালদা?

আর কৈফিয়ৎ কিসের! তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবারই বা আমার কোন্ অধিকার!

এ তার অভিমানের কথা। বললুম: অধিকার দানের জিনিস নয় স্বাতি, অধিকার জবরদস্তি দখলের। ইচ্ছে করে কেউ অধিকার ছাড়ে না, অতর্কিতে আক্রমণ করে অধিকার কেড়ে নিতে হয়। অধিকারের লোভ থাকলে জোর খাটাতেই হবে।

স্বাতি তখুনি আমার জবাব দিল: লোভ আর কিসের রইল গোপালদা?

সত্যি কথা। এর পর আমার আর বলার কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পরে স্বাতি কথা কইল, বলল: তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম ইউনিভার্সিটির কনভোকেসনে। গোড়ার দিকে তুমি এম. এ.র ডিগ্রী নিলে। তখন তোমাকে চিনতাম না, কিন্তু ভুলতেও তোমাকে পারি নি। তোমার ভঙ্গিতে একটা দৃঢ়তা ছিল, একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ, যা আর কারও ভেতর দেখি নি। দ্বিতীয় দিন তোমাকে দেখলাম, আমাদের দোতলার বারান্দা থেকে। বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরে গেলে। বাবার কাছে সেদিন তোমার পরিচয় পেলাম। আজ লুকোব না গোপালদা, তোমার ঠিকানা জানলে আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতাম। আমাকে বেহায়া ভাবলেও তোমায় বলে আসতাম যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার রূপকে নয়, তোমার বিদ্যাকেও নয়, তোমার মর্যাদা বোধকে। সেই মর্যাদা বোধ আজ তুমি টাকার লোভে খোয়ালে!

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বলল: তৃতীয় বার তোমার দেখা পেলাম হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের ভেতর। রামখেলাওন হারিয়ে গেছে, সঙ্গে একজন লোক না নিয়ে কন্যাকুমারীর পথে পাড়ি দেবার সাহস বাবার ছিল না। তাঁর অনুরোধে তুমি রাজী হও নি, কেন হয়েছিলে আমি তা অনুমান করতে পারি। সেদিনই তোমার মনেরও খানিকটা পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। তার পর—

তার পরের ঘটনা আমার জানা। কয়েকটা দিন এক সঙ্গে ঘুরে তাঁরা যেমন আমায় চিনেছিলেন. আমিও চিনেছি তাঁদের। স্বাতিকে চিনতেও আমার ভুল হয় নি। অসাবধানতায় শুধু একটু হিসেবের ভুল হয়ে গেছে।

তার পরের ঘটনা কি তুমি সব ভুলে গেলে গোপালদা?

বড় করুণ শোনাল তার এই প্রশ্ন। বললুম: ভুলে গেলে কি আজ এইখানে এমন করে তোমার কাছে আসতুম!

স্বাতি বলল: কাছেই এসেছ; গল্প শুনতে আর গল্প বলতে। তার বেশি কিছুর সম্ভাবনা আজ শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে কি আর আমি শ্রদ্ধা করতে পারব?

বড়লোককে কি শ্রদ্ধা করা যায় না স্বাতি?

যাবে না কেন! চাঁদ আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু প্রণাম করি সূর্যকে। মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি তার নিজের ব্যক্তিত্বের জন্যে।

একটু থেমে বলল: চাঁদও আমাদের ভাল লাগে—ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু জীবনে তার প্রয়োজন নেই। আজ সারা সকাল ধরে যা দেখে এলাম, তা দেখতেও আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের মতো সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই বা কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হত। একটি সকাল আমাদের ঘরে বসে কাটত, এই তো!

আজ তোমাকে বড় রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল: ঠিক উল্টো। আমি আর রোমান্টিক হতে পারছি নে।

তবে আমি তোমাকে সেন্টিমেণ্টাল বলব।

সেন্টিমেণ্ট্স্ আছে বলেই তো আমরা মানুষ!

বললুম: ও তো দুর্বলতা, বুদ্ধি দিয়ে ওকে জয় করতে হবে।

বল, বিষ দিয়ে হৃদয়কে হত্যা করতে হবে।

এই অভিযোগের কোন উত্তর নেই।

বাহিরে চৈত্রের বাতাসে লেগেছে উত্তাপ। মনে হল ঘরের

ভিতরটাও যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মামার নাক ডাকছিল একটানা ভাবে, হঠাৎ তা থেমে যেতেই স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল: যাই, রাম-খোলাওনকে ডেকে দিই চায়ের জন্যে।

বলে বেরিয়ে গেল।

বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে এখন।

৭

মুখে খানিকটা জল দিয়ে মামাবাবু এসে বসবার ঘরে বসলেন। তামাকের পাউচ আর পাইপ সংগ্রহ করতে করতে বললেন: তুমি একটু গড়ালে না গোপাল, সারা দুপুর এমনি করে চেয়ারে বসেই কাটালে?

বললুম: দুপুরে গড়ানোর অভ্যাস তো আমার নেই।

সে কথা কানে না তুলে মামা বললেন: স্বাতি কোথায়?

রামখেলাওনকে জাগাতে গেছে।

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: চায়ের সময় হয়েছে যে!

মামা বললেন: সত্যিই তো, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে দেখছি।

রামখেলাওনকে জাগিয়ে স্বাতি ফিরে এসে বলল: এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দেব বাবা?

জল!

মামা মুখ বাঁকালেন একটুখানি, তারপর বললেন: দিল্লীর জল বড় বিস্বাদ লাগে মা, তার চেয়ে গরম জলই ভাল।

স্বাতি বসল মামার কাছ ঘেঁষে। ফুৎ করে তিনি তাঁর পাইপ ধরালেন, গভীর ভাবে টানলেন কিছুক্ষণ, তারপর গল্প শুরু করলেন: তুমি আসার পর থেকে নেই-কাজে এমন জড়িয়ে আছি যে কিছুই তোমার কাছে শোনা হল না।

একটু থেমে বললেন: জ্ঞানশঙ্কর কী করছে আজকাল?

বললুম: চন্দ্রমল্লিকার কালচার।

সে কি!

মামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বললুম: তাই তো এলাহাবাদে দেখে এলুম। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কয়েক শো গাছের পরিচর্যাতে মেতে আছেন। এখন মরসুম নয়, তাইতেই একটু ফুরসৎ। নইলে চারা তৈরির সময় এলে তাঁর নাওয়া খাওয়ার সময় থাকবে না।

স্বাতিও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল: বললুম: সত্যিই তাঁর এখন ছুটির দিন। ফুল যা ফোটাবার তা শীতের সময়েই শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাথা-ছাঁটা শক্ত গোড়াগুলো। নিচে থেকে ফ্যাঁকড়া বার করবার জন্যে প্রবল উৎসাহে জল ঢালাচ্ছেন। বেরিয়েছেও কিছু। সে কি এক আধটা মামাবাবু, পেছনে একটা গোটা ক্ষেত, সামনে কয়েক শো টব। বলছেন, একা আর পেরে উঠছেন না। একটি কাজ মালিদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি নেই। ভুল করবেই তারা, ভুল করবার জন্যেই যেন জুটেছে তাঁর বাগানে। সত্যি বলছি, ভুল আমিও করব, যে কেউ করবে। গোড়ায় কাঠি পুঁতে পুঁতে গাছের নাম আর জাত লেখা হচ্ছে। তার জন্যে লেখাপড়া-জানা লোক একজন রাখা হয়েছে। সেও ভুল করছে। একটার লেবেল আর একটায় লাগাচ্ছে। টের পেলেই জাত-ধর্ম গেল বলে তিনি কুরুক্ষেত্র বাধাচ্ছেন। আমায় বলছেন, গোপাল, এখানে এরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, মরসুমে যে কী করবে সেই দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি। তার ওপর জাপান থেকে এ বছর নতুন গাছ আনাচ্ছি।

হেসে বললুম: সেই চারার নাম ধাম শুনে আমারও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। জাপানে নাকি এখন সাত শো জাতের চন্দ্রমল্লিকা। উনি লেখালেখি করিয়ে তাকে তাদের ধর্ম ও গুণ অনুসারে সত্তর জাতে ভাগ করিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেক জাতের দুটি করে চারা আসছে এবারের মরসুমে। প্লেনে আসবে টোকিও থেকে কলকাতা, আর কলকাতা থেকে এলাহাবাদ। গভর্নমেণ্টের কাছ

থেকে ইমপোর্ট লাইসেন্স না পেলে লুকিয়ে পাইলটের হাতে আনাবেন, সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেছে। এই সব বলে আমায় বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেলেন। বললেন, এই দেখ সারের ব্যবস্থা কেমন করেছি। বোকার মতো আমি সেই ব্যবস্থা দেখলুম। সারি সারি কবরের মতো বড় বড় চৌকো গর্ত, তার মাথায় কালো টিনের পাতে শাদা অক্ষরে সারের নাম লেখা—গোবর সার, পাতা সার, রাবিশ গুঁড়ো, মিহি বালি। ছোট ছোট গর্তও আছে, তার ওপরে লেখা—কাঠের ছাই, কাঠকয়লার গুঁড়ো, হাড়ের গুঁড়ো, রান্নাঘরের ঝুল। আরও নানা রকম সার আছে—ছাগল, মুরগি, পায়রার। সে এক বিচিত্র স্থান।

মামা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, আর কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বাতির মুখ।

বললুম ঃ এ-ই সব নয়। একটা চালার নিচে শয়ে শয়ে টব রাখা আছে, নানা আকারের নানা আকৃতির। চার ইঞ্চি টব, উনি বললেন, প্রথম কাটিঙের জন্যে। মাটি-শুদ্ধ পুরনো টব উল্টে শেকড়-শুদ্ধ কোঁড় লাগিয়েছিলেন হাপরের মাটিতে। সেখান থেকে তুলে প্রথম কাটিঙ লাগাবেন এই সব টবে। তার জন্যে মাটি তৈরি হচ্ছে। দু ভাগ পলিমাটি, এক ভাগ পাতা সার, আধ ভাগ রাবিশ গুঁড়ো, সিকি ভাগ মিহি বালি, সিকি ভাগ কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়ো আর রান্না-ঘরের ঝুল।

খিল খিল করে স্বাতি হেসে উঠল, বলল ঃ রান্নাঘরের ঝুলও আবার সার নাকি ?

হেসে বললুম ঃ ওটা প্রথম কাটিঙ পর্যন্তই, তারপর আর লাগে না। দ্বিতীয় কাটিঙের জন্যে লাগে দু ভাগ দো আঁশ মাটি, এক ভাগ পাতা সার, আধ ভাগ গোবর সার, সিকি ভাগ রাবিশ গুঁড়ো, সিকি ভাগ হাড়ের গুঁড়ো আর কাঠের ছাই। বর্ষার কিছু আগে আগে এর জন্যে চাই ছ ইঞ্চি টব।

আমার জ্ঞানের বহর দেখে মামা হেসে ফেলেছিলেন। বললেন : এ সব শিখলে কোথায় ?

বললুম : এলাহাবাদ পৌঁছে অবধি তো এই সবই শিখছি। আর তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেছি বলেই তো এত আদর পেলুম। কর্তা কী বলছেন জানেন ? বলছেন, আমার নাকি প্রতিভা আছে। এক ডজন লোককে কয়েক বছরে যা শেখাতে পারেন নি, আমি নাকি কয়েক দিনেই তা শিখে ফেলেছি।

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল : ধন্যি তোমার প্রতিভা। রাম-খেলাওনের বদলিতেও তুমি তোমার প্রতিভা দেখিয়েছিলে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : জান এবারের শীতে আমার কত কাজ ? লক্ষ্মীছাড়া মালিগুলো সমস্ত ফুলের নাম ওলট-পালট করে ফেলেছে। আর সেই আনাড়ি বাবুটি। হলদে ফুল দেখেছে কি তার ওপর সেঁটে রেখেছে বারবারা ফিলিপ্‌স্‌ নাম। আর হলদে কি শুধু একটা ? সান হাল্কা হলদে, তারপর রোজার্স টম্পসন, বি. স্টকার্ট, মিসেস ডব্লু সণ্ডার্স। গাঢ় হলদে চাই ? আছে ডাচেস অব সাদার্ল্যাণ্ড, অস্টিন চেম্বারলেইন, কমরেড, জেনারেল হাট্‌ন্‌। একটু কমলা লেবুর রঙ মিশিয়ে দিলেই এডিথ ক্যাভেল, আর তামা মেশালেই পল, আর লালের ছিটে পড়েছে কি রেডিয়ান্স।

বড় বড় চোখে মামা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হেসে বললুম : শাদারই কি শেষ আছে ? মর্নিং গ্লোরি, লুইসা পকেট, জাপানীস্‌ হোয়াইট, জেনারেল পেঁতা। তবে তুলনা নেই উইলিয়াম টার্নারের।

স্বাতি এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল : কী করে সেখানে থাকবে গোপালদা ?

তার ভাবনার কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম, বললুম : এ তো শুধু দিনের বেলার গল্পই শুনলে, যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে আকাশে, সেই সময়ের কথা।

মামী কখন এসে গল্প শুনতে বসেছিলেন টের পাই নি। তাঁর উপস্থিতি জানলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে। বললেন: গিন্নী কী করেন সারা দিন? পূজো আর্চা নিয়েই থাকেন বুঝি?

বললুম: পূজোই বটে, তবে দেবতারও নয়, মানুষেরও নয়। কয়েকটি শিশু শৈশবেই মারা যাবার পর বড় গিন্নী বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন, আর এলাহাবাদে ছোট গিন্নী এখন এক দঙ্গল কুকুর পালন করছেন। চন্দ্রমল্লিকার আগে কর্তার কুকুরের সখ ছিল। নানা দেশের নানা জাতের কুকুর। অগুনতি কুকুর, গোটাকয়েক মেথর নিয়ে কর্তা নাকি সারাদিন সেগুলোরই পরিচর্যা করতেন। রাতারাতি এ কাজ ছাড়লেন এক বন্ধুর কথায়। বন্ধু বললেন, মানুষই বল আর কুকুরই বল, তার পরিচর্যার দায়িত্ব মেয়েদের। তোমার অন্য 'হবি' চাই। আর তোমার যোগ্য 'হবি' আমার জানা আছে। কালই কিছু চন্দ্রমল্লিকার চারা পাঠিয়ে দেব। পাঠিয়েছিলেন ফুল-ফোটা গাছ—লাল ড্রাগন, গ্রীন সেনসেসন, আর দোরঙা আলফ্রেড সিম্পসন। কর্তা এক দিনেই মুগ্ধ হলেন। কুকুর ছেড়ে ফুল ধরলেন রাতারাতি। শোনা যায় গিন্নী তখন টাট পুষ্পপাত্র আর কোশাকুশি কিনে ঠাকুরের পায়ে মনোনিবেশের চেষ্টা ধরেছিলেন। কুকুরের কান্না শুনলেন ছ দিন, কর্তাকে বকাবকি করলেন চার দিন। শেষে সপ্তাহ না ঘুরতেই নিজের হাতে কুকুরের ভার নিয়ে নিলেন। টাটশুদ্ধ ঠাকুর উঠল তাকের ওপর।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে স্বাতি প্রশ্ন করল: কত কুকুর আছে বাড়িতে?

বললুম: তা নিতান্ত কম হবে না। কয়েক জাতের টেরিয়ার—স্কচ টেরিয়ার, আইরিশ টেরিয়ার, ফক্স টেরিয়ার, এয়ারডেল টেরিয়ার। আছে গ্রে হাউণ্ড, ব্লাড হাউণ্ড, বুলডগ, আলসেসিয়ান। তার ওপর আছে ককার স্প্যানিয়েল, গোল্ডেন রিট্রাইভার, ডাকশুন আর কয়েক জাতের পুড্‌ল।

স্বাতি বলল : পুড্‌ল কুকুর বুঝি নতুন চিনেছ ?

উত্তর না দিয়ে আমি শুধু হাসলুম।

মামীর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। বললেন : মেথর আর কুকুর নিয়েই থাকেন সারা দিন ?

বললুম : সাবান দিয়ে চান করায় মেথরেরা। তারপর ঝিএরা গঙ্গাজল ঢেলে শুদ্ধ করে দেয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গঙ্গাজলে না ভিজলে তারা বারান্দায় উঠতে পায় না।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : এত গঙ্গাজল রোজ আসে কোথা থেকে ?

বললুম : অন্দর মহলে সিঁড়ির কাছে একটা বাঁধানো চৌবাচ্চা তৈরি হয়েছে। কলের জলে তা ভরে। সকাল বেলায় স্নান সেরে তিনি নিজের হাতে এক ঘটি গঙ্গাজল ঢালেন সেই চৌবাচ্চায়। তারপর কুকুরগুলোকে একে একে সেই চৌবাচ্চায় চুবিয়ে তোলা হয়।

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন : এতই যখন বিচার, তখন মেথরের বদলি চাকর রাখলেই তো হয়।

বললুম : কী করে হবে ? অমন এক্সপার্ট লোকগুলোকে তাড়িয়ে কতগুলো আনাড়ির হাতে ছেড়ে দিলে ঐ সব ভাল ভাল কুকুর কি আর বাঁচবে ?

গম্ভীর হবার চেষ্টা করে মামা উত্তর দিলেন : সত্যিই তো !

স্বাতি হাসল তাঁর কথা বলার ধরন দেখে।

আমি বললুম : হাসছ স্বাতি ! তাঁদের দুঃখ তুমি জান না। জানলে তোমারও দুঃখ হত। কয়েকটা দিনেই আমি তাঁদের অন্তরের পরিচয় পেয়ে গেছি।

মামী তাঁর বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে ধরেছিলেন আমার মুখের উপর। আমি সেই প্রৌঢ় দম্পতির আর একটি গল্প শোনালুম তাঁকে, যে গল্প তাঁরা সযত্নে আড়াল করে রেখেছেন সাধারণের চোখের সামনে থেকে। বললুম : কয়েকটা দিন কাটাবার পরেই কর্তা আমাকে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেলেন। সে কী লাইব্রেরি ! চোখ

জুড়িয়ে যায় দেখে। ইচ্ছে করে, সারা দিন সেই লাইব্রেরি ঘরেই পড়ে থাকি। সে কথা থাক। বলছিলুম কর্তার কথা। আমাকে পাশে বসিয়ে মাসিমার কথা বললেন। মাসিমা, হ্যাঁ মাসিমাই তো। কর্তার প্রথম পক্ষ আমার মায়ের সম্বন্ধে বোন হন। কর্তার মুখেই সে কথা প্রথম শুনলুম। কী বললেন জানেন?

উত্তরের আশা করি নি, তাই নিজেই জবাব দিলুম: বললেন, গোপাল, সন্তানের অভাব যে কত বড় অভাব, তোমার মাসিদের দেখলে তা খানিকটা বুঝবে। এক জন তো সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়েছেন, আর এক জন কুকুর নিয়েই পাগল। শখের জন্যে যে পাগলামি নয়, দু দিন থাকলেই তা টের পাবে। একটা কিছু আঁকড়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা। আর এক দিন ঠিক এমনি করে পাকড়ে বললেন, গোপাল, তুমি ভাবছ, আমি আমার নিজের স্বার্থে তোমাকে ধরে রাখতে চাইছি। ভুলেও তা ভেবো না। ধর্ম বলে আমি যা মানি সে কুসংস্কার নয়। আমার মুখে আগুন কে দিল, আর গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি কেউ দিল কি না, সে দুর্ভাবনায় আমার ঘুম বন্ধ হয় নি। আমার দুঃখ তোমার মাসিদের কষ্ট দেখে। তাদের কত সাধ ছিল, কিছুই পূর্ণ হল না। তোমাকে পেলে তোমার মাসিও হয়তো ফিরে আসবেন বৃন্দাবন থেকে।

স্থির দৃষ্টিতে মামী আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললুম: এক দিন একটু রাতে মাসি এলেন আমার কাছে। বেশ চুপিচুপি নিঃশব্দ পদক্ষেপে। আমি তখন লাইব্রেরি ঘরে একখানা প্রাচীন বই পড়ছিলুম। তাঁর আসাটা লক্ষ্য করি নি। বইএর ওপর ছায়া দেখে চমকে উঠলুম। আরও চমকালুম তাঁকে চিনতে পেরে। উঠতে যাচ্ছিলুম, কাঁধে একটু চাপ দিয়ে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। নিজে বসলেন পাশের চেয়ারে। বললেন, বাবা গোপাল, তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আছে। ব্যস্ত হয়ে বললুম, ছি ছি মাসিমা, একি বলছেন আপনি! বাধা দিয়ে মাসি বললেন, না না, ঠিকই

বলছি আমি। তুমিই ওঁকে বাঁচাতে পার। তুমি চলে গেলে উনি কিছুতেই বাঁচবেন না। ও সব ফুলটুল কিছুই নয় বাবা, সব ফাঁকি। ওই নিয়ে মেতে আছেন দেখিয়ে আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছেন। এত দিন সংসার করছি, ওঁকে চিনতে কি আমার বাকি আছে। পণ্ডিত লোক, পাঁচ জনের কাছে মনের দুঃখ লুকোচ্ছেন পাগল সেজে। দু হাত ধরে মাসি সেদিন কেঁদেই ফেললেন, বললেন, তুমি আমার ছেলের মতো বাবা, তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। ওঁকে তোমার বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।

একটু দম নিয়ে বললুম : যে মাসিকে সারা দিন এক পাল দুর্দান্ত কুকুরের শেকল টেনে বেড়াতে দেখি, তাঁর চোখে জল দেখেছি। তিনি চলে যাবার পরেও বইএ মন দিতে পারলুম না। খানিক পরে কর্তা এলেন ঘরে। চুপ করে পাশে বসে রইলেন অনেক ক্ষণ। তারপর কথা বললেন, ভেবে দেখলুম, দুটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে তোমার ওপর। নিজের কথা আমি ভাবি নে। বাকি জীবনটা এই লাইব্রেরি ঘরে বই নিয়েই কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাঁরা বড় অসহায়। তাঁদের জন্যই আমার ভাবনা। তারপর দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি রাজী হয়ে যাও গোপাল, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। পয়সার লোভ তোমার নেই জানি, কিন্তু মানুষের দামও কি তুমি দেবে না? ছলছল করে উঠল কর্তার বড় বড় দুটি চোখ। কিছুতেই আমি না বলতে পারলুম না।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মামীর চোখও হঠাৎ ছলছল করে উঠল। শুধু স্বাতির মুখ দেখে তার মনের ভাব আমি পড়তে পারলুম না।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলুম : আমি কি ভুল করেছি?

মামা কোন উত্তর দিলেন না, মামীও না। স্বাতিও নীরবে বসে রইল।

বললুম : মানুষের জীবনের চেয়েও কি আমার অহংকার বড়!

রামখেলাওন চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলের উপর রেখেছিল। সেগুলো টেনে নিয়ে স্বাতি চা তৈরি করতে বসল।

৮

বিকালের রোদ তখন পড়ে গেছে। ঝির ঝির করে বাতাস আসছে সামনে থেকে। মামা আর মামী দুখানা বেতের চেয়ার নামিয়ে বাহিরে বসলেন।

এসে অবধি আমি একখানি সেতার দেখছিলুম ঘরের কোণায় টাঙানো আছে। কে বাজায় তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাই নি। এবারে আবার সে দিকে নজর পড়তেই প্রশ্নটা জানিয়ে ফেললুম: কে বাজায় এটা?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হাসল।

তোমারই সম্পত্তি বুঝি? কিন্তু জানতুম না তো!

স্বাতি বলল: সব কথাই যে জানতে হবে তার কী মানে আছে!

এক সঙ্গে থেকেও জানি নে, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

দিন কয়েক এক সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাকেই কি এক সঙ্গে থাকা বলে!

তর্ক থাক। এবারে কিছু বাজিয়ে শোনাও।

সঙ্গত করতে পারবে?

স্বাতির প্রশ্নে খানিকটা কৌতুক ছিল।

বললুম: আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বাজনা শুনতে চাই।

সে কি!

আমি সত্যি কথাই বলছি। তবলার সঙ্গত না হলেও তোমার হাতের সুর আমি উপভোগ করতে পারব। তোমার দিকে যখন চাই

তখন তোমাকেই দেখি, রাণার পাশে তোমাকে কেমন মানাবে সে কথা ভাবি নে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জান না, এই তর্কে তারই প্রমাণ দিলে।

তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীতশাস্ত্র সম্মত না হলেও তাতে ভেজাল নেই। তোমার সুরও তেমনি খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই আঘাত করবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুরু করতে পার।

স্বাতি তবু উঠল না, বলল: আর একটা বাধা আছে. এখন বিকেল, এ সময়ের কোন রাগিণী আমার জানা নেই।

জানালার দিকে চেয়ে বললুম: সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। তার জন্যে শুনেছি অনেক রাগিণী আছে।

শ্রীরাগ আমার ভাল লাগে না।

বসন্তের কোন রাগিণী বাজাও, চৈত্র এখনও শেষ হয় নি।

আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে। তাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে পারব কোন দিন!

এ কথার উত্তর সহসা আমার মুখে জোগাল না।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি নিজেই বলল: রাত গভীর হোক, তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাব। সেই আমার মনের সুর হবে।

এ কথারও আমি জবাব দিলুম না।

এবার অনেক ক্ষণ পরে স্বাতি কথা কইল। বলল: গোপালদা, এলাহাবাদে কী করে তোমার সময় কাটবে ভেবে দেখেছ কি?

বললুম: না।

ভেবে না দেখেই রাজী হয়ে গেলে?

রাজী হয়েছি বোলো না, বল আপত্তি করতে পারি নি।

ওই এক কথাই হল।

এক কথা নয় স্বাতি, এক কথা হলে মনে আরাম পেতুম। অনুরোধে ঢেঁকি গেলার গল্প আছে, এও আমার ঢেঁকি গেলা।

স্বাতি এ কথার উত্তর এড়িয়ে গেল, বলল: সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ফুলের চাষ আর কুকুরের পরিচর্যা করবে, তার পরেও যদি ক্লান্ত না হও তো লাইব্রেরিতে বসবে বই নিয়ে। এই জীবন। এরই জন্যে কি তুমি এত লেখাপড়া শিখেছিলে?

আমার হাসি পেল। বললুম: সারা জীবন বসে খাব, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

স্বাতি চটে উঠল, বলল: একে তুমি সৌভাগ্য বল গোপালদা?

বাধা দিয়ে আমি বললুম: সৌভাগ্য নয়? আজ যারা আমার অবস্থা দেখে নাক সেঁটকাচ্ছে, কাল তারাই আসবে আমায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। রাতারাতি আমার জীবনের মূল্য বদলে যাচ্ছে, সে কি কম কথা?

স্বাতি স্তম্ভিত হল আমার উত্তর শুনে, ক্ষুব্ধও হল। বলল: রাতারাতি তোমার জীবনের আদর্শ বদলে যাবে, এ কথা আমি ভাবতে পারি নি। এই পরিবর্তনের কথা বিশ্বাস করতেও আমার সময় লাগবে।

সেই এক সুর। এক অভিযোগ। মেয়েটা সত্যিই আঘাত পেয়েছে।

একটু থেমে বলল: পয়সার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি না। জীবন ধারণের জন্যে তার প্রয়োজন যত, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে। তোমার পয়সা ও প্রতিষ্ঠা থাকলে এ পরিবারের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ যে অন্য রকম হত, তাও স্বীকার করি।

মনে মনে আমিও তা অনুভব করি। তাই চুপ করে রইলুম।

স্বাতি বলল: কিন্তু তার জন্যে কি জীবনটা বিকিয়ে দিতে হবে গোপালদা!

বিকিয়ে কোথায় দিলুম ?

বিকোনো আর কাকে বলে বল ? কোথায় রইল তোমার স্বাতন্ত্র্য, তোমার স্বাধীনতা ! জীবনের লক্ষ্যকে অনুসরণ করবার স্বাধীনতাই যদি ঘুচে গেল তো ভারী একটা দেহকে বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কোথায় ?

জীবনের আবার লক্ষ্য কী ?

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আমাকে ঠকাতে চেয়ো না গোপালদা, ঠকাতে পারবেও না। তোমাকে যদি না চিনতাম, তবে এমনি করে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি আমার হত না। রাণাবাবু এমন কাজ করলে হাততালি দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে বাহবা দিতাম।

একজনের মনের উপর জোর খাটে না আর একজনের। তাইতেই বোধ হয় মন-জানাজানির আকূতি বুকের ভিতর ঠেলে ওঠে। বাহিরটা নিয়ে যে সুখ সে ক্ষণকালের, সেই মোহ উত্তীর্ণ হলেই চাই মনের সংবাদ। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই দেহটা মরে যায়, মনের মরণ নেই। আজ আমার মোহভঙ্গ হচ্ছে। বললুম : রাণার সঙ্গে আমার প্রভেদ তো খুঁজে পাই নি।

স্বাতি তখনই জবাব দিল, বলল : আজ পাও না, আজ প্রভেদ নেই বলে। যে দিন ছিল, সে দিন আমি তোমায় দেখেছিলাম। সে দিনের কথা যে তোমার মতো এমন চট করে আমি ভুলতে পারব না।

কান্নার মতো করুণ শোনাল স্বাতির গলার স্বর, বলল : এ সব গল্প তুমি মিত্রাদির কাছে কোরো। সে তোমার সৌভাগ্যের তারিফ করবে।

আলাপটা লঘু করবার জন্য আমি হেসে বললুম : কিছু বলেছে সে ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে যেন খানিকটা ঘৃণার সন্ধান পেলুম। এমন আদর্শবাদী মেয়ে আজও আছে জেনে আশ্চর্য লাগছে।

যা বলেছে তা শুনতে ভাল লাগবে না।

তা না লাগুক, তবু জানবার কৌতূহল আছে।

স্বাতি ভাবল খানিকক্ষণ, তার পর ভ্রূকুটি করে জবাব দিল: যা বলেছে তার সরল মানে হল এই রকম—তুমি যা, তা তো জানতে কারও বাকি নেই। কুবেরের ঐশ্বর্য পেলেও তোমার মনের যে প্রসার হবে না, তাতে আর সন্দেহ নেই এতটুকু।

স্বাতির ক্ষোভের ভিতর এমনি কোন ক্ষতের চিহ্ন আমি দেখছিলুম। মিত্রা যে সংসারে লালিত, তারা চিরদিনই আমাদের এই চোখে দেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার তারা পেয়েছে রাজার জাতের কাছ থেকে। আজ প্রজার জাত হাতে নিয়েছে রাজদণ্ড, তবু তাদের মত বদলায় নি। রাজার জাতের অনুগ্রহ যারা এক দিন পেয়েছে, তাদের মত হয়তো বদলাবেও না। হেসে বললুম: এতে দুঃখ পাবার কী আছে? মানুষকে তারা কোন দিন শ্রদ্ধা করে নি। তার জন্যে আরও সময় লাগবে। মানুষকে মানুষ বলে যে দিন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখব, সে দিন আমাদের মুক্তি হবে, দীর্ঘ দিনের দাসত্ব ঘুচবে সেদিন।

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে স্বাতি তার আপত্তি জানাল, বলল: না না, গোপালদা, এ সব তত্ত্বের কথা, তর্কের কথা। তুমি নিজের কথা বল। পাঁচজনের কাছে এমন ছোট হয়ে যাবে, এ আমি সইতে পারব না।

স্বাতি হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু বাধা পেল মামীর কথায়। ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিয়ে মামী বললেন: সন্ধ্যেটা তোমরা অন্ধকারেই কাটালে, বাতি জ্বালবারও দরকার হল না।

আমি লজ্জা পেলুম। ঘরে বসে বাহিরের অন্ধকার এতক্ষণ দেখতে পাই নি, আলোয় এবারে তা দেখলুম। দরজার দিকে চেয়েই দেখি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো চৌকাঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

স্বাতি অপ্রতিভ হল না, বলল: তোমার সন্ধ্যে হয়েছে মা?

এই তো সারলুম।

বাবা কোথায়?

স্বাতির প্রশ্ন শুনে মামী হেসে ফেললেন, বললেন: তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বাড়ি ছিলি না।

সত্যিই ছিল না। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই মামী বললেন: বাইরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। বাধা দিয়ে মামী বললেন: তুমি উঠলে কেন, তোমার কাছেই যে এলুম।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। মামী গল্প করতে ভালবাসেন, এ কথা আমার জানা ছিল না। বসে পড়ে বললুম: আমার কাছে!

মামী হেসে বললেন: বাইরে বসে আমরা তোমার কথাই আলোচনা করছিলুম। ও-বাড়িতে ছেলে কেন বাঁচে না তার কারণ হয়তো—

প্রশ্নটা মামী শেষ করলেন না, কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম। সংস্কার যখন বারে বারে সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন আর তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সমস্যা আমার জীবন-মরণের। বৈজ্ঞানিক প্রথায় তাকে যাচাই না করে হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত হয়েছে কি না, মামী হয়তো সেই কথাই জানতে চাইছেন। বললুম: সে সব জানবার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে মামীমা। রাজী যখন হয়েছি, তখন প্রাণের ভয়ে আর পিছিয়ে আসতে পারি নে।

উত্তরে মামী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

স্বাতি বলল: জীবনের চেয়ে কথার দামই তোমার কাছে বড় মনে হচ্ছে?

বললুম: যত দিন মা বেঁচে ছিলেন, তত দিনই আমার জীবনের দাম ছিল। আজ কে আমার জীবনের দাম দেবে?

স্বাতির কাছে কোন উত্তর পাব না জানি, তবু আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। তার চোখের ভাষায় মনের ভাব পড়তে পারি কিনা সেই লোভে। মনে হল, খানিকটা যেন পেরেছি। উত্তর দিতে না পারার বেদনা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল তার ছু চোখের দৃষ্টিতে।

আরও কিছু ভাববার আগেই মামীর উত্তর শুনতে পেলুন: বালাই ষাট! অমন কথা মুখে আনতে নেই গোপাল। মা নেই বলে কি আপনার জন তোমার কেউ নেই?

আমি তাঁকে আঘাত দিতে চাই নি বলে ফিরিয়ে নিলুম নিজের কথা। বললুম: আপনাদের স্নেহের কথা আমি কোন দিন ভুলব না।

স্বাতি বলল: সেটা তো বড় কথা নয় গোপালদা। আমাদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি চির দিনের মতো চুকে গেছে যে কয়েকটা মামুলি কথা বলে আমাদের ভুলিয়ে রেখে যাবে? বাবা-মার কাছে স্নেহ যদি কিছু পেয়েই থাকো তো তাঁদের এড়িয়ে যাওয়া তো তোমার চলবে না।

আমি আপত্তি জানালুম: কে বললে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি! এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন থাকলে আরও সহজে তা সারতে পারতুম, সেধে কৈফিয়ৎ দিতে আসতুম না।

এ সব হেঁয়ালী কথা মামীর ভাল লাগে না। তিনি সাদাসিধে মানুষ, সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব চান। তাই আমার কথা মেনে নিয়েই জানতে চাইলেন: জ্ঞানশঙ্করবাবুর কটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল?

এ খবর আমি বৃন্দাবনে মাসির কাছে পেয়েছি। বললুম: তিনটি। একটু বেশি বয়সে কর্তা বিয়ে করেছিলেন, সন্তানও হয়েছিল দেরিতে। ছুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ভূমিষ্ঠ হয়ে বছর না ঘুরতেই মারা যায়।

বাহিরের ভদ্রলোকটি চলে গিয়েছিলেন। মামা ঘরে এসে গল্প শুনতে বসলেন। মামী বললেন: আহা রে!

দু চোখ বিস্ফারিত করে মামা প্রশ্ন করলেন : আমাকে বলছ ?

স্বাতি হেসে উঠল। মামী বললেন : তোমাকে বলব কেন! কথা হচ্ছিল জ্ঞানশঙ্করবাবুর। গোপাল বলছে, প্রথম পক্ষের নাকি তিন তিনটি সন্তান হয়ে মারা যায়, বছরও ঘোরে নি।

এ গল্প মামার জানা। বললেন : কী করবে বল, যমুনা হলেন যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে যে কারও নিস্তার নেই, সে কথা জ্ঞানশঙ্কর বুঝল না।

আক্ষেপ করে মামী বললেন : নিজের ছেলেকে যমুনার জলে ফেলে দেওয়া, সেই বা কে পারে বল ?

মামা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন : একটা কথার জবাব দিতে পার গোপাল ?

বলুন।

মামা বললেন : জ্ঞানশঙ্করের বাড়িতে তাঁর আত্মীয় কেউ আছেন ?

তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেললুম।

মামা বললেন : হাসি নয় গোপাল, প্রশ্নটা অত হাল্কা ভেব না।

বললুম : বড় মাসির কাছে সে খবরও জেনে নিয়েছিলুম। তাঁর এক সম্বন্ধে ভাই হরিপদ তাঁর কাছে থেকেই লেখাপড়া শিখত।

জ্বল জ্বল করে উঠল মামার চোখ দুটো, বললেন : তারপর ?

বললুম : বছর তিনেকের মধ্যেই প্রথম ছেলে দুটো মারা গেল। সুস্থ স্বাস্থ্যবান ছেলে হত না, হত রুগ্‌ণ ক্ষীণজীবী ছেলে। ওষুধ আর পথ্য খেয়েই কয়েকটা মাস কাটাত, সাবুর পায়েস খেয়ে হত অন্নপ্রাশন। বছর দুয়েকের ব্যবধানে মেয়ে হল একটি। সরু সরু হাত পা, লিকলিকে রিকেটি চেহারা। প্যান প্যান করে কাঁদে, আর খেতে চায় না কিছুই। বোতলে দুধ ভরে আনে আয়া, মেয়েকে কোলে ফেলে সেই দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন মাসি, আর কর্তা নিজে সেই খাওয়ার তদ্বির করেন দূরে একটা মোড়ায় বসে। এক দিন—

পরম কৌতূহল নিয়ে মামা তাকালেন মামীর দিকে, তার পর নিজের চেয়ারখানা আরও একটু কাছে টেনে আনলেন।

বললুম: এক দিন কিছুতেই মেয়েটা দুধ খেতে চাইছিল না। রবারের ফুটো চুঁয়ে যেটুকু দুধ মুখে যাচ্ছিল সেটুকুও থু থু করে ফেলছিল বাইরে। কর্তা বললেন, দুধে চিনি দেয় নি নাকি? আয়া দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, দিয়েছি তো মা। মাসির বিশ্বাস হল না, একটুখানি হাতে ঢেলে চেখে দেখলেন। কেমন একটা নোনতা কটু স্বাদ, মিষ্টি নেই তাতে। মাসি বললেন, এ কোন্ চিনি আয়া? আয়া বলল, সেই বোয়েমের চিনি তো মা, বড় দানার সাদা চিনি। কর্তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেই চিনি, কিন্তু বোয়েমটি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আয়ার চাকরি গেল, আর হরিপদকে তাড়ানো হল বাড়ি থেকে। মাসি আপত্তি করেছিলেন, হরিপদর দোষ কী? এইটুকু ছেলে হরিপদ। গম্ভীর ভাবে কর্তা বলেছিলেন, হরিপদ আর এইটুকু নেই, দুবার ফেল করেছে থার্ড ক্লাসে। হস্টেলে থেকেই ও পড়ুক। কিন্তু তবু মেয়েটা বাঁচল না। কেঁদে ককিয়ে কয়েকটা দিন বেশি বেঁচে-ছিল মাত্র।

চিন্তিত ভাবে মামা বললেন: হরিপদ এখন কোথায়?

হরিপদর খবর আমি নিয়েছিলুম: বললুম: এলাহাবাদেই কী একটা চাকরি করে।

আলাপ হয়েছে তার সঙ্গে?

না, তার প্রয়োজন বোধ করি নি।

জ্ঞানশঙ্করেরও কি এই মত?

সংক্ষেপে জবাব দিলুম: জানি নে।

মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: জানি নে মানে? কিছু না জেনে শুনেই তুমি রাজী হতে পার, কিন্তু আমাদেরও তো একটা মতামত আছে।

স্বাতি খুশী হল মামার কথা শুনে। আমি তার উজ্জ্বল চোখে

সেই আনন্দের আভাস দেখতে পেলুম। কিন্তু আমার উত্তরটা একটু কঠিন হয়ে গেল, বললুম: আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই আমি কোন ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন দেখি নি।

তা দেখবে কেন: বলে মামা যেন গুমরে উঠলেন: তোমার বাপ আমাদের জ্বালিয়েছে, আর তুমি জ্বালাবে না।

এ স্নেহের অভিযোগ। দুর্বল অসহায় তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না।

মামী বললেন: ছি ছি, পুরনো কথা কেন টেনে আনছ? যা বল-বার গোপালকে বল।

রাগ করে মামা তাঁর পাইপ আর পাউচ বার করলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাতে আগুন ধরাতে বসলেন। আমরা চুপ করে রইলুম।

মামাকে আজ হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। তাঁর মনের সঙ্গে কাজের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে কি পরীক্ষা করছেন!

এক সময় শান্ত হয়ে বললেন: এলাহাবাদে আর কী দেখলে?

দেখেছিলুম সবই, কিন্তু সরাসরি কোন উত্তর দিলুম না। বললুম: দেখবার আর কী আছে!

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: কেন, কিছু দিন আগে তো উত্তর প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখন কি লক্ষ্ণৌএ সব চলে গেছে?

বললুম: হাই কোর্ট দেখেছি।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি হেসে উঠল। বলল: তুমি তো হাই কোর্টই সকলের আগে দেখ।

এই পরিহাসে পরিবেশের আবহাওয়া কিছু তরল হল। বললুম: এলাহাবাদের দ্রষ্টব্য স্থান আঙুলে গোনা যায়। জওহরলালের বাড়ি আনন্দ ভবন আর পণ্ডিত মতিলালের স্বরাজ ভবন পাশাপাশি। স্বরাজ ভবন এখন কংগ্রেসের হয়েছে। এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্য দিকে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, আর প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলন।

ইংরেজের গির্জা আছে অল সেইন্ট্‌স্ ক্যাথিড্রাল আর তাদের প্রধান কীর্তি আলফ্রেড পার্ক। প্রিন্স আলফ্রেডের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে এই বাগান তৈরি হয়েছিল। তার ভিতর মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর পঞ্চম জর্জের মর্মর মূর্তি। একটি লাইব্রেরি:আর জাতুঘর।

পরম কৌতুকে স্বাতি বলল : কোন ঐতিহাসিক পৌরাণিক কথা?

তাও আছে। খসরু বাগ আর ফোর্ট। স্টেশনের কাছেই একটা বড় বাগানের নাম খসরু বাগ। তার ভেতর জাহাঙ্গীরের বড় ছেলে খসরুর সমাধি। খসরুর রাজপুত মা ও বোন নিসার বেগমের সমাধিও এইখানে। এখন এই বাগানের ফল এলাহাবাদের বাজারে বিখ্যাত।

একটু থেমে বললুম : যমুনার ওপর এলাহাবাদের ত্বর্গ আকবর বাদশাহর তৈরি। অনুমতি নিয়ে ভেতরে যাওয়া যায়।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু দেখবার আছে?

অশোকের একটি স্তম্ভ দেখতে লোকে ভেতরে যায়। অনেকে মনে করেন, এই স্তম্ভটি আগে কৌশাম্বীতে ছিল। সেখান থেকে এনে এইখানে পোঁতা হয়েছে।

কৌশাম্বী তো বৌদ্ধ শহর!

বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন বৎস রাজা উদয়ন। পাণ্ডবের বংশধর। বুদ্ধের পর থেকে হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত এই শহরের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন মাটি খুঁড়ে চার মাইল বিস্তৃত এক বিরাট ত্বর্গের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাতি বলল : তুমি দেখে এসেছ?

বললুম : তোমাদের সঙ্গে দেখব। সেই সঙ্গে মহাভারতের জতুগৃহ দেখব। মাইল চব্বিশেক দূরে লাক্ষাগিরি নামে একটা জায়গায় এই জতুগৃহ। আর শৃঙ্গবেরপুর, এখন বলে সিঙ্গ্রৌর। অযোধ্যা থেকে রথে এই স্থান পর্যন্ত এসে রাম গুহর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। গঙ্গা পার হয়েছিলেন নৌকায়।

মামী এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। এইবারে প্রশ্ন করলেন : প্রয়াগে

স্নান কর নি ?

করেছি। তবে এই স্নানের নিয়ম কানুন সব মানতে পারি নি।

কী রকম ?

এই তীর্থে যেতে হয় পায়ে হেঁটে। সেটা মেনেছিলুম। আপনাদের যেতে হলে দিল্লী থেকেই পায়ে হাঁটতে হবে।

কেন ?

প্রয়াগে যাবেন বলে যাত্রা করলেই এই নিয়ম। আমি তো প্রয়াগে স্নান করব বলে এলাহাবাদে আসি নি, আমি এসেছিলুম কাজে। কাজেই প্রয়াগ স্নানটা নিয়ম মতোই হয়েছে।

মামা হেসে বললেন : মাথা তো মুড়োও নি দেখছি।

বললুম : ঐটিই মানতে পারি নি। মেয়েদের মতো দু আঙুল চুল কেটে গঙ্গায় দিয়েছি।

স্বাতি বলল : মেয়েরা বুঝি তাই করে ?

না করে আর উপায় কী! শুধু বিধবারা আর পুরুষেরা মাথা মুড়োচ্ছে। তাও অনেক পুরুষকে দেখলুম গোঁফ আর দাড়ি চেঁচে জলে ফেলছে। কিন্তু শাস্ত্রে কী আছে জানো ? পাপ আশ্রয় করে চুলের গোড়া, তাই পাপ তাড়াতে মাথা মুড়োতে হয়। সেখানকার নাপিতেরা বলে

প্রয়াগেতে মুড়িয়ে মাথা,
মর গে পাপী যেথা সেথা।

খিলখিল করে হেসে উঠে স্বাতি বলল : তুমি মাথা মুড়োলে না কেন ?

বললুম : আমি কোন পাপ করি নি বলে।

এই তো একটা পাপ করলে !

কী রকম ?

এত বড় একটা মিথ্যে বললে সকলের সামনে !

মামা হাসলেন।

প্রয়াগ সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই মনে এসেছিল। প্রয়াগ

ভারতের প্রাচীনতম তীর্থের অন্যতম। ঋগ্বেদে এই নামের উল্লেখ দেখি নি, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নানের মাহাত্ম্যের কথা পড়েছি। এই সাদা ও কালো জলের মিলিত ধারায় স্নান করে স্বর্গলাভ হয়, আর অমরত্ব লাভ হয় এইখানে দেহরক্ষা করে। মহাভারতে ঋষি পুলস্ত্য বলেছেন যে পিতামহ ব্রহ্মা এখানে পুষ্করের মতো বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। যাগ শব্দ থেকেই প্রয়াগ। রামায়ণের যুগে এটি অরণ্যময় প্রদেশ ছিল, আর ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল এইখানে। রাম এই পথে বনবাসে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুতে শোকে তিনি অধীর হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন বারাণসীতে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুরে এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রয়াগে যাবার উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু পাপ স্খালন হবে না, মানসিক শান্তিও ফিরে পাবেন। এই প্রয়াগের নিকটে ছিল কুমার বন। বৈবস্বত মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন সেই বনের নিষিদ্ধ স্থানে গিয়ে নারী হয়ে যায়। তার নাম হয় ইলা। চন্দ্রের পুত্র বুধের সংসর্গে এসে ইলার যে পুত্র হয় তারই নাম পুরূরবা। শিবের বরে ইলা এক মাস পুরুষ ও এক মাস নারীর জীবন যাপন করতেন। নহুষ ও যযাতি এই বংশেরই রাজা। এ হল পুরাণের গল্প।

মাঘ মাসে স্নান প্রয়াগে প্রশস্ত। কুম্ভ মেলা হয় বারো বছর পর পর। সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা নিয়ে দেবাসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। তারই থেকে এক বিন্দু অমৃত পড়ে প্রয়াগ হয়েছে কুম্ভের অধিকারী। ১৯৫৪ সালে প্রয়াগে কুম্ভ যোগ হয়েছে, বারো বছর পর ১৯৬৬ সালে আবার সেই যোগ আসবে।

এই প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গম। সরস্বতীর ধারা এখানে অদৃশ্য। সেই সরস্বতী গুপ্ত ভাবে পুষ্করেও প্রবাহিত। যাত্রীরা এখানে অক্ষয়-বট দেখে, আর দেখে পাতাল পুরী মন্দির। ভরদ্বাজের মন্দিরও দেখে সবাই। অনেকে বলে যে এই ঋষির আশ্রমের উপরেই এলাহাবাদের

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

স্বাতি বলল : গোপালদা বেশ দমে গেছে মনে হচ্ছে!

বললুম : তা একটু হয়েছি বৈকি।

মামী বললেন : সে কি, স্বাতির কথায় তুমি—

স্বাতি হেসে উঠল।

বললুম : ফা হিয়েন আর হিউএন চাঙের কথা বলতে পারলুম না বলে বড় দমে গিয়েছি।

মামা তাঁর মুখের পাইপটা সরিয়ে বললেন : ভয় পাচ্ছ কেন, বল না কী বলবে।

স্বাতি বলল : বলবার কিছু থাকলে কি আর গোপালদা চুপ করে আছে!

সত্যিই তাই। ওঁরা এসে যে সব বৌদ্ধ কীর্তি দেখে গেছেন, এখন তার কিছুই নেই। দুর্গের ভেতর ঐ অশোক স্তম্ভটিই শুধু সে যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তারপরে বললুম : তীর্থ মাথায় থাক। শুধু সৌন্দর্য দেখবার জন্যেই সবার সেখানে যাওয়া উচিত।

কী রকম?

একখানা নৌকো ভাড়া নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে এগিয়ে যান। দুর্গের ধার ঘেঁষে যমুনা বয়ে যাচ্ছে, আর গঙ্গা নেমে আসছে অন্য ধার থেকে। রৌদ্র কিরণে গঙ্গার জল রূপোর পাতের মতো ঝিকমিকিয়ে উঠবে। যমুনার নীল জল তাকে নীল করতে পারবে না। যত দূর দেখবেন, সাদা আর নীল জল যেন পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে।,

স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল। তার দৃষ্টিতে আর কৌতুক নেই। মনে হল, সে তার কল্পনায় সেখানে পৌঁছে গেছে, আর উপভোগ করছে সেই দৃশ্য।

মামী বললেন : আমরা আর একবার প্রয়াগে যাব।

৯

বাহিরে একখানা খাটিয়া নামিয়ে আমি শোবার আয়োজন করছিলুম। মামা বললেন: কথা শোনা তোমার কুষ্ঠীতে লেখে নি, তবু বলি, কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাইরে শোবার অভ্যেস তোমার নেই, শেষটায় অসুখ না করে।

হেসে বললুম: শরীরের নাম মহাশয় মামাবাবু।

তিনি যে বিরক্ত হলেন, তা তাঁর উত্তর শুনেই বুঝতে পারলুম। বললেন: হ্যাঁ, তা ভুগে ভুগেই বাইরে শোবার অভ্যেস হয়ে যাবে।

আমি আর কথার জবাব দিলুম না।

এক সময় রাগ করে তিনি শুতে চলে গেলেন। মামী আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। স্বাতির সাড়া অনেকক্ষণ পাই নি। সে যে শোয় নি, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম। বাতি নিবিয়ে দরজা বন্ধ করা তার বাকি আছে। আমি শুয়ে পড়লুম।

চোখে ঘুম ছিল না। নানা দুর্ভাবনায় মন আমার অস্থির হয়ে উঠল। এ কোথায় কিসের ভিতর জড়িয়ে ফেলছি নিজেকে! এ জন্য তো আমার জন্ম হয় নি! বাবার কাছে শিক্ষাও পেয়েছি অন্য রকম। আমার আদর্শ কি আজ এমনি করে ভেসে যাবে!

নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। তাঁর ধ্যান জ্ঞান পরম তপ ছিল ছাত্র। বিদ্যালয়ের বাহিরে যে জগৎ, সেখানে তাঁর ভয় ও সঙ্কোচ প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অস্থির করেছে। নিজের গৃহকেও তাই বিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই নিয়েই বিয়াল্লিশটা বছর বেঁচে ছিলেন। যে বারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব, সেই বারে তিনি মারা গেলেন।

শৈশবের কথা আমার মনে আছে। মা কোন দিন সে কথা

ভুলতে দেন নি। প্রথম যখন কথা কইতে শিখলুম, সেই আধো আধো গলায় সুর মিলিয়ে স্তোত্রপাঠ করতুম বাবার সঙ্গে। মানে বুঝি নি, কিন্তু মনে গাঁথা হয়ে গেছে। পরে সেই সব শ্লোকের মানে বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পড়ে যে উপনিষদে হাতেখড়ি হয়, সে শিক্ষা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছিলুম।

তারপর হাতের লেখা লিখতে শুরু করলুম। ঐক্য বাক্য মাণিক্য নয়, লিখলুম জল পড়ে পাতা নড়ে। লিখলুম, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। লিখলুম, মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে। কটা বছর যেতে না যেতেই লিখলুম, এ পাখার বাণী দিল আনি···পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ। আমার অন্তরেও এল আবেগ। ওড়বার নয়, পড়বার। আমি প্রাণ ভরে পড়লুম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করে মনে হল, আমার সব পড়া হয়ে গেছে। বাবাকে সেই কথা বলতেই তিনি হেসে বললেন, সব মনে রাখতে পারলেই সব পড়া হয়েছে। তাঁর সেই হাসিটি আমার আজও মনে আছে।

সে দিন রাতে তিনি আমায় একটি গল্প বলেছিলেন। ফ্রান্সের এক শিক্ষকের গল্প। তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল বাছা বাছা কয়েকজন লেখকের বই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাঁরা শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ লেখা। জগতের সম্মান পাবার আগে কোন লেখকের কোন লেখা তিনি পড়তেন না। শুনতেন এক জনের, তাঁর এক ছাত্রের। তখন স্বদেশে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু মাস্টার মশায়ের কাছে তাঁর ভয় ভাঙে নি। দুরু দুরু বুকে তিনি তাঁর লেখা শোনাতে আসতেন। বিশ্বাস করতেন যে মাস্টার মশাই ভাল বললে সে লেখা সারা বিশ্বের লোক ভাল বলবে। হতও তাই। ছাত্রের কাছে মাস্টার মশায়ের গল্প শুনে একবার দেশের লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে চাইল। ঘরের বাহিরে তিনি কিছুতেই বেরোবেন না। শেষে এই শর্তে রাজী হলেন যে তাঁর লেখা কোথাও ছেপে প্রকাশ করা হবে না। তিনি বক্তৃতা দিলেন, স্তব্ধ হয়ে শুনলেন

ফ্রান্সের জ্ঞানী গুণী বিদ্বজ্জন। এমন বক্তৃতা যেন তাঁরা জীবনে কখনও শোনেন নি।

বাবা বলতেন, সব কি আর পড়া যায়? বাছা বাছা লেখাই পড়তে হয়। তাতেই হয় সব পড়ার কাজ। আরও বলতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই জাতের লেখক, যাঁকে ভাল করে পড়লে তুনিয়ার অনেক লেখা পড়া হয়ে যায়। তবু আমি তুনিয়ার অনেক লেখকের লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি। কিছুই আসে যায় না তাতে। বাবা বলতেন, বুদ্ধির পিছনে আছে একটা ঘুমন্ত মন, সেইখানে সেই পড়ার ক্রিয়া হয়। আজ যা বোঝা গেল না, এক দিন সেই না-বোঝা কথা নিজের কথা হয়ে বেরিয়ে আসবে। তপস্যা তো শরীরের কসরৎ নয়, বুদ্ধির বিকাশ। যতটুকু জানা আছে, তার পরের কথা জানবার জন্য সাধনা।

আর একজন শিক্ষকের গল্প পড়েছিলুম একখানা ইংরেজী বইএ। ম্যাথ্ আর্নল্ডের পিতা ডক্টর টমাস আর্নল্ডের কথা। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখনও তাঁর ছাত্রদের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, ওরে, সন্ধ্যে যে হয়ে এল, এবার তোরা ঘরে যা। সেই তাঁর শেষ কথা। বাবার মৃত্যুর ক্ষণটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'মাই বয়েজ' বলে তিনি তাঁর ছাত্রদের ডাকেন নি সত্য, কিন্তু নির্বাক চোখে খুঁজেছিলেন অনেককে—শুধু আমাকে দেখেই তৃপ্ত হন নি। তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ না হয়ে বাষট্টি হলে হয়তো 'মাই বয়েজ' বলেই ছাত্রদের ডাকতেন।

ম্যাথু আর্নল্ড হতে পারব না জানি, কিন্তু সেই উচ্চাশাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। পৈতৃক ভিটে আর সামান্য কিছু জমি জমা ছাড়া আর কিছুই বাবা রেখে যান নি। দরকারও হয় নি। ম্যাট্রিকের ফল দেখেই কলকাতার অনেকগুলো কলেজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কলেজের ফী লাগল না, হস্টেলের খরচা দিতে হল না, বৃত্তির টাকা পাঠাতুম মায়ের কাছে। এক বেলা ছাত্র পড়িয়ে আরও কিছু

টাকা পেতুম। এতে মার গভীর আপত্তি ছিল। তাঁর আপত্তির কারণ আমি জানতুম। আই. এ.র ফল খারাপ হলে আমার বৃত্তি বন্ধ হবে, তাহলে আর পড়া হবে না। আমার জীবনের উপর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ছিল কারও। সব কটা পরীক্ষাই আমি সসম্মানে পাস হয়ে গেলুম।

মায়ের মৃত্যু হল এই সময়ে। তিনি বেঁচে থাকলে আমার জীবন অন্য রকম হত। অন্তত অন্য রকম করবার চেষ্টা করতে হত। তাঁর ছেলে জজ হবে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট, এই রকমের আশা ছিল তাঁর মনে। অনেক বার তাঁর মুখে এ কথা শুনেছি। বলতেন, গোপাল, দিল্লীতে গিয়ে তোকে পরীক্ষা দিতে হবে। ওপর থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ করবেন।

কেন আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করলুম না, সে কথা ভাল করে ভেবে দেখি নি। পরীক্ষার ভয় ছিল না তা জানি। খরচও জুটিয়ে নিতে পারতুম। তবু কেন গেলুম না! এক দিন মনে হয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ, সে আমার নয়! আমার অন্য পথ, কিন্তু সেই পথ কি আজও খুঁজে পেয়েছি?

এই ভাবটি যে বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম, তাতে আজ আমার সন্দেহ নেই। তিনি অহংকারী ছিলেন না, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। সেইটেকেই লোকে অহংকার বলে ভুল করত। মামাও ভুল করে-ছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কোন রেষারেষির কথা মায়ের কাছে শুনি নি। তবে মৃত্যুর পূর্বে বাবা যে অনুরোধ মাকে করে গিয়েছিলেন, পরে তা জানতে পেরেছিলুম। বলেছিলেন, জীবনে দুর্যোগ আসে অনেক, কিন্তু উপরে ভগবান আছেন। দয়ার জন্য মানুষের দ্বারস্থ যেন আমরা না হই। বাবার এই অনুরোধকে মা আদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মামার সমস্ত সাহায্য তিনি কঠিন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ সব আমি জানতুম না। শুনেছিলুম অনেক পরে। রাগের মাথায় মামাই এক দিন বলে ফেলেছিলেন। তবু যে তাঁর স্নেহ আমি হারাই নি, এ কথা ভাবতে ভাল লাগে।

অনেকক্ষণ থেকে একটা মিষ্টি সুর কানে এসে লাগছিল। ভাল করে শুনেই বুঝতে পারলুম যে ঘরের ভিতরে স্বাতি সেতার বাজাতে বসেছে। ভারি মিষ্টি হাত, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছে আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গেল। আমি উৎকর্ণ হয়ে তার বাজনা শুনতে লাগলুম।

এক সময় মনে হল, স্বাতি আমার মনের সুরটি যেন ধরতে পেরেছে। এক মুঠো কাশ ফুলের মতো সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই, লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গেল।

স্বাতিকে আজও আমি চিনতে পারি নি। তার মনের কথাটি আজও আমার অজানা রয়ে গেছে। সে চায়, মিত্রার অহংকার আমি ভেঙে দিই। কিন্তু তার পরিণামটুকু সে ভেবে দেখেছে কি? গায়ের জোরে তো অহংকার ভাঙে না। যে জোরে ভাঙে তার ক্ষমতা আণবিক। সে প্রেম। যুগে যুগে এই অস্ত্রে নারী পুরুষকে জয় করেছে, আর নারীকে পুরুষ। সশস্ত্র মানুষকে জয় করেছে নিরস্ত্র মানুষ। কোটি কোটি পাপীকে উদ্ধার করেছেন এক এক জন মহাপুরুষ।

না না, স্বাতি নিশ্চয়ই এ কথা বলে নি। এ কথা সে বলতে পারে না। সে যা বলতে চেয়েছে, তা সে প্রকাশ করতে পারে নি। তার মুখের কথাকে সত্য বলে মেনে নিলে তাকে ভুল বোঝা হবে। তাকে ভুল বোঝার দিন আমি পেরিয়ে এসেছি।

তান শেষ করে স্বাতি তখন ঝালা ধরেছে। অত্যন্ত দ্রুত উঠছে ঝঙ্কার। মনে হল, নিজেকে আমি যেন হারিয়ে ফেলছি। আমার চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। ভুলে গেলুম আমার উত্তরপাড়ার ঘর, ভুলে গেলুম এলাহাবাদের ঐশ্বর্য আর দিল্লীর

দরবার। মিত্রা হারিয়ে গেল। জগৎটাকেই আর যেন দেখতে পাচ্ছি নে। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছে। আমি কি ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকাল বেলায় স্বাতি বলল : কাল বাজনা শুনেছিলে আমার?

বললুম : শুনেছি।

বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

১০

ছোট একটা পুলের উপরে ট্রেন উঠতেই বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল যমুনার কথা। চলতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়াবার চেষ্টা করলুম। গরাদে বাধা পেয়ে ফিরিয়ে নিলুম মুখখানা। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকেই যমুনা দেখা যাচ্ছে না।

ভাল করে যমুনা দেখেছিলুম হুমায়ুনের সমাধি সৌধ দেখতে গিয়ে। বিস্তীর্ণ বালির ভিতর দিয়ে শীর্ণ জলধারা ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, প্রকৃতির সাদা বুকের উপর পড়ে আছে এক ফালি নীল কাপড়। বেগ নেই, গর্জন নেই, তবু ভয় পেলুম। যমুনা যে যমের ভগিনী। আর কটা দিন পরে ঐ ধারা বইবে আমার জীবনের উপর দিয়ে।

পর দিন আমরা একটু সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। গাড়ি নিয়ে রাণারা একটু তাড়াতাড়ি এসেছিল। বলেছিল, ভাল প্রোগ্রাম করেছি, এই বেলা বেরিয়ে পড়লে মোগলদের সব কিছুই দেখা হয়ে যাবে। দিল্লীতে আজ যা কিছু আছে, সবই তো মোগলের।

মামীর ব্যস্ততা এতে দেখা যায় নি বলে যোগ করেছিল : ফোর্টের আর্কেয়লজিকাল অংশটি বন্ধ হয়ে যায় ঠিক এগারটাতেই। আমরা নয়া দিল্লীর দিক থেকে যাচ্ছি কিনা, ফোর্ট সকলের শেষে পড়বে।

স্বাতি তৈরি হয়ে এসেছিল, বলল : দেখি কী প্রোগ্রাম করেছেন!

খুশী হল রাণা। এক নিমিষেই তার মানচিত্রখানা স্বাতির চোখের নিচে মেলে ধরল। বলল : নর্থ অ্যাভিনিউ দেখছেন, যেখানে আমরা আছি? এখান থেকে সোজা আসব সফ্‌দরজঙ্গের সমাধিতে। কাল আমরা কুতব রোড ধরে দক্ষিণে নেমেছিলুম, আজ পশ্চিমে

ফিরব, লোদি রোড ধরে হুমায়ুন্স্ টুম্ব্। ডান হাতে পড়বে নিজাম্-উদ্-দীনের দরগা। তারপর ধরব দিল্লী-মথুরা রোড। পুরাণা কিলার পাশ দিয়ে ফিরোজশাহ কোটলার সামনে দিয়ে রাজঘাট ডাইনে ফেলে লালকেল্লার ভেতর।

স্বাতি বলল: চমৎকার, বাজে জিনিস একটিও দেখছি নে তাহলে।

রাণার তাড়ায় তাড়াতাড়িই বেরোতে হল।

গাড়িতে বসেই স্বাতি বাচাল হয়ে উঠল, বলল: সফ্দরজঙ্গে কী দেখবার আছে রাণাবাবু?

জানা কথার উত্তর দিতে রাণার ভাল লাগে। বলল: সফ্দরজঙ্গ ছিলেন একজন মোগল ওমরাহ, অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাব। তার আগে ছিলেন দ্বিতীয় আহমদ শাহর উজীর। তাঁরই সমাধি।

এরই সঙ্গে যোগ করল: হুমায়ুনের সমাধিতে মোগল স্থাপত্যের যে উৎকর্ষ দেখা যায়, এইখানে তা শেষ হয়ে গেল।

সফ্দরজঙ্গ থেকে নিজাম্-উদ্-দীনের দরগার দিকে যেতে যেতে স্বাতি বলল: আপনার বইগুলো কাল আমাদের কাছে রেখে গিয়ে ভালই করেছিলেন। নিজাম্-উদ্-দীনের দরগার সব কিছুই আমার জানা হয়ে গেছে।

রাণা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

পিছন ফিরে আমি বললুম: জানা হয় নি দেবলা দেবীর কাহিনী। আমির খসরুর কথা আছে, আলা-উদ্-দীন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের বীরত্বের উল্লেখ। কিন্তু দেবলা দেবীর কথা নেই, যা লিখে আমির খসরু অমর হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন ফার্সিতে, আর পূজো পাচ্ছেন উর্দুর প্রথম কবি বলে।

দেবলা দেবী কে গোপালদা?

এখন সে কাহিনী থাক। গাড়িতে গল্প জমবে না। তার জন্যে অন্য পরিবেশ চাই।

আমার আপত্তির কারণ বুঝতে না পেরে স্বাতি আমার মুখের

দিকে চেয়ে রইল। বললুম: আমির খসরুর আর একটা পরিচয় আছে। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তানসেনের জন্ম হয়েছে তাঁর চেষ্টার ফলে।

কথাটা অদ্ভুত শোনাল বলে বললুম: প্রকাশ্যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ। আমির খসরু নিভৃতে সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন। আর দরবারে গানের প্রচলন করেছিলেন ঘিয়াস-উদ্-দীন বাদশাহর অনুগ্রহে।

একটু থেমে বললুম: আজ ফকির নিজাম-উদ্-দীন আউলিয়া অমর হয়ে আছেন ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলুকের সঙ্গে শত্রুতার জন্যে। ঘিয়াস-উদ্-দীন নিজে প্রাণ দিয়ে ফকিরকে অমর করেছেন। সঙ্গীতকেও তিনি অমর করে গেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু রাজত্ব কালে দিল্লীর দরবারে গানের প্রচলন করে না গেলে পরবর্তী কালে তানসেনের জন্ম হত কি না সন্দেহ। বছরে বছরে মেলা বসে আউলিয়ার পুকুরের পাড়ে, আর আমির খসরুর সঙ্গে ঘিয়াস-উদ্-দীনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পী জনের মনে। ধর্মে অন্ধতা আছে, শিল্পে মুক্তি।

দরগা থেকে আমরা হুমায়ুনের সমাধিতে এলুম। উপর থেকে দেখলুম যমুনার ধারা। ঠিক এমনটি আগে দেখি নি, দু তটের বালির বিস্তারের ভিতর এমন ঘন নীল জল। স্বাতি বলল: যমুনার জল এমন নীল কেন রাণাবাবু?

নদীর জল তো নীলই হয়।

স্বাতির যেন বিশ্বাস হল না এ কথা, বলল: তাই কি! প্রয়াগের সঙ্গমে শুনেছি জলের রঙ দেখে যাত্রীরা নদী চেনে। গঙ্গার জল সাদা আর নীল যমুনার। এক সঙ্গে মিশেও যেন মেশে নি, যত দূর দৃষ্টি যায় রঙের স্বাতন্ত্র্য তারা বজায় রেখেছে।

রাণা আশ্চর্য হয়ে বলল: সত্যি? আমি দেখি নি তো!

মামা আমার মুখের দিকে চাইলেন। লজ্জায় আমি মাথা নিচু করলুম।

মাথা নোয়ালে যে!

স্বাতির মন্তব্য শুনে মিত্রা হাসল।

বললুম: আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র নই, বৈজ্ঞানিক কারণ আমি জানি নে।

স্বাতি আদেশ করল: পৌরাণিক ঐতিহাসিক কিছু বল।

বললুম: তা জানি।

তার পর যমুনার উৎপত্তির কথা শোনালুম মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে। বললুম: হরিবংশে আছে যে সূর্যের তেজে তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার সুন্দর দেহ জ্বলে গিয়ে বিবর্ণ হয়। এই জন্যই তাঁর পুত্র কন্যা যম ও যমুনার বর্ণ শ্যাম।

মিত্রা এবারে হাসল না, বলল: পুরাণে আপনার গভীর বিশ্বাস, তাই না?

বললুম: যুক্তির শেষ আছে, বিশ্বাসের নেই। যুক্তি দিয়ে যার নাগাল পাই নে, বিশ্বাসে তাকে পূরণ করি। আমি পুরাণ পড়েছি অন্য কারণে। কিছু গ্রহণ বা বর্জন করবার আগে তার মূল্য যাচাই করে নেয়া দরকার। শুধু একটা ধারণা সম্বল করে আর যাই করা যাক, মামলার রায় দেওয়া যায় না।

মিত্রার মুখ যে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, তা আমার দৃষ্টি এড়াল না। দেখলুম, স্বাতিও তা লক্ষ্য করেছে। বলল: চল, নিচে যাই।

নিচে নামতে নামতে রাণা আমাদের ইতিহাস শোনাল, বলল: হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রায় বছর নয়েক পরে তাঁর বেগম হামিদাবানু এই সমাধি নির্মাণ করেন। বেগমের কবরও আছে এর ভেতর, আছে দারা শিকোর কবর, ফারুখসিয়ার আর দ্বিতীয় আলমগিরের কবরও। এঁদের হত্যার কাহিনী মোগলের কলঙ্ক বলে পরিচিত।

একটু থেমে বলল: সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইখানেই আশ্রয় নেন বাদশাহ বাহাদুর শাহ। ইংরেজ তাঁকে এইখান থেকেই ধরে

নিয়ে যায়।

নিচে নেমে এসে আমি সৌধটি দেখছিলুম ভাল করে। লাল পাথরের তৈরি, গম্বুজটি সাদা মার্বেলের। তাজমহলের সঙ্গে কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে। রাণা ঠিক সেই কথাই বলল : দেখছেন তো গোপালবাবু, এই মডেল দেখেই তাজমহল তৈরি হয়েছিল।

স্বাতি হেসে বলল : এমন স্বামী-স্ত্রী আজকাল আর দেখা যায় না।

এ কথার মানে বুঝতে না পেরে রাণা তার মুখের দিকে তাকাল। মিত্রাও চাইল তার দিকে। আমি বললুম : সে কথা সত্যি। হুমায়ুনের বেগম তাঁর স্বামীর সমাধি গড়লেন, আর শাজাহান বাদশা গড়লেন তাঁর স্ত্রীর সমাধি।

মামা-মামী শুনতে না পান, এমন মৃত্যু স্বরে বললুম : দাম্পত্য প্রেমের এমন পরাকাষ্ঠা আজকাল দুর্লভ।

মিত্রার মুখ কঠিন হল, কিন্তু রাণা এগিয়ে গেল হাসতে হাসতে।

প্রশস্ত রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েই রাণা একবার আমার দিকে চেয়ে বলল : দেবলা দেবীর গল্প শোনাতে কী রকমের পরিবেশ আপনার চাই ?

পিছন থেকে স্বাতি বলল : চাঁদ জ্যোৎস্না—

আমি ফিরে তার মুখখানি দেখবার চেষ্টা করলুম। মিত্রা হাসছিল মুখ টিপে। কটাক্ষে রাণাকেও দেখলুম। হাতে স্টিয়ারিং না থাকলে সে হয়তো হেসেই গড়িয়ে পড়ত। নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললুম : জ্যোৎস্না রাতে দেবলা দেবীকে ঠিক চেনা যাবে না। দিনের আলোতেই সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

হাসি থামিয়ে রাণা আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম : কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দেবলা দেবীর অভিনয় দেখেন নি ?

আশ্চর্য হয়ে রাণা বলল : দেবলা দেবী অভিনেত্রী ?

স্বাতি ও মিত্রা দুজনেই খানিকটা আশ্চর্য হয়েছে দেখলুম। এবারে আমার হাসবার পালা। কিন্তু তার আগেই মামা হেসে

উঠে বললেন : এ কি আজকের নাটক! ছেলে বেলায় আমরা দেখেছি এর অভিনয়। তখন দেবলা দেবী সাজত—

বলে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর ছেলে বেলার কথা আমার জানা নেই।

কে সাজত বল তো?

মামা প্রশ্ন করলেন। আমাকে নয়, মামীকে।

অনাসক্ত ভাবে মামী উত্তর দিলেন : সে কি আর মনে আছে!

অভিনেত্রীর নাম মনে না থাকলেও গল্প মনে আছে মামার। বললেন : উঃ, কী সাংঘাতিক শেষ দৃশ্যটা! বাপের আদেশে ছেলের মৃত্যুদণ্ড হল, আর সেই রক্তমাখা মুণ্ডু বাপকে দেখাতে আনা হল স্টেজের ওপর!

সেই বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করে গাড়ির ভিতরেই মামা শিহরে উঠলেন। ভয়ে কে কে চোখ বুঁজলেন, তা দেখতে পেলুম না।

একটু সামলে নিয়ে মামা বললেন : দিল্লীর বাদশাহ আলা-উদ্-দীন খিলজীর ছেলে খিজির খান। দেবগিরির রাজা বলদেবের সঙ্গে দেবলা দেবীর বিয়ে দিয়ে খিজির খান দেশে ফিরে এলেন। তারই শাস্তি হল।

সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল স্বাতি, বলল : বাপ হয়ে ছেলের মৃত্যুদণ্ড দিল বিয়ে দেবার অপরাধে?

মামা জবাব দিলেন : সে কি কম অপরাধ! গুজরাট জয় করে রানী কমলা দেবীকে ঘরে আনলেন আলা-উদ্-দীন খিলজী, নিজের মহিষী করলেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে দেবলা দেবী পালিয়ে গেল দেবগিরি। কমলা দেবীর অনুরোধে বাদশাহ খিজির খানকে পাঠালেন তাঁর কন্যা উদ্ধারের জন্য। খিজির দেবগিরি জয় করলেন, কিন্তু দেবলাকে দিল্লীতে আনলেন না। এ তাঁর অপরাধ নয়?

কিন্তু তাই বলে মৃত্যুদণ্ড!

স্বাতি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মামা বললেন : আলা-উদ্-দীন বাদশাহ পরওয়ানা পড়ে সই করেন নি, কমলা দেবীর অনুরোধে চোখ বন্ধ করে সই করেছিলেন। তবে লোকে বলে, তিনি সব জানতেন।

এর পর অনেকক্ষণ আর কেউ কথা কইলেন না।

আমাদের গাড়ি পুরাণা কিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল : নেমে দেখলে খারাপ লাগত না, কিন্তু তাতে ফোর্ট দেখা সম্ভব হবে না।

বলে গাড়িতে বসেই পুরাণা কিলার গল্প শুরু করল। বলল : পুরাণা কিলার পৌরাণিক কাহিনী গোপালবাবু শুনিয়েছেন। এক দিন এইখানে ছিল পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থ। এখনও এই গ্রামের নাম ইন্দর পথ। পনরো শো তিরিশ সালে হুমায়ুন বাদশাহ এই কিলার নির্মাণ শুরু করেন। বছর দশেক পর শের শাহ এটি শেষ করেন। এর ভেতর যে কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ আছে, তাও শের শাহর তৈরি। আর যে শের মণ্ডলের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে হুমায়ুন শুয়েছিলেন মৃত্যুশয্যায়, সেও এই কিলার ভেতর।

শের মণ্ডল কী রাণা বাবু?

স্বাতি শের মণ্ডল দেখে নি জেনে রাণা যেন আপশোসে মরে গেল। বলল : ছি ছি, কী কেলেঙ্কারি বলুন।

রাস্তার দিকে চেয়ে বলল : একটুখানি আগে বললে কতটুকুই বা আর সময় লাগত!

অনেকটা দূর এগিয়ে না এলে রাণা হয়তো তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিত। স্বাতি লজ্জিত হয়ে বলল : না না, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! দিল্লীতে অনেক কিছুই তো দেখি নি। তার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

মামা বললেন : অন্য দিন দেখা যাবে।

রাণা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল : সেই ভাল।

আমি বললুম : তেমন কিছু একটা দেখবার জিনিস নয় বলেই তো

আপনি এগিয়ে এলেন।

রাণা বলল : যা বলেছেন। একটা আটকোণা দোতলা বাড়ি। হুমায়ুন সেটা তাঁর লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করতেন। খুব উঁচু উঁচু ধাপ। আজও তার একটা ভাঙা আছে। লোকে বলে, এই ভাঙা ধাপ থেকেই নাকি হুমায়ুন পড়ে গিয়েছিলেন। মারা যান তৃতীয় দিনে।

কী সাংঘাতিক !

বলে মামী শিহরে উঠলেন।

সমর্থনের ভঙ্গিতে রাণা বলল : সে যুগের ব্যাপারটাই আলাদা। এমন সব অদ্ভুত ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

ফিরোজ শাহ কোট্‌লা পেরোবার সময় মিত্রার গলা শুনলুম পিছনে। বলল : দেবলা দেবীর কাহিনী কি ঐতিহাসিক ?

আমি ফিরে তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম। দেবলা দেবীর কাহিনী শেষ করে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। কৌতূহল সকলের মিটে গেছে। কিন্তু মিত্রা সেই কথাই এখনও ভাবছে জেনে আশ্চর্য হলুম।

রাণা কথা কইল না, জবাব দিলেন মামা। বললেন : ইতিহাস আমার মনে নেই। গোপাল হয়তো বলতে পারবে।

মনে মনে লজ্জা পেলেও সে কথা প্রকাশ করে লাভ নেই। বললুম : আমির খসরুর কাব্য আমি পড়ি নি। তবে ইতিহাসে পড়েছি যে দেবলা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন খিজির খান নিজে। কমলা দেবীর কাহিনী সত্য বলেই জানি।

মামা বুঝি চমকে উঠে বললেন : এত বড় অসঙ্গতি আছে এই নাটকে ?

এ কথার সঠিক উত্তর আমার জানা ছিল না। আমি সে কথা স্বীকার করে বললুম : খিজির খান কাব্যরসিক ছিলেন, আর বল্লভ ছিলেন দেবলার। এইটুকু মাত্রই জানি। ইতিহাসে এর বেশি আমি

পড়ি নি।

স্বাতি হঠাৎ খুশী হয়ে বলল: সত্যি নাকি! তুমি পড় নি এমন কথাও তুনিয়ায় কিছু আছে!

উচ্চকিত কণ্ঠে রাণা হেসে উঠল। মিত্রা হাসল মুখ টিপে। আমি মামা-মামীকেও একবার দেখবার চেষ্টা করলুম। মামা উপভোগ করেছিলেন রহস্যটুকু, কিন্তু মামী আরও একটু গম্ভীর হয়েছেন বলে মনে হল।

একটা বড় রাস্তা পেরোবার সময় রাণা বলল: এই হল রাজঘাটের পথ।

বলে তার ডান দিকে রাস্তাটা দেখিয়ে বলল: বেশি দূর নয়, খানিকটা এগিয়ে গেলেই মহাত্মাজীর সমাধি।

পুরনো একটা গেটের নিচে দিয়ে যাবার সময় বলল: এই হল বিখ্যাত দিল্লী গেট। এমনি গেট দিল্লীতে আরও আছে—কাশ্মীরী গেট, আজমীরী গেট—

রাণা হঠাৎ আপশোস করে বলল: ইস্! দেখলেন কাণ্ড! কোট্‌লার কাছে খুনী দরওয়াজা দেখাতে ভুলে গেলাম।

খুনী দরওয়াজা!

রাণা বলল: হ্যাঁ, খুনী দরওয়াজা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় খুনে ভেসে গিয়েছিল এই দরওয়াজা। সেই থেকে এই গেটের নাম হয়েছে খুনী দরওয়াজা।

সত্যি নাকি!

রাণা বলল: এ গল্প মিথ্যে নয়। এক শো বছর তো এখনও হয় নি। দরিয়াগঞ্জের পুরনো বাসিন্দারা তাদের বাপ-পিতামহর কাছেই গল্প শুনেছে।

লাল কিলার লাল দেওয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম। বেশি ক্ষণ আমরা নীরব থাকতে পারলুম না। স্বাতি বলল: আমরা শাহজাহানাবাদে এসে গেলাম, তাই না?

মুখ না ফিরিয়েই রাণা বলল: ঠিক ধরেছেন। এ সমস্তই শাহজাহানের কীর্তি।

বলেই মোগল কীর্তির একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল রাণা, বলল: বাবরের কিছুই নেই, হুমায়ুনের পুরাণা কিলা দেখলেন। সসারামের শের শাহ সুরি হুমায়ুনকে হারিয়ে পনের বছর ছিলেন দিল্লীর গদিতে। তাঁর কীর্তি সব পুরাণা কিলার ভেতরে। বাইরে আছে ইসা খানের কবর আর মসজিদ। এই পথেই পড়েছিল, দেখাতে ভুলে গেছি।

একটু থেমে বলল: এবার দেখব শাহজাহানের লাল কিলা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক। সফ্‌দরজঙ্গের কবর কাল দেখেছি, আদম খান আর খান-ই-খানানের কবর চৌষট্‌ খাম্বা না দেখলেও ক্ষতি নেই। জয়সিংহের যন্তর মন্তর পরে দেখব। সে আমাদেরই পাড়ায়।

লাল কেল্লায় পৌঁছে আমরা থামলুম। মোটর থেকে নেমে বেশি দূর অগ্রসর হই নি, মিত্রাদের এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এক দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক একটি সুশ্রী মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসছিল। অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছল দেখাচ্ছিল দুজনকে। মিত্রা সরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই যুবক হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। তখুনি আবার সামলে নিয়ে বলল: আরে, আজ তোমরা এখানে!

বাঙলা নয়, কথা কইল হিন্দুস্থানীতে।

মিত্রা উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে রাণা এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা, প্রশ্ন শুনে ফিরে দাঁড়াল। বলল: চাওলা যে! কী খবর?

পরিচয় হল। রাণা পরিচয় করিয়ে দিল: মিস্টার চাওলা, বিজনেসম্যান, আমাদের বন্ধু।

আর মামাকে দেখিয়ে বলল: মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গোস্বামী, বাবার বন্ধু এঁরা। এঁদের মেয়ে আর ভাগনে।

চাওলা নমস্কার করল সবাইকে, আর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমিও হাত বাড়িয়ে বললুম : আমার নাম গোপাল।

হিন্দী জানি নে বলে বললুম ইংরেজীতে।

মেয়েটির নামও জানতে পেলুম। চাওলা বলল : বীণা বাত্রা।

কিন্তু পরিচয় দিল না।

মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একবার তার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে গেল। কিন্তু কথা কইল না।

রাণা এগিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই দাঁড়িয়ে আলাপ করবার সময় নেই। বললুম : আবার দেখা হবে তো?

চাওলা হেসে বলল : হবে বৈকি।

কথা না বলে মামা মামাও এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের দূরত্ব লক্ষ্য করে বলল : কোথায় উঠেছেন?

মামার ঠিকানাটা বললুম।

চাওলা আর একবার হাত বাড়িয়ে বলল : আসব এক দিন।

একটুখানি দূরে একখানা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। চলতে চলতে পিছন ফিরে দেখলুম, দুজনে সেই গাড়িতে উঠে বসল।

চাওলা কি হাসছে!

১১

চাওলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পরে। অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাধারণ নিয়মে ধীরে ধীরে নয়, এক দিনেই। তার বাহিরটা দেখে ভুল করেছিলুম, ভিতরটা দেখতে পেয়ে সে ভুল ভেঙে গেল। রাণাদের কাছ থেকে তার যে পরিচয় পেয়েছিলুম, নিজে পরিচিত হয়ে সে পরিচয় পালটে নিলুম।

চাওলা সেই ধরনের মানুষ যাকে দেখলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। চালে চলনে এমন একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। যারা চোখ খুলে চলে, তারা ফিরে দেখবে। বুদ্ধিমান যারা, তারা আলাপ করবার সুযোগ খুঁজবে। মিত্রার সঙ্গে এগোতে এগোতে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। লোকটার আকর্ষণ কিসের? স্বাস্থ্যের, রূপের, না আর কিছুর? পাশের মেয়েটিও তো সুশ্রী। বলিষ্ঠ চেহারা চাওলার মতো। পাঞ্জাবী পোশাকে তাকেও ভাল দেখাচ্ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করলে এখুনি ভুলে যেতে পারি। যদি মনে থাকে তো চাওলার জন্যই থাকবে।

রাণারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মিত্রার সঙ্গে তাড়াতাড়ি হেঁটে তাদের ধরে ফেললুম। রাণার পাশে পৌঁছে মিত্রা বলল: কোথায় যেন দেখেছি মেয়েটাকে!

মুখ ফিরিয়ে রাণা বলল: আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মিত্রা ভাবছিল।

রাণা বলল: কিন্তু চাওলার সঙ্গে একে প্রথম দেখলুম। তাই না!

মিত্রার মুখ দেখে মনে হল, এ কথা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। বড় স্বল্পভাষী এই মেয়েটি, বড় পরিমিতভাষী। যতটুকু প্রয়োজন, তার

চেয়ে বেশি বলে না। আর প্রয়োজন বোধও সাধারণের চেয়ে কম। মনের সঙ্গে মানুষের মুখের একটা যোগ আছে। অদৃশ্য যোগ। মনে যা কিছুর ছায়া পড়ে, মুখে তার খানিকটা প্রকাশ হবেই। এ যেন লেখার কমেন্টারি, চোখে দেখে মুখে বলে যাচ্ছে। যারা দেখতে পাচ্ছে না, তারা রেডিও খুলে শুনছে। আর একজনের মনের কথা আমরা কান দিয়ে শুনি। মন দিয়ে কজনে শোনে? মিত্রা মুখে কিছু বলে না, তার মনের কথা শুনতে হচ্ছে মন পেতে।

মামাবাবু অনেক ক্ষণ পরে কথা কইলেন, বললেন: বেশ ছেলেটি!

ওই কথা আমারও মনে হয়েছিল, এইবারে তার সমর্থন পেলুম। পথ চলতে চলতে অনেক লোকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়, আলাপও হয় অনেক লোকের সঙ্গে। কিন্তু 'বেশ ছেলে' আমরা ক জনকে বলি! আরও তো এক জন সঙ্গে ছিল। তাকে তো 'বেশ মেয়ে' কেউ বলছেন না!

মামার কথার উত্তর দিল রাণা, বলল: বেশ স্মার্ট ছেলে, চৌকস চালু ছেলে।

মামী অন্য প্রশ্ন করলেন, বললেন: তোমারই সঙ্গে কাজ করে বুঝি?

আমার সঙ্গে? না না, ও তো চাকরি করে না। দিল্লীতে ব্যবসা আছে ওর।

পরিচয় করিয়ে দেবার সময় এ খবরটা রাণা দিয়েছিল। মামী শুনতে পান নি, কিংবা ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমি তাঁর লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করলুম। বললুম: মামীমা বোধ হয় বন্ধুতার সূত্রটি জানতে চাইছেন?

ঠিক তাই।

এ প্রশ্নের ভিতর যে খানিকটা সৌজন্যের অভাব আছে, তা

জানতুম। শুধু মামীর জন্মই এই বেয়াদবি করেছি। এই বারে মিত্রার দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুঝতে পারলুম যে কাজটা নিতান্ত গর্হিত হয়েছে।

আমতা আমতা করে রাণা যা বলল, তাতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। বলল: আমাদের পরিবারের বন্ধু। অনেক দিন থেকেই জানাশুনো।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল: আমার বন্ধু।

তার পরে আর কিছু বলল না।

গোড়াতেই আমি এই আশঙ্কা করেছিলুম এবং আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মামা চমকে উঠলেন কিনা জানি না, মামী স্তম্ভিত হলেন, লজ্জাও পেলেন অপরিসীম। এইটুকু মেয়ে তাঁর সামনে এমন সপ্রতিভ হবে, এ তাঁর ধারণার বাহিরে। তাঁর যে সংস্কার, তাতে এ নির্লজ্জতা। নিজের মেয়ে সঙ্গে আছে, প্রশ্নটা না করলেই হত—মনে মনে বোধ হয় এই কথাই তিনি ভাবলেন।

স্বাতিও অবাক হয়েছে দেখলুম। বোধহয় মুগ্ধও হয়েছে খানিকটা। সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবার জন্য যে সাহসের দরকার, সকলের তা নেই। যার আছে, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। মুখে অস্বীকার করলেও মনে মনে যে করি, তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমটায় অপ্রীতিকর মনে হয়, বিরাগ আসে। তারপর ভুল বোঝার পালা শেষ হয়ে গেলেই সম্পর্ক অন্তরঙ্গ হয়। মিত্রাকে স্বাতি একটু একটু করে বুঝতে শিখছে।

রাণা একটু অপ্রতিভ হয়েছিল। বাপের বন্ধু যাঁরা, তাঁদের কাছে কথাটা না বললেই ভাল ছিল। বিশেষতঃ মামা মামীর মতো প্রাচীনপন্থী দুজন গুরুজনের সামনে সত্য কথাটা গোপন করলে ক্ষতি ছিল না। তাই একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টায় বলল: ঐ হল। বন্ধু তো তোমার একার নয়, পরিচয়টা না হয় আগেই

হয়েছে।

ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। মেয়েদের বন্ধু থাকবে না, সে যুগ আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। মেয়েদের শুধু মেয়ে বন্ধু হবে, সে দিনও গত হয়েছে অনেক দিন। এ খারাপ কি ভাল, সে প্রশ্ন ওঠে না। ভাল-মন্দর সংজ্ঞা আমরা বদলে নিয়েছি। তাও চূড়ান্ত নয়, প্রয়োজন মতো প্রতি দিন বদলাচ্ছি। কাজেই চাওলাকে মিত্রার বন্ধু বলে ভাবতে আমার সংস্কারে বাধে না, বরং সহজই মনে হয়। বন্ধুতা মানে তো স্বেচ্ছাচার নয়। তাই প্রসঙ্গটা আমি পালটে দিলুম, বললুম : এখানে কী দেখবার আছে ?

সকলের আগে মিত্রা আমার দিকে চাইল, কিন্তু উত্তর দিল না। প্রশ্নটা যাকে করেছিলুম, উত্তর সে-ই দিল, বলল : দেখবার ? দেখবার অনেক কিছু আছে। বলে তার নোট বুক খুলে ফেলল।

রাণার কথার ভিতর আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। মনে হল তার বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারি পাথর নেমে গেল। একটা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা টাটকা বাতাস নিল বুকে। আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানকয়েক পাতা উল্টে রাণা বলল : লাল কিলার ভেতরে সবটুকুই দেখবার। বিখ্যাত ফার্গুসন বলেছেন যে এমন প্রাসাদ প্রাচ্যে তো নেইই, পৃথিবীর কোনখানে বোধ হয় নেই। শাহজাহান নিজেও এ কথা জানতেন। তাই দেওয়ান-ই-খাসের দেওয়ালে লিখলেন আপন মনের কথাটি। ফার্সি আমি পড়তে পারি নে, গাইডের মুখে শুনেছি সেই লাইনের মানে।—পৃথিবীতে যদি কোন স্বর্গ থাকে তো এই সেই স্বর্গ, অন্য কোথাও নয়।

রাণা সেই স্বর্গ আমাদের দেখাল। দশ বছর ধরে তৈরি বিরাট প্রাসাদ। তারই ভিতর এই দেওয়ান-ই-খাস, বাদশাহের খাস দরবার, যেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে বাদশাহ পরামর্শ করতেন। কী সুন্দর কারুকার্য !

এই দেখুন।

দেওয়ালের দিকে রাণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সোনার অক্ষরে দু ছত্র কবিতা জ্বলজ্বল করছে।

আর এইখানে ছিল বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন।

বলে রাণা আর একটি জায়গা দেখাল। বলল: বিলিতি টাকায় সে যুগে তার দাম ছিল বার মিলিয়ান পাউণ্ড। মানে পনের কোটি টাকার ওপর।

একখানা সিংহাসনের দাম পনের কোটি টাকা!

মামা আশ্চর্য হলেন।

মামা উত্তর দিলেন: কেন হবে না? এক টুকরো হীরের দাম যদি লক্ষ টাকা হয় তো সিংহাসনের দাম পনের কোটি আর এমন বেশি কী?

তা বটে!

মামী একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। এমন অপব্যয়!

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: ময়ূর সিংহাসন কেন নাম হল রাণাবাবু?

চমকে উঠে রাণা জবাব দিল: এই বিপদে ফেললেন! এমন প্রশ্ন আমার মনে কোন দিন আসে নি।

মামা আমার দিকে চাইলেন।

এবারেও আমি লজ্জা পেলুম। চেয়ে দেখলুম, মিত্রা আমার লজ্জাটুকু উপভোগ করছে। অনুরোধ শোনার অপেক্ষা না করে বললুম: ছেলে বেলায় স্কুলের বই-এ সব পড়েছিলুম।

মামার দৃষ্টিতে যেন গর্বের ইঙ্গিত পেলুম। তাই সিংহাসনের বর্ণনা করলুম সালঙ্কারে। বললুম: বিলিতি চেয়ারের মতো সিংহাসন নয়, কতকটা আমাদের দেশের ঠাকুরের সিংহাসনের মতো। তক্তপোষের মতো চার কোণা। তার সোনার পায়া। বারটি থামের ওপর মীনে করা ছাদ, থাম মরকতের। তার প্রত্যেকটির মাথায়

একজোড়া করে ময়ূর মুখোমুখি চেয়ে আছে। মাঝখানে একটি মণিমাণিক্যের গাছ। মনে হবে, যেন ময়ূর দুটো সেই গাছের ফল খাচ্ছে ঠুকরে ঠুকরে।

রাণা আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু স্বাতির পরিবর্তন দেখলুম না। আমাকে এড়িয়ে রাণাকে প্রশ্ন করল: এই ময়ূর সিংহাসন এখন কোথায় রাণাবাবু?

রাণা তার মনের কথাটিই বলে ফেলল: গোপালবাবু থাকতে আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন!

রাণাকে বেশি বলতে দিলে বেশি লজ্জা পেতে হবে। তাই উত্তরটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলুম। বললুম: এই লাল কিলার নির্মাণ শুরু হয় ১৬৩৯ সালে। ঠিক এক শো বছর পরে পারস্যের নাদির শাহ এসে এই ময়ূর সিংহাসন লুঠ করে নিয়ে যান।

মতি মসজিদ দেখে আমরা মিউজিয়াম অব আর্কেয়লজি দেখলুম। পুরাকালের কত জিনিসই না সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে! অস্ত্রশস্ত্র মুদ্রা ছবি মসলন্দ গালিচা আরও কত কী!

রাণা বলল: লাল কিলার আরও একটি মিউজিয়াম আছে। ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম। প্রথম মহাযুদ্ধে অর্জিত নানা রকমের পুরস্কারের।

স্বাতি বলল: কলকাতার মতো বড় জাদুঘর নেই দিল্লীতে?

রাণা বলল: জাদুঘর এখানে একটা নয়, গোটা চারেক। নয়া দিল্লীতে আরও দুটো জাদুঘর আছে। কুইন্‌স্ ওয়েতে সেণ্ট্রাল এশিয়ান অ্যাণ্টিকুইটিস্ মিউজিয়াম। এশিয়ার চীনা তুর্কিস্থান এক সময় নানা দেশের নানা সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র ছিল—গ্রীস ইরান ভারতবর্ষ ও চীনের লোকেরা এখানে মিলিত হত। সেখান থেকে নানা জিনিস উদ্ধার করে এনেছেন স্যর স্টেইন।

আর একটা?

আর একটা একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতর। তাকে

ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ইণ্ডিয়া বলে, ভারতীয় আর্ট ও আর্কেয়লজির নানা নিদর্শন তার ভেতর।

স্বাতি বলল ঃ আমরা এ সব দেখি নি।

রাণা বলল ঃ বেশ তো, এক দিন দেখা যাবে। শনিবার দেখলেই ভাল। সেদিন আট আনা পয়সা দিতে হয় বটে, কিন্তু গাইড পাওয়া যায় দেখাবার জন্যে।

ফোর্টের মুখোমুখি জামা মসজিদ। ছুটো মিনার আর তিনটে গম্বুজ পাশাপাশি। তিন দিকে বিরাট ফটক, রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে ঢুকতে হয়। কিন্তু মামী গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন না। বললেন ঃ এ তো মন্দির নয়, কী হবে সময় নষ্ট করে ?

আপত্তি যে সময়ের নয়, আপত্তি সংস্কারের, তা সকলেই বোঝেন। তাই পীড়াপীড়ি কেউ করলেন না। আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় মাদ্রাজে গির্জার ভিতর তিনি ঢুকতে চান নি। বাহিরটা দেখেই ফিরে এসেছিলেন। সেখানকার কমিউনিয়ান টেবলের উপরে টাঙানো ছিল র‍্যাফেলের বিখ্যাত ছবি লাস্ট সাপার। আর তাদের বিবাহের খাতায় ছিল ক্লাইব আর ইয়েলের নাম। মামীর সংস্কারকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে আমরা তা দেখতে পাই নি। আজও আমরা নামলুম না। ধীরে ধীরে মোটর চালিয়ে চাঁদনি চকের দিকে এগিয়ে গেলুম।

শাহজাহান বাদশাহের সময় থেকে আজও পর্যন্ত চাঁদনি চকের ইজ্জৎ কমল না। লাল কিলা থেকে ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত এক মাইল লম্বা এই বাজার। ডান হাতে বাগান পেরিয়ে পুরনো দিল্লী রেল স্টেশন। মোগল আমলে নাকি যমুনার খাল বইত রাস্তার মাঝখান দিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের বছর চারেক আগে ইংরেজরা তা বুজিয়ে দিয়েছে। রাণার কাছেই এ সব খবর পেলুম।

বেলা খুব বেশি হয় নি, কিন্তু মিত্রাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। স্বাতি সেই কথাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল: মিত্রাদির কি আজ শরীর খারাপ ?

মিত্রা স্বীকার করল না, বলল : না তো।

রাণা বলল : তবে এমন চুপ করে আছ কেন ?

মিত্রা কোন উত্তর দিল না। মনে হল, উত্তরটা বুঝি দেবার মতো নয়।

নর্থ অ্যাভেনিউএ আমাদের নামিয়ে দিয়ে রাণারা আজ ফিরে গেল। কিছুতেই নামল না।

চৈত্রের উত্তাপ দেখে ভয় হচ্ছে। গ্রীষ্ম যে দুঃসহ হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

১২

খেয়ে উঠে মামা একটু বসে ছিলেন। এক পাইপ তামাক খেতে যতটুকু সময় লাগে, ঠিক ততটুকু। তারই মধ্যে একটুখানি গল্প হল।

মামা বললেন : কেমন দেখছ এদের ?

কিছু না ভেবেই আমি তাঁকে জবাব দিলুম : চমৎকার মানুষ মনে হল।

মামা কী বুঝেছেন জানি নে, বললেন : ভাল কী দেখলে ?

বললুম : কেমন যত্ন করে সব দেখাচ্ছে বলুন।

মামা তেড়ে উঠে বললেন : তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সব বুঝে শুনে এমন ন্যাকা সেজো না।

আমি এ কথার কী উত্তর দেব! তবু বললুম : খারাপ তো এখনও কিছু দেখতে পাই নি মামাবাবু ?

মামার পাইপের তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল। ধোঁয়া না পেতেই ছাইটুকু ঝেড়ে ফেললেন। উঠে যাবার সময় বলে গেলেন : তোমার ডেঁপোমি দেখছি কোন দিন যাবে না।

এ তাঁর রাগের কথা। আমার কাছে তিনি যা শুনতে চেয়েছিলেন, আমি তা বলি নি। যা বলেছি, তা বিশ্বাস করেন নি।

স্বাতি কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। মামা উঠে যেতেই কাছে এসে বসল। মামী আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের শ্রবণ বাঁচিয়ে বলল : বাবা হঠাৎ চটে উঠলেন কেন ?

গম্ভীর ভাবে বললুম : রাণাবাবুর নিন্দে করে ফেলেছিলুম।

তুমি ভারি বোকা তো গোপালদা! সব জেনে শুনে বাবার সামনেই নিন্দে করে ফেললে!

আরও গম্ভীর হয়ে বললুম : এক দম মনে ছিল না।

স্বাতি এবারে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর খানিকটা সংযত হয়ে বলল : নাও, বল এইবারে।

মামার প্রশ্নটা তাকে বললুম, আমার উত্তরটাও শোনালুম।

সব শুনে স্বাতি বলল : বাবার রাগের কারণ কী জানো ?

আমি জানি না স্বীকার করলুম।

স্বাতি বলল : এই তোমার বুদ্ধি !

হেসে বললুম : বুদ্ধি থাকলে কি আর তোমার পাল্লায় পড়ি !

স্বাতিও হাসল। ভাল লাগল তার এই হাসি। বললুম : বল এইবারে।

স্বাতি বলল : বাবা ঠিকই বলেছেন ! সব জেনে শুনে তুমি ভালমানুষ সাজছ।

তোমরা কি চাওলার কথা ভাবছ ?

স্বাতি সমর্থন করে বলল : চাওলার সঙ্গে মিত্রাদির একটা সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তাই না ?

ওরা তো সেটা স্বীকার করল না।

কিন্তু পারল কোথায় ! অস্বীকার করতে চেয়েও যে ধরা দিয়ে ফেলল।

ধরা পড়েছে, এ কথা আমি মানি নে। এ আমাদের একটা সন্দেহ মাত্র।

সন্দেহ নয়, আমি নিঃসংশয়।

কিসে নিঃসংশয় হলে বলবে না

মিত্রাদির ব্যবহারে। গল্প করতে করতে আমরা সবাই এগিয়ে গিয়েছিলুম। চাওলাদের আমরা দেখতে পাই নি। মিত্রাদি শুধু দেখেই নি, পথের পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল : এতে সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হই নি। তার পর মিত্রাদি যখন চাওলাকে উত্তর দিল না, রাণাবাবু এগিয়ে এল তার কথার জবাব দিতে, তখুনি আমি নিঃসংশয় হলাম। এ তো লজ্জা নয়, এ অভিমান, কিংবা তার মর্যাদা বোধ।

স্বাতির কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। এতও লক্ষ্য করে এই মেয়েটা।

আমার কথা বিশ্বাস হল না বুঝি ?

কেন হবে না। হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। তুমি কি আর না বুঝে বলছ।

না বুঝেই হয়তো বলছি। কিন্তু মনে হয়, এ অনুমান আমার মিথ্যে নয়।

কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি ভাবছি, মেয়েদের কি পুরুষ বন্ধু থাকতে নেই, না, থাকলেই এমন গভীর ভাবে আলোচনা করতে হবে। বড় সেকেলে আমরা, তাই না ?

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল : আমার বন্ধুদের নাম শুনলে তুমি চমকে যাবে। মা তো রীতি মতো ভয় পান।

তুমি পাও না তো ?

পাই বইকি, তোমাকে আমার বেশি ভয়।

তার এই তরল পরিহাস ভাল লাগল। বললুম : একটু ভয় পাওয়াই ভাল।

আমরা যে সংস্কার মুক্ত হতে পারি নি, এই কথাটাই আমার বারে বারে মনে এল। যে সংস্কার এ দেশে এক দিনে গড়ে ওঠে নি, যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যা সমাদৃত, তাকে ঝেড়ে ফেলতেও আমাদের সময় লাগবে। মামা মামীর আচরণে আজ আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হল।

স্বাতির মনের ধারাও বুঝি একই খাতে বইছিল। বলল : জান গোপালদা, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাবা বোধ হয় কিছুই পড়েন নি। তাঁর পড়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু মা পড়েন।

স্বাতি খুব মৃদু স্বরেই কথা কইছিল, এবারে যেন হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কী হল ?

আরও কাছে সরে এসে স্বাতি বলল : নতুন লেখকদের লেখা তো মা কখনও পড়েন না, পুরনোদের লেখা পড়বার সময়েও এক এক সময় তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়।

তার কথার ধরনে আমিও হাসলুম। বললুম : মেয়ে কী করে বেড়ায়, তা দেখতে পেলে বোধ হয় আর লজ্জা পেতেন না।

স্বাতি চটে উঠে বলল : কী করে বেড়াই আমি শুনি।

তা দেখে বেড়াবার আমার সময় কোথায়!

স্বাতি অনেকক্ষণ কথা কইল না, তার পর উত্তর দিল : আমার সম্বন্ধে যে তোমার কোন কৌতূহল নেই তা জানি।

তার ভঙ্গিতে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর লক্ষ্য করে খুশী হয়ে বললুম : কী করে জানলে ?

অঘ্রানে আমার বিয়ের কথা শুনেছিলে। কেন হল না, সে কথা তো একবারও জানতে চাইলে না ?

এই কথা!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল আশ্চর্য হয়ে।

বললুম : এ তো আমার জানা কথা।

তুমি জানতে ?

তুমি যে ওকে বিয়ে করতে পারবে না, সে কথা তো নিজেই আমাকে বলেছিলে!

কেন পারব না ?

হেসে বললুম : কাউকেই পারবে না।

স্বাতি বোধ হয় এমন কথা কখনও শোনে নি। আরও কিছু শোনবার জন্য চেয়ে ছিল। অত্যন্ত চুপি চুপি আমি যোগ করলুম : স্বাতি তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে কিনা, তাই আর কাউকে তার পছন্দ হবে না।

ঠোঁট উল্টে স্বাতি বলল : বড্ড গেঁয়ো রসিকতা!

রসিকতা নয়, সত্যি কথা বল। আজকের এই সভ্য পৃথিবীতে

সুন্দর বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তো গ্রামেই আছে। তাই গেঁয়ো কথাই সত্যি কথা। দক্ষিণে কথাকলি নাচের ছবি দেখেছ তো? আমরাও অমনি এক একটা মুখোস পরে শহরের রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছি। মানুষ দেখতে হলে এখনও আমাদের গ্রামেই যেতে হবে।

স্বাতি বলল: তোমার কথাগুলো শুনতে ভাল, লিখলে পড়তেও হয়তো ভাল লাগবে। স্বপ্ন যেমন ভাল লাগে, তেমনি ভাল লাগা। দিনে দিনে তোমার কথা এমন অবাস্তব হচ্ছে যে সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে ভাল করে ছেঁকে না নিলে লোকের পাতে তা কিছুতেই পরিবেশন করা চলে না।

তার কথা বলার ধরন দেখে আমি হেসে ফেললুম।

হাসলে যে?

হাসবার মতো কথাই যে বলছ।

মানে?

মানে সোজা। এক নিঃশ্বাসে অতগুলো কথা আমি বলতে পারি না। লিখে দিলেও যে পড়তে পারব, তা মনে হয় না।

স্বাতি বোধ হয় লজ্জা পেল। বলল: বড় বড় কথা তোমাদের মুখ থেকে বেরোলে দোষ নেই, দোষ আমরা বললে।

হেসে বললুম: তোমরা আমরা বলছ কেন, বল তুমি আমি।

এমনি অবান্তর তর্ক আরও কত ক্ষণ চলত জানি নে, স্বাতির হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে যেতেই বলল: দেখেছ, কী ভুলই এত ক্ষণ করছিলাম!

কেন, দুপুরে শোবার ইচ্ছে ছিল বুঝি?

পাগল! দুপুরে আমি আমি ঘুমোই কখনও!

তবে?

স্বাতি বলল: দেবলা দেবীর গল্প শোনাবে না? যে কথাটি আমি ভুলে যাব—

বলে চেয়ারখানা আরও কাছে সরিয়ে আনল।

আবার আমি হেসে ফেললুম।

দৃষ্টি দিয়ে স্বাতি আমায় ভৎর্সনা করল। আর তখনি আমি সামলে নিলুম নিজেকে। গম্ভীর হয়ে বললুম: কিন্তু আকাশে এখন চাঁদ কই, কই জ্যোৎস্না ?

স্বাতি ধমক দিয়ে বলল: সারা দিন অত তামাশা ভাল লাগে না গোপালদা। তুমি কি সীরিয়াস হতে কোন দিন শিখবে না ?

হাত জোড় করে বললুম: ঘাট হয়েছে, এবারের মতো মাপ কর। আমি ভেবেছিলুম, রাণার মোটরে বসে আছি।

স্বাতির চোখে আর ভৎর্সনা দেখলুম না, কৌতুকে উজ্জ্বল হল।

বললুম: তোমাকে বলতে চেয়েছিলুম শুধু একটি দৃশ্যের কথা। দেবলা দেবী নাটকের একটি দৃশ্য। দেবগিরিতে খিজির খানের শিবিরে বিচার হচ্ছে বন্দী রাজা বলদেবের। তাঁর আশ্রয়প্রার্থী দেবলা দেবীও উপস্থিত আছেন। খিজির খান দেখলেন, দেবলা সত্যিই সুন্দরী, এমন রূপ তিনিও বুঝি দেখেন নি। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

আমি ভাবছিলুম, কী ভাবে গল্পটা বলব। কিন্তু স্বাতি ভাববার অবকাশ দিল না। একটুখানি থামতেই তার আগ্রহ জানিয়ে দিল। তাই বললুম: খিজিরের অন্য কথা মনে পড়ল। তিনি শুনেছেন যে দেবলা বলদেবকে ভালবাসেন, বলদেব বিয়ে করবেন দেবলাকে। এই ভালবাসা যদি সত্য হয়, ভেজাল যদি না থাকে তাঁদের প্রেমে, তবে খিজিরের কী কর্তব্য হবে। স্বার্থ ত্যাগ ? খিজির তা পারবেন। কিন্তু বাদশাহের আদেশ ? দেবলাকে বেঁধে না নিয়ে গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মদ্যপ বাদশাহ এখন কমলা দেবীর মুঠোর ভেতর। তাঁর মৃত্যুদণ্ডেও সই করিয়ে নিতে পারেন। তবু খিজির খান তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। পরীক্ষা নিলেন দেবলা ও বলদেবের।

এ গল্প শুনতে যে স্বাতির ভাল লাগছিল, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম। বললুম : খিজির বললেন, দেবলা যদি তাঁর দেহরক্ষী, নাম বোধ হয় ইরাণী, তাকে বিয়ে করে, তবে তিনি বলদেবের মুক্তি দেবেন। দেবলা নিজের কথা এক বারও ভাবল না, নিজের সুখের কথা, নিজের জীবনের কথা। তখনি সম্মত হয়ে বলল, বলদেবের মুক্তির জন্যে সে সব করতে পারে। কিন্তু বলদেব তাতে রাজি নন। বললেন, তাঁর জীবন নিয়ে যা ইচ্ছে করা হোক, দেবলার ফুলের মতো জীবন যেন শুকিয়ে না যায়, তার মুক্তি চাই। খিজির খান মুগ্ধ হলেন। ভুলে গেলেন নিজের লোভের কথা, নিজের বিপদের কথাও। এদের প্রেম যে সোনার মতো খাঁটি, তা না হলে আত্মদান এমন সহজ হত না। দুজনের বিয়ে দিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে খিজির দিল্লী ফিরে এলেন।

তারপর ?

স্বাতি ব্যস্ততা প্রকাশ করল।

বললুম : মালিক কাফুরের কৃপায় হাওয়ায় ভেসে গেল সে সংবাদ। দিল্লীতে মৃত্যুর পরওয়ানা তৈরি হয়ে গেল বিজয়ী বীর খিজির খানের অভ্যর্থনার জন্যে।

স্বাতির বুক থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়ল।

১৩

ট্রেন আমার ভাবনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কত শত স্টেশন পেরিয়ে এক সময় মথুরায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানেও যমুনা দেখতে পেলুম না। যমুনা দেখেছিলুম দিল্লী যাবার পথে বৃন্দাবনে নেমে। দেখেছি প্রাণ ভরে।

বৃন্দাবনের কথায় মনে এল মাসির কথা। দিল্লীর বৈঠকখানায় বসে মামীও সে দিন মাসির গল্প শুনতে চেয়েছিলেন। পাশে একখানা চেয়ারে বসে বলেছিলেন: বৃন্দাবনে তোমার বড় মাসিকে কেমন দেখলে ?

কেমন দেখলুম ?

মামী একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, বললেন: না না, আমি তাঁর শরীরের কথা বলছি না, তিনি ভাল আছেন আমরা জানি।

তিনি কী জানতে চাইছেন তা বুঝি। কিন্তু বুঝলেই কি সব কথা বোঝানো যায়! আমি ইতস্তত করছিলুম। তা লক্ষ্য করে মামী বললেন: কয়েকটা দিন তো তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে এলে, কেমন দেখলে তাঁর মনের অবস্থা ?

স্বাতি কাছেই ছিল, হেসে ফেলল তার মায়ের কথা শুনে।

মামী একটু চটবার ভান করে বললেন: হাসছিস যে ?

হাসব না! মানুষের মন কি ময়রার মিষ্টি মা, যে আসতে যেতে তার আস্বাদ নেওয়া যায়!

স্বাতির পাকামি দেখে মামী এবারে সত্যিই চটলেন, বললেন: তুই চুপ কর্ স্বাতি।

স্বাতি আর একটু হেসে চুপ করল।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: মাসির বয়েস হয়েছে তো, মনের নাগাল পাওয়া ভার। আমায় নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে রইলেন যে কোথা দিয়ে কয়েকটা দিন কেটে গেল তা টেরই পেলুম না।

পাশের ঘরে মামার নাক ডাকার শব্দ বন্ধ হল। স্বাতি বলল: বাবার ঘুম ভাঙল, যাই রামখেলাওনকে ডেকে দিই।

বলে বেরিয়ে গেল, আর কয়েকটা মুহূর্ত না যেতেই আবার ফিরে এল।

আমি মাসির কথাই ভাবছিলুম। সম্বন্ধটা যে নিকট নয় তা জানি, কিন্তু দূর কতটা তা জানতে বাকি আছে। মামার সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধই নেই, তা জেনেছি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়। ট্রেনে মামা নিজেই এক দিন এ কথা প্রকাশ করেছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর মায়ের সই-এর মেয়ে। কী একটা রোগে কয়েক দিনের ব্যবধানে আমাব দাদামশাই আর দিদিমা মারা যান। সেই থেকে আমার মা মানুষ হয়েছেন মামার মায়ের কাছে। আপন ভাই বোনের মতোই মানুষ হয়েছিলেন। আমার মাসির সঙ্গে কিন্তু সম্বন্ধ এ রকম নয়। মামা বলেছেন যে দুরবীন লাগিয়ে দেখতে হয় সত্যি, কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ একটু আছে। ভেবেছিলুম মাসিকে খুব বুড়ো দেখব, হয়তো দেখব ভেঙেই পড়েছেন। কিন্তু বলতে দোষ নেই, তাঁকে দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলুম। চাঁপার মতো উজ্জ্বল তাঁর রঙ, মুখে অদ্ভুত প্রসন্নতা। দেহের গড়নে ছোট মাসির চেয়ে ছোটই মনে হয়। বাড়ি পৌঁছে তাঁর পায়ের ধূলো নিতেই কাছে টেনে নিয়ে বললেন: ভারি মিষ্টি ছেলে।

লজ্জা পেলুম তাঁর কথা শুনে।

মাসি বললেন: দিদিকে কবে দেখেছি, আজ মনেই পড়ে না। দেখেছি কিনা তাও মনে নেই। বিয়ের আগে মার কাছে তাঁর গল্প শুনেছি।

হঠাৎ যেন বিষণ্ণ মনে হল মাসিকে। শুধু একটি মুহূর্ত। তার

পরেই প্রসঙ্গ পালটে বললেন : এস, ভেতরে এস।

তাঁর জীবনযাত্রা দেখলুম। বড় সরল অনাড়ম্বর, একেবারে বাহুল্যবর্জিত। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কিছুই নেই।

পরে জেনেছিলুম, আছে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে তাঁর গোপাল আছে লুকনো। আমি দেখতে পেয়েছি দেখে বলেছিলেন : মানুষের একটা সখ না থাকলে তো চলে না। এ আমার সখ। এই গোপাল নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

মাসির দু চোখ কি ছলছল করে উঠল!

তারপরেই সামলে নিয়ে বললেন : আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন আপনভোলা মানুষ। সন্ধ্যেবেলায় একবার দাবা পেতে বসলে দুনিয়ার কথা ভুলে যেতেন। মা ছিলেন ঘোর সংসারী, সময়ের এমন অপব্যবহার তিনি সইতে পারতেন না। বেশি রাগারাগি করলে বাবা বলতেন, সখ একটা থাকা ভাল। তাতে আর কোন উপকার না হোক, ব্লাড প্রেসারে মরব না।

একটু থেমে মাসি বললেন : মা মারা যান ব্লাড প্রেসারেই।

এ কথা আরও এক জনের মুখে আমি শুনেছি। যাদের কোন সখ সাধ নেই, 'হবি' নেই, শুধু টাকার চিন্তা কিংবা সংসারের, ব্লাড প্রেসারে তারা কষ্ট পাবেই। কথাটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানি নে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ভাল করে ভেবে দেখলে হয়ত একটা বৈজ্ঞানিক কারণ পাওয়া যেতে পারে।

বৃন্দাবনে পৌঁছেছিলুম বিকেল বেলায়। শরীরে বোধ হয় ক্লান্তির লক্ষণ ছিল। তা লক্ষ্য করে মাসি কোথাও বেরোতে দিলেন না। বললেন : কখন বেরিয়েছ এলাহাবাদ থেকে ?

সময়টা মনে ছিল। অত্যন্ত বেয়াড়া সময়। কষ্টের সীমা ছিল না বলেই হয়তো ভুলতে পারি নি। বললুম : রাত প্রায় সাড়ে তিনটেয়।

মাসি চমকে উঠলেন ঃ বল কি। অত রাতে কেউ বেরোতে পারে।

পেরেছি তো। আর পেরেছি বলেই গাড়ি না বদলে এমন সুন্দর সময়ে এখানে পৌঁছে গেলুম। তা না হলে—

তা না হলে কী হত, সে কথা জানি নে। কলকাতা থেকে যে টাইম টেবল এনেছিলুম তাতে এই গাড়িটিরই নিশানা আছে। তিন রেলের তিনখানা টাইম টেবল থাকলে সবটুকু জানতে পারতুম।

মাসি আমায় সমর্থন করে বললেন ঃ তা ঠিক। সব দিকে সুখ হয় না।

কথাটি ছোট, কিন্তু আমার অনেক কথা মনে এল। মনে হল, এই সংক্ষিপ্ত উক্তি দিয়ে মাসি তাঁর মনের দরজা খানিকটা খুলে দিলেন। বাহির থেকেই আমি তাঁর পাওয়া না-পাওয়ার একটা খণ্ড হিসাব দেখতে পেলুম।

আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়তো কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। হঠাৎ হেসে বললেন ঃ আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যে বেলাটা এস গল্প করেই কাটাই।

গল্প করেই কাটালুম সন্ধ্যেটা।

মাসি এক সময় এলাহাবাদের কথা শুনতে চাইলেন। এলাহাবাদের কর্তার কথা। তাঁর প্রশ্নের আগে একটু সঙ্কোচ দেখেছিলুম। হয়তো একটু লজ্জা। কিন্তু লজ্জার কী আছে ? লজ্জার বয়স কি মাসি পেরিয়ে আসেন নি ?

আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললুম, কর্তার কথা, তাঁর ফুলের কথা। বললুম ছোট মাসির কথাও।

মাসি প্রশ্ন করলেন ঃ কুকুরগুলো কোথায় গেল ?

বললুম ঃ কোথায়ও যায় নি। সেগুলোও বাড়িতে আছে। তবে কর্তা আর তদারক করেন না, করেন ছোট মাসি।

বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল বড় মাসিকে। ছোট মাসির কথা বলে তাঁকে আঘাত দিলুম না তো! কে জানে!

পরদিন বৃন্দাবন দেখলুম মাসির সঙ্গে।

বৃন্দাবন নাম কেন হল গোপালদা?

স্বাতি আমায় প্রশ্ন করে বসল।

গল্পে বাধা পেয়ে আমি জবাব দিলুম: কী বিপদ! একটু যে সহজ ভাবে গল্প করব, তার উপায় নেই।

মামা কখন এসে গল্প শুনতে বসেছিলেন টের পাই নি। টের পেলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন: প্রশ্নটা স্বাতি মন্দ করে নি। নামেরও তো মানে থাকে, বিশেষ করে সেকালের নামে।

স্বাতি উৎসাহ পেয়ে বলল: বৃন্দার বন। কিন্তু বৃন্দা মানে কি?

বৃন্দার অনেক মানে। তার ভেতর সব চেয়ে প্রচলিত হল রাধা, যার অনেক বৃন্দ বা সখী ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শুনেছি বৃন্দাবনের এই মানে।

মামার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি অন্য মানে শুনবার অপেক্ষা করছেন। বললুম: কেউ বলেন, কেদার রাজের কন্যা বৃন্দা এইখানে তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন।

কঠিন ভাবে স্বাতি আপত্তি জানাল, বলল: এ গল্প কোথাও শুনি নি।

হেসে বললুম: আমিই কি ছাই শুনেছি! রাজা কুশধ্বজের কন্যা তুলসী ওরফে বৃন্দার নামও কখনও শুনি নি। তুলসীও তপস্যা করে হরিকে পেয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে। এ নিয়ে তর্ক হয় না। তবে মথুরার জন্মকথা পড়েছি রামায়ণ ও হরিবংশে।

সকলেরই আগ্রহ দেখলুম। তাই সেই গল্প শোনালুম সবাইকে: মথুরাপুর বা মধুপুর নির্মাণ করেন মধু দৈত্য। কিন্তু তাঁর পুত্র লবণ

ছিল অত্যাচারী। তাই তাকে হত্যা করে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন রামানুজ শত্রুঘ্ন। আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মাহোলি গ্রাম, সেই হল মধু দৈত্যের মধুপুর। শত্রুঘ্ন তাঁর পুরী নির্মাণ করেন বর্তমান কাটরা গ্রামের নিকট যেখানে ভূতেশ্বর মন্দির। আর বসতি নির্মাণ করান শূরসেন দেব। সেই শূরসেন বংশেই কংসের জন্ম।

তৎপর ভাবে স্বাতি বলল: শূরসেন নাম কি আমরা ইতিহাসে পড়ি নি গোপালদা?

তার প্রশ্ন শুনে আমি খুশী হয়ে বললুম: ঠিক বলেছ। মৌর্যযুগে শূরসেন রাজ্য বোধহয় পাটলিপুত্রের অধীন ছিল। প্লিনি লিখেছেন যে মথুরা ও কৃষ্ণপুর ছিল পালিবোথ্রার অন্তর্গত। মেথেরা ও ক্লিসোবোরা—এই দুই শহরের মাঝে যমুনা। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা পড়ে লিখেছেন আরিয়ান। খ্রীষ্টের জন্মের আগে মথুরায় ছিল শকাধিপত্য, পরে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত রাজ্য। তার পরে আবার শূরসেনরা রাজত্ব করেন আলা-উদ্-দীন খিলজীর আমল পর্যন্ত।

মামা বললেন: ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের কাহিনীতে মথুরার নাম আছে শুনেছি।

আছে বৈকি। মথুরার পরিধি কত, কত সংঘারাম, কত বৌদ্ধ যতি আর কত স্মৃতিস্তূপ—এ সবের হিসেব আছে তাঁদের লেখায়। জৈনদের তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নেমীনাথের জন্ম মথুরায়। প্রাচীন শিলালিপিতে তাঁদের কীর্তির কথা জানা যায়। মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম এল উপগুপ্তের সময়। স্থাপিত হল স্মৃতিস্তূপ, কুড়িটি সংঘারাম। এলেন দু তিন হাজার বৌদ্ধ যতি। এঁদের দেখতে এলেন ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ।

সব কথা বলবার আগেই মামী চটে উঠে বললেন: এটি কি ইতিহাসের ক্লাস? আমি শুনতে এলুম গোপালের মাসির কথা,

আর আমায় তোমরা তাড়িয়ে দেবে ?

সত্যি কথা। এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হল। মনে মনে আমি লজ্জিত হলুম। কিন্তু মামা দমলেন না, বললেন : সে গল্প তোমার পালাচ্ছে না। সবই শুনতে পাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন : বল গোপাল, তোমার মাসির গল্পই বল।

কিন্তু গল্প শুরু করবার আগেই রামখেলাওনের চা এল। তাকে দেখতে পেয়ে মামা বললেন : নাও, এই বারে জমবে ভাল।

মামী কথা কইলেন না বটে, কিন্তু তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি আমার পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে বললুম : পর দিন বৃন্দাবন দেখলুম মাসির সঙ্গে।

বেশ সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মাসি বললেন : সকাল সকাল ফিরতেও হবে। রান্নাবান্নাও আছে তো।

মাসি যে নিজেই রান্না করেন, তা কাল সন্ধ্যে বেলাতেই দেখেছি। শুধু বাসনটা মাজেন না, তার জন্য ঝি আছে। বলেছিলেন : নিজের হাতে ওটুকু করতে পারলেই আরাম পেতাম, কিন্তু তা পারলাম না। বৃন্দাবন এসেছিলাম শীতের দিনে, ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট হত। অভ্যেস নেই তো! সেই থেকেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছি।

পথ চলতে চলতে মাসি আমায় বৃন্দাবনের গল্প শোনালেন, বললেন : তোমাদের ইতিহাসে কি বলে জানি নে, পুরাণে আমরা বৃন্দাবনের গল্প পড়েছি। ব্রজধামে তখন নানা বিঘ্ন। কৃষ্ণের মন্ত্রণায় নন্দ মহারাজ ব্রজধাম ত্যাগ করলেন, এলেন এই বৃন্দাবনে। সে কি এই বৃন্দাবন? গোপ গোপীদের নিয়ে তাঁরা গাছের নিচে রাত্রিবাস করলেন। বৃন্দাবনের পত্তন হল রাতারাতি। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা এক রাতে এই নগর নির্মাণ করে দিলেন।

তারপর মাসি জানতে চাইলেন : জয়দেব পড়েছ ?

বললুম : জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছি।

খুশী হয়ে মাসি বললেন : বসন্তে বৃন্দাবনের কী রূপ ছিল বল। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য। মুসলমান আমলে কিছু আর রইল না। কৃষ্ণের লীলাস্থান দেখতে গৌরাঙ্গদেব যখন ছুটে এলেন, তার কোনও চিহ্ন দেখলেন না তিনি। আকুল হয়ে কেঁদে ভাসালেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী। দীর্ঘ দিন ব্রজমণ্ডলে থেকে সমস্ত তীর্থ উদ্ধার করেন।—

বৃন্দাবনে আচার্য শ্রীরূপ সনাতন
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন।
লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে
শ্রীরূপ গোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥

মাসিকে আমি একটা প্রশ্ন করলুম : কৃষ্ণের লীলার স্থান সবই কি বৃন্দাবনে ?

মাসি হেসে বললেন : মধুবন মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে। এমন বন কত আছে তার সঠিক হিসেব আমার জানা নেই। শুনেছি এখানে দ্বাদশ বন, দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন, দ্বাদশ অধিবন, দ্বাদশ সেবাবন, দ্বাদশ তপোবন, দ্বাদশ মোক্ষবন, দ্বাদশ কামবন, দ্বাদশ অর্থবন, দ্বাদশ ধর্মবন আর দ্বাদশ সিদ্ধিবন।

বনের এত বড় ফিরিস্তি শুনে আমারও হাসি পেল।

মাসি বললেন : একবার পরিক্রমায় বেরোব ভেবেছিলাম। পাণ্ডারা বলল যে বরাহ পুরাণে পরিক্রমার যে নির্দেশ আছে, আজকাল আর তা মানা হয় না। এখন নারারণ ভট্টের ব্রজভক্তি-বিলাস মতেই পরিক্রমা করা হয়।

চলতে চলতে মাসি বললেন : তুমি কিছু দিন থাকলে তোমার সঙ্গে একবার ঘুরে আসতাম। কয়েকটা জায়গায় যাবার সখ ছিল।

আমি মাসির মুখের দিকে চাইলুম।

বেশি নয়, কয়েকটা মাত্র জায়গা।

একটু থেমে আবার বললেন: বহুলা গাভীর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।

আমি যে নামটা ভুলে গিয়েছিলুম, মাসি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলেন। বললেন: বহুলার নামেও বন আছে। থাকবে নাই বা কেন! বহুলা কি মানুষের চেয়ে কম! প্রবাদ আছে যে বহুলাকে একবার বাঘে ধরে তার বাছুর ছিল বাড়িতে, তাকে তখন দুধ দেবার সময়। বহুলা বাঘের কাছে কাকুতি মিনতি করে খানিকক্ষণের জন্যে প্রাণ ভিক্ষা নেয়। তারপর বাছুরকে দুধ দিয়ে বাঘের কাছে আবার ফিরে আসে। এই বাঘ আর কেউ নয়, স্বয়ং বিষ্ণু বহুলার পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। পর্বতের গুহায় গো-মন্দির আর পাথরের গায়ে ক্ষোদা বহুলা গাই, তার বাছুর আর মধুসূদন মূর্তি। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছেই রাধা কুণ্ড আর শ্যাম কুণ্ড। শ্যাম কুণ্ডের জল কালো আর তপ্ত কাঞ্চনের রঙ রাধা কুণ্ডের জলের। অথচ এই দুই কুণ্ডের জলের নাকি যোগাযোগ আছে।

কত গল্প শুনলুম মাসির মুখে, সব কি মনে আছে! লুকলুক গুহায় কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলতেন, দুধের জন্যে লুকিয়ে থাকতেন সাঁকারি ঘোরে। ফুলের মালা গেঁথে গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করতেন খেলবনে, রাধার জন্যে বাঁশী বাজাতেন সঙ্কেত স্থানে। গাঁঠোলি গ্রামে তাঁদের প্রেমের গ্রন্থি-বন্ধন। ডাঙ্গোলিতে মান সরোবর, রাধার মান ভঞ্জন করেন তারই তীরে।

বুড়িকা খেরার গল্প বলবার সময় মাসি হাসছিলেন, বললেন: রাধার সহচরী ছিলেন মানবতী। তার স্বামীর রূপ ধারণ করে এক দিন কৃষ্ণ এলেন মানবতীর ঘরে। মানবতী শাশুড়ীকে পাহারা রেখে বললেন, অন্য কেউ এলে যেন তার মাথা ভেঙে দেন। বুড়ি মাথা ভাঙল তার নিজের ছেলের।

হাসতে হাসতে মাসি বললেন: কী ছেলেমানুষি বল।

তখন আমরা গোবিন্দজীর মন্দিরে পৌঁছে গেছি। বিরাট দালান ও প্রশস্ত চত্বর। মথুরার পুরাবৃত্ত-লেখক গ্রাউস সাহেবের কথা আমার মনে পড়ল। তিনি বলেছেন যে ইয়োরোপের গির্জার সঙ্গে এই মন্দিরের নক্সার কিছু মিল আছে। তাঁর সন্দেহ হয়েছে যে স্থপতিরা এই মন্দির নির্মাণ করেছে, তারা বোধহয় জেসুইট ধর্মপ্রচারকদের সাহায্য লাভ করেছিল। এ কথা সত্যি হতে পারে। কেন না, আকবর বাদশাহের দরবারে অনেক জেসুইট স্থান পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। আর ঐ সময়েই তো মন্দিরের নির্মাণ সমাধা হয়। রূপ সনাতন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু অর্থ ছিল মানসিংহের।

মাসি আমাকে মন্দিরের পূর্ব গৌরব শোনালেন। বললেন: মুসলমান বাদশাহের সময়ে এই মন্দিরের মাথা এমন ছোটখাট ছিল না। পাঁচ পাঁচটা উঁচু চূড়া ছিল। সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালা হত, তখন দিল্লী থেকেও আওরঙ্গজেব বাদশাহ একটা চূড়া দেখতে পেতেন। একদিন তাঁর উজীরের কাছে জানতে চাইলেন, এই আলো কোথা থেকে আসছে। উজীর বললেন, মথুরার আলো, কাফেররা বাতি জ্বালিয়েছে তাদের বড় মন্দিরে। বাদশাহ তখনি লোক পাঠালেন সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির জন্যে। কিছু দিন পরে বাদশাহ নিজে এসে নমাজ পড়ে গেলেন সেই মসজিদে।

ঠাকুর কোথায় গেলেন?

অম্বরে। খবর পেয়ে মন্দিরের পুরোহিত গোবিন্দজীর বিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু—

মন্দিরের ভেতর তর্ক নয় গোপাল। ধর্ম বিশ্বাসের কথা। বৃন্দাবনে এসে নির্বিচারে সব মেনে নেবে, তাতেই আনন্দ পাবে। তর্কে কি আনন্দ আছে?

এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। সত্য না হলে এত মানুষ কেন এখানে ভিড় করে থাকে! ধর্মে বিশ্বাস আমাদের এক দিনের নয়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ভগবানকে আমরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে গড়েছি আমরা নিজে, কত ত্যাগ কত অত্যাচার 'কত মৃত্যু বরণ করে। সেই প্রাণের ঠাকুরকে কি আমরা যুক্তি দিয়ে ভেঙে ফেলব, আমাদের বুদ্ধির অহংকার দিয়ে, আমাদের হাল্কা ফাঁকা মন নিয়ে? কী লাভ হবে তাতে? বৃন্দাবনে আমি তর্ক করব না, এই প্রতিজ্ঞা করলুম মনে মনে।

মদনমোহনের মন্দির দেখবার সময় মাসি আর একটা গল্প শোনালেন, মূলতানের বণিক কৃষ্ণদাসের গল্প। প্রবাদ আছে যে কৃষ্ণদাস যখন পণ্যবোঝাই নৌকো নিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কালিদহ ঘাটের কাছে বালির চরে তাঁর নৌকো আটকাল। তিন দিনের অক্লান্ত চেষ্টাতেও যখন নৌকো এগোল না, তখন কৃষ্ণদাস সনাতন গোস্বামীর শরণ নিলেন। সনাতনের সমস্ত ভরসাই তো মদনমোহন, প্রাণ ভরে সেই মদনমোহনকে ডাকলেন। তারপর দুলল নৌকো। কৃষ্ণদাস দেখলেন, কৃষ্ণের কৃপাতেই তাঁর নৌকো ভাসল। কিন্তু অকৃতজ্ঞের মতো কৃষ্ণদাস ভেসে চলে যেতে পারলেন না। ফেরার পথে তাঁর সমস্ত অর্থ দিলেন মদনমোহনের মন্দির নির্মাণের জন্যে।

এই মন্দিরের সঙ্গে আর একজনের নাম আছে জড়িয়ে। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি সুরদাস। আমিন ছিলেন আকবর বাদশাহর অধীনে, আর নিজের রোজগারের শেষ কড়িটি পর্যন্ত ব্যয় করতেন মদনমোহনের সেবায়। দিল্লীতে একবার টাকা পাঠাতে পারলেন না, পাথর পাঠালেন সিন্দুক ভরে। ধরা পড়ে বন্দী হলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁকে মুক্তি দিলেন। সবাই আশ্চর্য! এত বড় অপরাধের এ কী দণ্ড হল! বাদশাহ হাসলেন। মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ যে তিনি পেয়েছেন।

চলতে চলতে মাসি আমাকে বললেন : বৃন্দাবনে কি মন্দিরের শেষ আছে। আকবরের সভাসদ রায়সিংহের তৈরি গোপীনাথের মন্দির। তার ভাঙা অবস্থা। পাশেই নতুন মন্দির তুলেছেন নন্দকুমার বসু। রায়সিংহের বড় ভাই নোনকরণ নির্মাণ করেছেন যুগলকিশোরের মন্দির। রাধাবল্লভজীর মন্দির সুন্দরদাসের তৈরি। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির তুলেছেন শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির আমাদের লালাবাবুর কীর্তি।

গল্প শুনতে শুনতে স্বাতি আমার স্মরণশক্তির প্রশংসা করল, বলল : এত নাম তুমি মনে রাখলে কী করে ?

আমি হেসে বললুম : এটা প্রশংসা হল না স্বাতি। যত মনে রেখেছি তার চেয়ে বেশি গেছি ভুলে। কাচের মন্দির, শাহজীর মন্দির। মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে বিরলাও মন্দির তুলেছেন।

স্বাতি বলল : তোমার মন্দিরের কথা থাক। ফেরার পথে যখন বৃন্দাবনে নামব তখন সে সব দেখব।

তবে কি ঘাটের কথা বলব ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : কংসকে বধ করে কৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন সেই বিশ্রান্তি ঘাট, বা নন্দের কন্যা যোগনিদ্রাকে কংস যে ঘাটে আছড়ে ছিলেন সেই যোগ ঘাট, কিংবা কালিয়দমন ঘাট, কাল নাগকে ধ্বংস করতে কৃষ্ণ যেখান থেকে জলে নেমেছিলেন। এই রকম ছাব্বিশ ঘাটের ভেতর চীর ঘাট তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

কেন ?

স্বাতি তার প্রশ্নের দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম : এই ঘাটে কৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। আজও তার নিশানা আছে গাছের ডালে ডালে। নানান রঙের কাপড়ের টুকরো বাঁধা। যাত্রীরা পয়সা দিয়ে কাপড় কিনে গাছে বেঁধে যাচ্ছে।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল। বলল: যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ঘাটের গল্প ছেড়ে এবারে অন্য কিছু বল।

তবে বটের গল্প শোন।

সে আবার কী?

কেন, বংশীবট, যেখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন। আর অক্ষয় বট, যার জন্মের হিসেব নেই; কৃষ্ণের জন্ম দেখেছে বললেও হয়তো যাত্রীরা বিশ্বাস করবে।

স্বাতি আর একবার হেসে উঠে বলল: ঘাট আর বট ছাড়া তোমার কি আর কোন গল্প নেই গোপালদা?

গম্ভীর ভাবে বললুম: আছে। কুণ্ড আর বনের গল্প এখনও কিছু বলি নি। বেশি নয়, গোটা কয়েক বনের কথা তোমাকে শুনতেই হবে, নইলে বৃন্দাবনের গল্পই অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

মামা হাসছিলেন অল্প অল্প।

বললুম: নিকুঞ্জ বনে যদি যাও, দু পয়সার ছোলা নিতে ভুলো না। এ দুটো পয়সা যদি বাঁচাবার চেষ্টা কর, তাহলে তোমার গোটা ভ্যানিটি ব্যাগটাই যাবে। আর যদি কিছু না যায় তো সে তোমার ভাগ্য।

বড় বড় চোখে স্বাতি আমার মুখের দিকে চাইল। হেসে বললুম: বাঁদর।

আমাকে নিয়ে ঢোকবার সময় সত্যিই মাসি দু পয়সার ছোলা কিনেছিলেন। বলেছিলেন: কুঞ্জবন রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। দেখছ না, এখানকার গাছপালা যেন মাটির ওপর লুটিয়ে আছে।

ছোট একটি মন্দির দেখলুম। তার ভিতর ললিতা ও বিশাখা সখীর সঙ্গে রাধারাণী ও কৃষ্ণ। সবাই বলেন, এ বড় জাগ্রত মন্দির। আজও প্রতি রাতে কৃষ্ণ এখানে রাধারাণীর সেবা নিতে আসেন। সন্ধ্যা বেলার আরতির পর এক ঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পাণ্ডারা চলে আসেন। রাতে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

সকালে এলে দেখা যায় যে শুধু শয্যারই ব্যবহার হয় নি, দাঁত মেজে মুখও কেউ ধুয়ে গেছে। পাণ্ডার কাছে দর্শনী দিয়ে যাত্রীরা প্রমাণ নিয়ে যায়।

আপনি নিজে কখনও দেখেছেন মাসিমা ?

মাসির মুখ যেন গম্ভীর হল, বললেন : এই বিশ্বাসকে আমি যে শ্রদ্ধা করি গোপাল !

আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হলুম। বললুম : আমিও করব।

মাসি বললেন : শুনেছি আকবর বাদশাহ নাকি এ কথা অবিশ্বাস করেছিলেন। অবিশ্বাস করবারই কথা তো! তবু এখানে এসেছিলেন, চোখে কাপড় বেঁধে তাঁকে এখানে আনা হয়। কী দেখেছিলেন জানি না, বৃন্দাবনের নতুন জন্ম দিয়ে গেলেন। আজ এখানকার যা কিছু প্রাচীন গৌরব, সবই প্রায় তাঁরই আমলের।

বললেন : তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর কথা মনে আছে ? যে সর্বত্যাগী পুরুষ যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন স্পর্শমণি! আকবর এখানে তাঁকেও দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েও তিনি আদর পান নি। স্বামী হরিদাস বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন শিষ্য তানসেনকে, কিন্তু বাদশাহর দিকে ফিরে তাকান নি। অন্য বাদশাহ হলে কী করতেন জানি নে, আকবর স্বামীজীকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে গেলেন।

ফেরার পথে আমি মাসির কথাই ভাবতে লাগলুম। তাঁকে ঠিক এমনটি দেখব আমি ভাবি নি। মা-মাসি বলতে এত দিন আমার চোখের সামনে যে রূপ ভেসে উঠত, এ ঠিক তা নয়। এ যেন অন্য রূপ। যে বিশ্বাসকে মাসি সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন, মনে হল যে বুদ্ধি দিয়ে সে বিশ্বাসকে তিনি যাচাই করে নিয়েছেন। দুটোর আপেক্ষিক লাভ-ক্ষতি বিচার করে দেখেছেনে নিরপেক্ষ ভাবে, তার পরে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল যে এলাহাবাদে কর্তার সঙ্গে এই মাসির বুঝি কোনও পার্থক্য নেই। ইনি তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী। আচারে না হলেও তাঁর বিচারে নিশ্চয়ই। ইনিও সংস্কার মুক্ত, কিন্তু আচারে তাঁর সত্য রূপটি আড়াল করে রেখেছেন। মাসিকে আমার ভাল লাগল।

দুপুরে মাসির নিজের হাতের রান্না খেলুম। নিরামিষ রান্না। মাটিতে আসন পেতে খেতে দিয়েছিলেন। নিজে পাখা হাতে সামনে বসেছিলেন। বললেন: খেতে কষ্ট হবে, না?

কেন কষ্ট হবে?

আমি তো আমিষ ছুঁই নে।

বাধা দিয়ে বললুম: তাতে কষ্টের কী আছে! নিরামিষ খাবারেই যে আমি বেশি অভ্যস্ত!

মাসি কিছু আশ্চর্য হলেন আমার উত্তর শুনে। আমি তাই কৈফিয়তও দিয়ে দিলুম: শৈশবেই বাবা মারা যান। আমি তো মায়ের কাছেই মানুষ হয়েছি!

কিন্তু মনে হল যে কৈফিয়তটা তেমন জোরালো হল না। তাই আরও কিছু যোগ করে দিলুম: মাছ মাংস খাবার জন্যে মা অবশ্য জোর করতেন, নিজের হাতে রাঁধতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমি বড় জেদী ছিলুম। যা মা খাবেন না তা আমিও খাব না, এমনি আমার প্রতিজ্ঞা ছিল।

আর দুটি ভাত দিই গোপাল?

ভাত?

অনেক দিন এমন করে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। পেটে জায়গা ছিল না, তবু না বলতে পারলুম না। বললুম: পেট তো ভরে গিয়েছে মাসিমা!

ওই কটি খেয়ে কারও পেট ভরে?

মাসি বিশ্বাস করলেন না। আরও কিছু ভাত এনে পাতে

দিয়ে বললেন : দই দিয়ে মেখে খাও।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার বুকের ভিতর থেকে কান্নার মতো তীব্র একটা বেদনা ঠেলে উঠল। আমার মনে পড়ল অনেক দিন আগের কথা। কলকাতায় থেকে তখন কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলুম। খাবার পাতে দই দিতে মা ভুলে গিয়েছিলেন। বাড়িতে পাতা দই। পেট ভরে গিয়েছিল বলে আমি সে দিন দই খেতে চাই নি। মা কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ আর কোনও কথা না বলে দই দিয়ে মেখে ভাত কটি খেয়ে ফেললুম। এক রকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখলুম মাসির দু চোখে।

স্বাতি বলল : বেশ লোক তুমি গোপালদা! যত ভাবছ তার কিছুই বলছ না, আর কাজের কথাটি বেশ সন্তর্পণে এড়িয়ে যাচ্ছ।

তার প্রথম অভিযোগটা মানি। ভাবলেই কি সব কথা মনে পড়ে, না মনে পড়লেই সব কথা বলা যায়! স্বাতি ধরেছে ঠিকই। ভাবলুম অনেক কথাই, কিন্তু ছেঁটেকেটে কমিয়ে যা বললুম, তা কতকটা প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ছোট ছোট কাটা কাটা কথা।

তার দ্বিতীয় অভিযোগটাও হয়তো সত্য। তবু প্রশ্ন করলুম : কাজের কথা কাকে বলছ?

মামী বললেন : ঠিকই বলছে স্বাতি। আমাদের ভাবনা তোমার জন্যে। তোমার নিজের সম্বন্ধে কী খবর সংগ্রহ করলে, সেইটেই এখনও বল নি।

স্বাতি বলল : আরও একটা সত্য গোপালদা এড়িয়ে গেছে। বড় মাসি বৃন্দাবনে থাকেন, কিন্তু কেন থাকেন তা বলে নি।

ভাল করে না জেনে কোন কিছু বলার স্বভাব আমার নয়, তাই বলি নি। মাসি তো আমার মতো বাচাল নন যে গায়ে পড়ে গল্প শোনাবেন আমাকে।

বিশ্বাস হল না। প্রয়োজনীয় খবর তুমি জেনে নাও নি, এ কথা মানতে আমি রাজী নই।

তার মাথা ঝাঁকানো দেখে আমিও হাসলুম।

আর এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে বলল: এই নাও, এই চা খেতে খেতেই বাকিটা বলে ফেল।

পেয়ালাটি নেবার সময় আমি তাকে ঠাট্টা করলুম: ঘুষ দিচ্ছ?

সত্যিই, এলাহাবাদ থেকে মাসি কেন পালিয়ে এলেন তা বুঝতে পারি নি। জটিল কিছু সন্দেহ করার মতো কোন দুর্ঘটনারও ইঙ্গিত পাই নি। জিজ্ঞাসা করেছিলুম: কবে এলাহাবাদ ফিরবেন?

এলাহাবাদ?

মাসি হেসেছিলেন। বড় মিষ্টি হাসি। মনে হয়েছিল যে আমার দুরভিসন্ধি বুঝি ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে। কিন্তু সতর্ক ভাবে সেই সন্দেহ তিনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন: এলাহাবাদের কাজ তো আমার ফুরিয়ে গেছে গোপাল। কৃষ্ণ নাম করে এখানে বেশ আছি।

তবু আমি হাল ছাড়ি নি। বলেছিলুম: একা একা কত দিন আর থাকবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মাসি আবার হেসে বললেন: এখানে তো এক মুহূর্তও একা মনে হয় না বাবা। কৃষ্ণ যে সারা দিন আমাদের কাছে কাছেই আছেন।

মাসির বুকের ভিতর থেকে কোনও দীর্ঘশ্বাস উঠল কিনা তার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারলুম না। নতুন কোন প্রশ্নও হঠাৎ খুঁজে পেলুম না।

মামা এত ক্ষণ কোন কথাই বলেন নি। চা শেষ করে গভীর মনোযোগে ধোঁয়া গিলছিলেন। এবারে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন: হরিপদর কথা কিছু জিজ্ঞেস কর নি?

আমার লজ্জা করেছিল সে কথা জিজ্ঞেস করতে। অভদ্রতাও হত। বুদ্ধিমতী মাসি স্পষ্টই বুঝতে পারতেন যে কর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার শুধু আলোচনাই হয় নি, তার বেশি কিছু হয়েছে।

কর্তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার আগে তাঁর সন্দেহের উত্তরাধিকার পেয়েছি। সত্যি কথা বললে মামা অসন্তুষ্ট হবেন, তাই উত্তরটা দিলুম সাবধানে। বললুম : তার অবকাশ পাই নি।

হুঁ।

বলে মামা তাঁর পাইপ টেনে নিলেন মুখে।

স্বাতি রাগ করল, বলল : কয়েকটা দিন ধরে যত বাজে কাজ করলে আর বাজে কথা কইলে। শুধু কাজের কথাটি জিজ্ঞেস করবারই সময় হল না।

হেসে বললুম : ওটাও তো বাজে কথা।

কিন্তু মুখে না বললেও মাসির গভীর দুঃখ আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি। কয়েকটা দিন আমাকে নিয়ে যে ভাবে মেতে রইলেন, তার মানে কি আমি বুঝি না! কিছুতেই আমায় ছেড়ে দিতে চাইছিলেন না। যাবার দিনও হাত ধরে বলেছিলেন, আর কটা দিন থেকে যাও। বলেছিলেন, কবে এলাহাবাদ ফিরব জিজ্ঞেস করছিলে না? ফিরব না কেন? এলাহাবাদে পৌঁছে খবর দিও, আমি ফিরে যাব। বলে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকিয়েছিলেন; মাসিকে আমি কাঁদতে দেখি নি।

স্বাতি আমার কথার উত্তর দিল, বলল : কোন্‌টা বাজে কথা, আর কোন্‌টা কাজের কথা, সেটা তুমি আমাদের বুঝিও না গোপালদা।

মামী বললেন : নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই।

ছেলেখেলা আমিই করছি বটে! মামা কি আমায় ছেলেখেলা করতে ডেকে পাঠিয়েছেন! এ অভিযোগের উত্তর আমি দিলুম না।

কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল যমুনার শীর্ণ কায়া। বিস্তীর্ণ বালুতটের ভিতর দিয়ে নীল ধারা ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। নীল জল এই কালিন্দী যমুনার। পথ চলতে খানিকটা অসতর্ক হলেই ঐ নীল ধারা বইবে আমার জীবনের উপর দিয়ে।

দিল্লীতে মামার বৈঠকখানায় বসে আমি যমুনার ভয়ংকর রূপ প্রত্যক্ষ করলুম।—যমুনা তো গঙ্গা নয় যে সারা জীবন পাপ কাজ করে মরণকালে গঙ্গাযাত্রা করলেই সশরীরে স্বর্গলাভ হবে। যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা আর যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে মূর্খ জ্ঞানশংকর।

তাইতেই আজ সবাই আমাকে সাবধান করছেন। নিজের জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করতে নেই।

ছেলেখেলা আমি করছি, না আর কেউ!

কিন্তু মাসির সঙ্গে যমুনার ঘাটে বসে তার অন্য রূপ দেখেছি। কত রূপে কত বার। রূপ দেখে চোখ ভরে নি, মনও ভরে নি। ভালবেসেছি যমুনাকে।

যমুনার নামে সেদিনও আমার যমের কথা মনে পড়েছিল। সে তার অন্য রূপ, দাক্ষিণ্যে ভরা কল্যাণী রূপ। কার্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়ায় যম এসেছিলেন ভগিনী যমুনার কাছে। যমুনা তাঁকে অনেক যত্নে খাইয়েছিলেন। পরিতৃপ্ত ভাই যাবার সময় বর দিয়ে গেলেন, তোমার এই কীর্তি অক্ষয় হোক। আজকের এই তিথির নাম হবে যম দ্বিতীয়া। এই তিথিতে তোমার বুকে স্নান করে ভাইদের মুক্তি হবে, আমার রাজত্বে তাদের আসতে হবে না।

এ গল্প লোকে আজও ভোলে নি। অসংখ্য লোক এই তিথিতে যমুনায় স্নান করে। বাঙলা দেশে যমুনা নেই, তাই লোকে যম দ্বিতীয়ায় যমুনার জলে স্নান করে না। কিন্তু এই তিথিকে স্মরণ করে পরম নিষ্ঠায়, বলে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। আবাল বৃদ্ধ সবাই যায় বোনের কাছে। বোনেরা সযত্নে খওয়ায়, যম ও যমুনার কাছে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করে। ভাই-বোনের কাছে যমুনা বড়ই প্রিয়, যমুনাকে আমরা আদরে স্মরণ করি।

পুরাকালে মথুরায় অনার্য অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা এসেছে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে, পঞ্চনদ থেকে মথুরার দিকে বিস্তৃত হয়েছে এক হাজার বছর ধরে। দুশো বছরে এই যমুনার অববাহিকা আর্য সভ্যতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ ঐতিহাসিক সত্য, পৌরাণিক নয়। রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে আমরা মধু-দৈত্যকে দেখি মথুরার অধিপতি। তপস্যা করে শিবের কাছে এক শূল পেয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। সেই শূল সে তার পুত্র লবণকে দিয়েছিল। লবণের

অত্যাচারের কথা পৌঁছল রামের কানে। রাম শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিলেন লবণ দমনে। লবণকে হত্যা করে শত্রুঘ্ন মথুরা অধিকার করেছিলেন। সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রেতায়।

দ্বাপরে মথুরা উগ্রসেনের অধিকারে দেখি। কংস তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র। কন্যা রোহিণী ও দেবকীর বিবাহ হয়েছিল বসুদেবের সঙ্গে। দুর্বৃত্ত কংস তাঁর শ্বশুর জরাসন্ধের সাহায্যে উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে মথুরার সিংহাসনে বসেছিলেন। দেবকীর বিবাহের সময় দৈববাণী হয়েছিল। কংস জেনেছিলেন যে তাঁর ভগিনী দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। কংস আর অপেক্ষা করেন নি। দেবকী ও বসুদেবকে তখনই কারাগারে রুদ্ধ করেন। তাঁদের ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরেই হত্যা করেন। অলৌকিক ভাবে সপ্তম সন্তান বলরাম রোহিণীর কোলে জন্মান। কৃষ্ণ তাঁদের অষ্টম সন্তান। গভীর দুর্যোগময় রাত্রিতে বসুদেব এই শিশুটিকে নিয়ে গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে পৌঁছে তাঁদের সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে এলেন কারা-গারে। কংস এই কন্যাকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তাকে পাথরে আছড়ে মারবার কথা ছিল। কিন্তু সেই কন্যা যোগনিদ্রা অলৌকিক ভাবে আকাশে মিলিয়ে গেল ভবিষ্যদ্বাণী করে।

কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরাম রোহিণীর পুত্র বলে পরিচিত। কংসের ভয়ে রোহিণী এঁকেও নন্দালয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই দুটি শিশু বড় হয়ে মাতুলের অত্যাচারের কথা সবই জানলেন। কংসও শুনলেন এঁদের কথা। তারপর শক্তির পরীক্ষা। কৃষ্ণ বলরামকে হত্যার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কংস তাঁদের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। কৃষ্ণকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হলেন কৃষ্ণের হাতে।

জরাসন্ধের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে কৃষ্ণের মথুরাবাস এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। জামাতা বধের প্রতিহিংসা নেবার জন্য জরাসন্ধ বারবার এসে মথুরার দরজায় হানা দিতে লাগলেন। আঠারো বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পর তিনি কালযবন নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতির

সঙ্গে এক যোগে মথুরা আক্রমণে অগ্রসর হন। কালযবনের জন্ম গার্গ্যের অংশে। মহাদেবের নিকট গার্গ্য বর পেয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র যাদবদের অজেয় হবে। কৃষ্ণ এই কথা জানতেন. কাজেই মথুরা থেকে পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি নূতন রাজধানী পত্তনের চেষ্টায় ছিলেন. এইবারে স্বজনের সঙ্গে দ্বারাবতীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মথুরা পরিত্যক্ত হল।

রণে ভঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণ পলায়ন করেন বটে, কিন্তু ফিরে এসে কৌশলে কালযবনকে হত্যা করেন। মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ একটি গুহার ভিতর ঘুমচ্ছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি বর পেয়েছিলেন যে কেউ তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করলে তাঁর চোখের আগুনে সে ধ্বংস হবে: কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কৃষ্ণ এই গুহায় প্রবেশ করে মুচকুন্দের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কালযবন চিৎকার করে যখন এই গুহায় ঢুকল, মুচকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হল এবং দেবতার বরে তাঁর চোখের আগুনে কালযবন পুড়ে মরল। এটি হরিবংশের গল্প। এই গল্পের সমর্থন শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে।

মথুরা যে এই সময় মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জরাসন্ধ বধের পর মথুরার কী দশা হয়েছিল কে জানে!

শুধু নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থে নয়, অন্য কারণেও কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। জরাসন্ধ অনেক ক্ষত্রিয় স্ত্রীপুরুষের উপর নানা রকমের নির্যাতন করেছিলেন। অনেক ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন নরমেধ যজ্ঞের জন্য। এই সব অমানুষিক আচরণ রোধের জন্যই কৃষ্ণ পরবর্তী কালে ভীম অর্জুনকে নিয়ে মগধে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের যুদ্ধের কাহিনী মহাভারতেও বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে।

ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ এসেছিলেন মথুরায়। শহরে নারীর আধিক্য দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট শিষ্য এই মথুরায় নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অশোকের গুরু উপগুপ্ত

ছিলেন এই মথুরার মানুষ। তাঁর পিতা গুপ্ত এখানে গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসা করতেন একটি সংঘারাম নির্মাণ করে উপগুপ্ত আঠারো হাজার মথুরাবাসীকে সন্ন্যাসী করেছিলেন। মথুরার বিখ্যাত নগরকন্যা বাসবদত্তাকেও তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অমর হয়ে আছে।

এরিয়ান প্লিনি ও টলেমির গ্রন্থে মথুরার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে এই নগর চির দিনই উন্নত ছিল। টলেমি মথুরাকে মদুরা বলেছেন, আর মদুরার মানে লিখেছেন পবিত্র নগর বা দেবতার নগর।

শকেরা ভারতবর্ষে আসে খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে। আমাদের পুরাণ এদের সূর্য বংশে জন্ম বলে দাবী করে। সগর রাজা তাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে দেশত্যাগী করেন। ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণের দর্শন না পেয়ে তারা ম্লেচ্ছে পরিণত হয়েছিল। শকেরা যখন আবার এদেশে ফিরে আসে তখন মথুরা তাদের পদানত হয়। প্রথম শতাব্দীতে রাজা কণিষ্কের সময় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হয়।

জৈনদের প্রাধান্য হয় কুষাণ রাজাদের সময়। এখনও কিছু কিছু জৈন নিদর্শন মথুরায় খুঁজে পাওয়া যায়।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানকার বৌদ্ধ প্রভাব দেখে খুশী হয়েছিলেন। কুড়িটি সংঘারামে তিনি তিন হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ দেখেছিলেন। কিন্তু হিউএন চাঙ এসে খুশী হতে পারেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে বৌদ্ধদের প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে। তার বদলে হিন্দুরা আবার তাদের পুরনো প্রাধান্য ফিরে পাচ্ছে। মথুরা তখন কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধনের অধীন।

একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ এসে মথুরা লুণ্ঠন করলেন। প্রথমে কনৌজ আক্রমণ করে সে রাজ্য জয় করলেন। তারপর মথুরা। মথুরায় হিন্দু মন্দিরে তখন সমৃদ্ধির অন্ত নেই। মামুদ ধাতুর বিগ্রহ মূর্তি গলিয়ে নিলেন, আর পাথরের মূর্তি ফেললেন ভেঙে। ফেরিস্তায় পাওয়া যায় যে মথুরায় তখন পাঁচটি সোনার ও অসংখ্য রূপার মূর্তি ছিল।

আর মূর্তির চোখ ছিল পদ্মরাগ মণির। এই সমস্ত মূর্তি গালানো সোনা রূপো আর মণিমাণিক্য তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুড়ি দিন ধরে ক্রমাগত লুটপাট ও আগুন জ্বালানোর পর হঠাৎ মামুদের মনে হয়েছিল যে মথুরার দেবমন্দিরগুলি বড় সুন্দর। এই কথা মনে হতেই তিনি হুকুম দিলেন, ব্যস আর নয়। এ সব মন্দির আর ধ্বংস হবে না। গজনীর শাসনকর্তাকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন ফেরিস্তায় তার উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছিলেন এখানে অসংখ্য সুন্দর সৌধ আছে। ভক্তের ভক্তির মতো সেগুলি অটল ও অচল। একটা শহরে মর্মমের মন্দির ও সৌধ নির্মাণ করতে কম করেও দুশো বছর সময় লাগে। মথুরার ঐশ্বর্য নিয়ে সুলতান মামুদ তাঁর নিজের রাজধানী সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে।

তারপর ঔরঙ্গজেব এই মথুরার উপর শেষ আঘাত হেনেছিলেন: ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে রক্ষার জন্য বিগ্রহ নিয়ে রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দিল্লীতে স্বাতি আমার কাছে এই আলোচনা শুনতে চেয়েছিল মামারও আগ্রহ ছিল শোনবার। কিন্তু আমি বলতে পারি নি। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমাকে এ সব বলতে হয়েছিল। মামাকে আমি চিনি। ইতিহাস তাঁর ভাল লাগে না। কিছু পৌরাণিক কথা হয়তো ভাল লাগত। কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর বাবুর পারিবারিক কাহিনী শোনবার জন্য তিনি বেশি ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি এই কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে করেছিলাম।

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: মথুরায় তুমি কি কিছুই দেখ নি? দেখেছি সামান্য, কিন্তু শুনেছি অনেক কিছু।

স্বাতির কৌতূহল দেখে বলেছিলুম: লোকে বলে, হিন্দুদের তীর্থ-স্থানের ওপরে বৌদ্ধেরা তাদের কীর্তি স্থাপন করে। আবার হিন্দুরা ক্ষমতা পেয়ে বৌদ্ধদের কীর্তির ওপরেই নিজেদের তীর্থ নতুন করে গড়েন। যেমন কেশব দেবের মন্দির হয়েছে যশবিহারের ওপর। এই মন্দির একবার গজনীর মামুদ ধ্বংস করেন, তারপর সিকন্দর লোদী।

ঔরঙ্গজেব তৃতীয় বার ধ্বংস করবার পর আবার মন্দিরটি নতুন করে গড়া হয়েছে।

এ মন্দির দেখেছ ?

না। দেখেছি মাত্র একটি মন্দির, তার নাম দ্বারকাধীশের মন্দির। এই মন্দিরটিই নাকি মথুরার সব চেয়ে বড় মন্দির। পূজা করেন বল্লভ সম্প্রদায়।

মামা বললেন ঃ এই সম্প্রদায়ের কথা তুমি দক্ষিণ ভারতে কিছু বলেছ।

বললুম ঃ বল্লভের পুষ্টিমার্গ এইখান থেকেই ছড়িয়েছে রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে। শরীরকে কষ্ট না দিয়ে যে সাধনা, তারই ভক্ত বেশি।

মথুরায় বৈষ্ণব প্রভাব সংহত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। বৃন্দাবনে রামানুজ সম্প্রদায়, মথুরায় নিম্বার্ক। বাঙ্গালী বৈষ্ণব রাধা বল্লভী ও হরিদাস স্বামীর শিষ্যরাও এ অঞ্চলে আসেন। রূপ সনাতন ও জীব গোসাঁই তাঁদের মধ্যেই প্রধান।

বল্লভাচার্যের শিষ্যরা গোকুল গোসাঁই নামে পরিচিত। তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ ভট্ট যখন বারাণসীর নিকটে তীর্থবাস করছেন, তখন তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র বল্লভের জন্ম। বারাণসীতেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা এবং একজন বৈষ্ণবাচার্য হিসাবেই তিনি জীবন যাপন করে গেছেন। তিনি বালকৃষ্ণের উপাসনা করেছেন এবং নিজের ধর্মকে একটি শ্লোকে বলে গিয়েছেন ঃ

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতং
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
মন্ত্রোঽপ্যেকস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যে নাম গেয়েছেন সেই ভগবদ্গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, কৃষ্ণই একমাত্র দেবতা, তাঁর নামই হল মন্ত্র। আর আমাদের একমাত্র কর্ম হল তাঁর সেবা।

বৃন্দাবনে মাসিমার কাছে শুনেছিলুম যে বল্লভাচার্যের এই ধর্ম সেখানকার লোক অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তবে সবাই তাঁর মতো বালকৃষ্ণের ভক্ত নয়। কৃষ্ণকে ভজনা করে নানা রূপে। বিষ্ণুরও পূজা করে।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু তাঁর লীলা সাধারণ মানুষের মতো। শৈশবে দুরন্ত বালক, যৌবনে উন্মত্ত প্রেমিক। তাঁর বীরত্ব, তাঁর কূটনীতি, তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। ভারতবর্ষে কৃষ্ণের মতো চরিত্র আর একটিও নেই।

বৃন্দাবনে মাসির সঙ্গে যমুনার তীরে বসে আমি এই সব কথা ভেবেছি, আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। কৃষ্ণকে তো দেখতে পাই নি। তাই কৃষ্ণের চেয়েও যমুনাকে আমার বেশি ভাল লেগেছিল।

এই যমুনাকে ভয় করতে শিখলুম দিল্লাতে। মামা আমাকে ভয় করতে শেখালেন : বলেছিলেন, যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর। তাই তার সন্তান বাঁচে না। আমি তাঁর পোষ্যপুত্র হলে আমারও নিস্তার নেই।

মথুরা থেকে তখন ট্রেন ছাড়ছিল। এক ভাঁড় চায়ের জন্য আমি হাত বাড়িয়েছিলুম। কিন্তু মামার কথা মনে পড়তেই আমি সেই হাত গুটিয়ে নিলুম। মনে হল, এই চা বুঝি যমুনার নীল জলে তৈরি। ভয়ের মতো নীল। মৃত্যুর মতো নীল। আজ মনের মধ্যে একটি কথা চমকে উঠল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা। চা পান, না বিষ পান! মাটির ভাঁড়ে করে একটা লোক বুঝি বিষ বিতরণ করছে। দু চোখ বন্ধ করে আমি স্টেশনটা পেরিয়ে গেলুম।

চাওলা সন্ধ্যা বেলাতেই এসেছিল। তার ছোট গাড়িটাতে করে একাই এসেছিল। মামী তখন জপে বসেছেন, মামা বসে ছিলেন বাইরে বেতের চেয়ার নামিয়ে।

গোপালবাবু বাড়ি আছেন ?

চাওলা ইংরাজীতে প্রশ্ন করল মামাকে। আমি জানি, অন্ধকারে মামা তাকে চিনতে পারেন নি। তবু তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

ঘরের ভিতর স্বাতির সঙ্গে আমি গল্প করছিলুম। গাড়ির শব্দে কান গিয়েছিল সে দিকে। তাই চাওলার গলা শুনতেই বেরিয়ে এলুম। স্বাতি এল না।

চাওলা লাফিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়ালুম। করমর্দনের প্রথা বাঙলা দেশে আজ নেই। কোন দিন ছিল কিনা জানি নে। কিন্তু এদিকে আছে। এ প্রথাকে সবাই শ্রদ্ধা না করলেও অনেকে করে। চাওলা তাদের একজন।

আমার মুখে চাওলার নাম শুনে মামা চিনতে পারলেন, লজ্জিতও হলেন। বললেন : বাইরের বাতিটা জ্বেলে দাও। বুড়ো মানুষ, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাই নে।

বাধা দিয়ে চাওলা বলল : অন্ধকারই তো ভাল।

চাওলা চেয়ারে বসল। আমি বসলুম বাতি জ্বালাবার পর।

চাওলা বলল : দেখলেন তো, কতটুকু জায়গা আলো হল ! প্রায় সবটাই রইল অন্ধকার।

আমার মনে হল যে চাওলা আমাকে অন্য কথা বলল। বলল দেশের অবস্থার কথা। দিল্লীর আলো দিয়ে সারা ভারত আলোকিত

হবে না। সেই সত্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে তার কথায়। তার চরিত্রের এই দিকটা কি আমি সে দিন দেখতে পেয়েছিলুম।

আমি তার জবাব দিলুম তারই মতো করে ঃ তবু যতটুকু আলো হয়। অন্ধকার না ঘুচুক, আলোর বিজ্ঞাপন তো হল!

চাওলা খুশী হল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, বলল ঃ বিশ্বাস করবে না, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মন আমার ছটফট করছিল।

সে আমার সৌভাগ্য।

মামার বোধ হয় ভাল লাগছিল না, বললেন ঃ আমি এবারে উঠি গোপাল, তোমরা গল্প কর।

বলে চাওলাকে বললেন ঃ একটু কাজ আছে আমার।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলবার সময়েও চাওলা আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর মামা চলে গেলে একটুখানি মুচকি হাসল।

হাসলে যে?

অকারণে হাসি নি। সব জায়গাতেই দেখি, বুড়োরা এমনি করেই আমায় এড়িয়ে চলেন।

নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল ঃ আমার চেহারায় কী আছে বলতে পার?

প্রথম থেকেই চাওলাকে আমার অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গে যে আমার নতুন পরিচয়, আর প্রয়োজন যে কিছু রেখে ঢেকে কথা কইবার, সে কথা ভুলে গিয়ে, বললুম ঃ চেহারায় নয়, মনে।

বল কি!

ঠিকই বলছি।

তবে আর একটু খুলে বল।

আমি খুলেই বললুম ঃ ভেতরে কিছু জ্বালা আছে, মুখে তারই খানিকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চাওলা উত্তর দিল না। শুধু অনেকক্ষণ পর্যন্ত গুম হয়ে বসে রইল।

বললুম: সত্যি কথায় ভয় পেয়ে গেলে?

চাওলা এবারে হাসল। বলল: সেই জন্যেই কি তোমার কাছে ছুটে এলুম!

কেন, আমার ভেতরেও জ্বালা দেখেছ নাকি?

চাওলা উত্তর দিল: কা জানি, যারা জ্বলছে তারাই ভাল বোঝে জ্বালার কথা।

তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: চল, একটু বেড়িয়ে আসি। খোলা হাওয়ায় মন্দ লাগবে না।

আমি না উঠেই তার জবাব দিলুম: কিছু খাবে না? চা কিংবা কফি?

রামখেলাওনকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। ট্রেতে করে কিছু আনছিল আমাদের জন্য।

চাওলা বসে পড়ে বলল: ও সবে অভ্যেস নেই, আপত্তিও কিছু নেই।

আমি হেসে বললুম: চা কফি চলে না, এমন মহাপুরুষের নাম আমি নোট বুকে লিখে রাখি। তোমার নামটাও টুকতে হবে দেখছি।

ভুলে যাচ্ছ যে আমরা পাঞ্জাবের লোক। জন্মে অবধি মাঠ্‌ঠা খেয়ে মানুষ। চায়ের আস্বাদ পেয়েছি দিল্লী এসে।

চায়ের সরঞ্জাম রামখেলাওন টেবিলের ওপর রেখেছিল। চাওলা নিজেই হাত লাগাল। পটের ভিতর খানিকটা চিনি ফেলে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল: মাঠ্‌ঠা জানো?

আমি জানি না স্বীকার করলুম। তবে দুধের কিছু যে হবে তাতে সন্দেহ ছিল না।

চাওলা বলল: আমাদের সমস্ত গৃহস্থ ঘরে গরু মোষ আছে।

রাতের দুধটা আমরা জমিয়ে দিই। সকালে মেয়েরা দই থেকে মাখন তুলে নেয়। যা পড়ে থাকে, তাকেই মাঠো বলি। তোমাদের ঘোলের সরবতের মতো আমরা গেলাস ভরে খাই, রায়তা বানাই।

এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে বলল: রায়তা বোঝ?

আমার উত্তরের আগেই হেসে বলল: কলকাতার মানুষ নিয়ে কী বিপদেই পড়া গেছে!

আমি কলকাতার মানুষ কে বলল?

মুচকি হেসে চাওলা বলল: অত তাড়া কিসের? সময় হলে সবই বলব।

চাওলাকে আমার ভাল লাগল। খানিকক্ষণ আলাপ করেই মনে হল, তার মনের ভিতরটা যেন দর্পণের মতো দেখতে পাচ্ছি। অত্যন্ত সরল নির্ভীক স্পষ্টবাদী লোক। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল: কোন হোটেলে বসবে?

ও সব আবহাওয়া আমার ভাল লাগে না।

সত্যি বলছ?

মিথ্যে কেন বলব?

নয়া দিল্লীতে থাক, অথচ হোটেল ক্লাব ভাল লাগে না—তাই আশ্চর্য লাগছে।

একটু ভেবে বললুম: বরং রাজঘাটে চল।

ও জায়গাও আমার ভাল লাগে না।

আমি বুঝি চমকে উঠলুম। গান্ধীজীর সমাধি ভাল লাগে না, এমন লোকও দুনিয়ায় আছে! বিশ্বাস হয় না যে চাওলা সত্য বলছে।

চাওলা আমার মনের কথা ধরতে পেরেছিল, বলল: বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, এই তো!

আমি তা স্বীকার করলুম।

চাওলা বলল : রাজঘাটে গেলে আমার কী মনে হয় জান? লক্ষ লক্ষ গ্যালন পেট্রল আর হাজার হাজার মণ ফুলের নিচে মহাত্মাজী চাপা পড়ে আছেন। ঐ ভারের নিচে থেকে তাঁর মুক্তি কোন দিন হবে না।

কাগজে আমিও এ সব বিবরণ পড়ি।

চাওলা বলল : বিদেশ থেকে ভারতে কোন অতিথি এলেই আমরা তাঁদের রাজঘাটে নিয়ে যাই, ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু সেই মহাত্মা কি এই শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন? বেঁচে থাকলে কি তিনি এই অপব্যয় সমর্থন করতেন? যে দেশের মানুষ দু বেলা খেতে পায় না পেট ভরে, সেই দেশের সেই জাতির পিতা কি সন্তানকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে সম্মান নিতেন হাসি মুখে?

চাওলা খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিল, বলল : দু দিন ধরে তোমরা দিল্লী দেখছ শুনলাম। দিল্লী নয়, দিল্লীর কঙ্কাল বল, কিংবা দিল্লীর মমি। মরা মানুষকে যে ভাবে ওষুধ দিয়ে জিইয়ে রাখে, দিল্লী নামে একটা পোড়া জায়গাকেও আমরা তেমনি সাজিয়ে রেখেছি! ভারতের রাজধানী দিল্লী, কিন্তু দিল্লী দেখে কি ভারতকে চেনা যায়? তুমিই বল, বাঙলা দেশ কি কলকাতার চৌরঙ্গী, না কলকাতার চৌরঙ্গী দেখে বাঙলার খানিকটা পরিচয়ও পাওয়া যায়!

সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু চাওলা এত উত্তেজিত কেন হচ্ছে! ভদ্রতার খাতিরে তবু বললুম : তা বটে।

চাওলা বলল : গোপালবাবু, নিজের মনের ভাবকে লুকিয়ে লাভ নেই। তাতে নিজেকেই প্রতারণা করা হয়। সত্যিকার দিল্লী যদি দেখতে চাও তো এক দিন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমায় দিল্লী দেখাব।

বেশ তো!

কিন্তু তোমাকে কষ্ট করতে হবে। অন্ততঃ একটা দিন তোমাকে তাদের সঙ্গে কাটাতে হবে তাদেরই এক জন হয়ে।

কাদের সঙ্গে ?

দিল্লীর সেই আদিম অধিবাসীদের কথা আমি তোমাকে বলছি। যারা পাথর খুঁড়ে গম ফলিয়ে তোমাদের খেতে দেয় সেই গম। আর নিজেরা খায়—

চাওলা হঠাৎ থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বলল: যাদের এক ফালি জমিও নেই, দিল্লীর পথে ঘাটে তাদের তুমি দেখেছ। তারা মোট বয়, দিন মজুরি করে, আর রাতে ঘুমোয় উদার আকাশের নিচে। সেখানে তাদের জন্মের অধিকার, আইন করে তাদের এই অধিকার এখনও কেউ কেড়ে নেয় নি।

গল্পে গল্পে আমরা তখন ফতেপুরীর কাছে এসে গিয়েছিলুম। হঠাৎ তা লক্ষ্য করে চাওলা বলল: দেখ কী বদ অভ্যেস আমার, নিজের আস্তানার কাছেই এসে গিয়েছি।

তোমার বাড়ি বুঝি এইখেনে ?

বাড়ি! বাড়ি ফেলে এসেছি লায়ালপুরে। বাপ-মা গ্রামে থাকেন, খুবই কাছে, আমি আছি হোটেলে। চল তবে, আমার হোটেলেই চল।

আমার আপত্তির কোন কারণ নেই। বললুম: সেই ভাল। তোমার ঘরে বসেই গল্প হবে।

দুঃখ করে চাওলা বলল: আর উপায় কি বল! যবনের হাতে যখন পড়েছ, তখন একটা বাজে হোটেলেই আজ তোমাকে খেতে হল।

তালা খুলে চাওলা আমাকে তার ঘরে আনল। পরিচ্ছন্ন ঘরটি, প্রযোজনের অতিরিক্ত একটিও জিনিস নেই। প্রসন্ন মন নিয়ে দু জনেই বসলুম।

চাওলাই প্রথমে কথা কইল, বলল: তোমার সব খবর আমি পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?

তা আর পারব না! কিন্তু সব খবর সত্যি পেয়েছ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চাওলা বলল: আমারও যে নেই, তা নয়। কেন না নয়া দিল্লীর সোসাইটিতে সত্য কথা মুখে মুখে এমন বিকৃত হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত বলতেও লোকের সঙ্কোচ হয়। এই ধর না, আমার কথা। কেউ বলে, আমার লাখ নয় কোটি টাকার কারবার, থাকি এমন নেংটে সেজে। আবার আর এক দল বলে যে সবটুকুই আমার চাল, আসলে সব গড়ের মাঠ।

বলে নির্মল আনন্দে সে হাসতে লাগল।

বললুম: আমার সম্বন্ধে কী শুনে এলে?

তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি! এত কথা শোনবার পরও ভয় পাচ্ছ না!

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

চাওলা বলল: জুনিয়ার ব্যানার্জি ছেলেটা তেমন চালিয়াৎ নয়, একটু সরল সোজা প্রকৃতির মানুষ। তাই নিজের সোসাইটির মেয়েরা তাকে আড়ালে হাবা বলে। তোমার খাঁটি পরিচয়টা এরই কাছে পেয়ে গেলুম।

তা শোনবার জন্য আমি চাওলার মুখের দিকে তাকালুম।

চাওলা বলল: রাণা বলছিল, তুমি নিজের মুখে তোমার যে পরিচয় দিয়েছ, সে নাকি স্‌প্লেন্‌ডিড্‌।

তাই নাকি!

চাওলা বলল: তোমার সম্পত্তির মধ্যে নাকি একখানা ভাড়াটে ঘর, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

চাওলা হেসে আমার সামনে ঝুঁকে পড়ল, বাড়িয়ে দিল তার ডান হাতখানা। এই রীতির সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তবু হাত বাড়িয়ে দিলুম। করমর্দন করে চাওলা বলল: ব্যবসাদারদের মধ্যে আমারও

এই অবস্থা। তোমার সঙ্গে মিলেছে ভাল।

এই কি মিল নাকি? নিজের গাড়ি করে এমন সুন্দর হোটেলে এনে তুলেছ, এমন সাজপোশাক—

বলে তার দামী সুটের দিকে তাকালুম।

চাওলা প্রাণ ভরে হাসল, বলল: ওটা নিতান্তই বাইরের, ভেতরটা তোমার মতোই নেংটে। এই সুট ছেড়ে খদ্দর ধরলে খেতে পাব না।

তার পরেই বলল: তোমার সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়, কিন্তু কেন জানি না সব কথাই বলে ফেলেছি। বিশ্বাস কর, সবাইকে আমি এ সব কথা বলি না। একটু কফির অর্ডার দেওয়া যাক, কী বল?

বলে চাওলা উঠে দাঁড়াল।

আমি তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললুম: না না, কফি থাক্, তুমি তোমার গল্প বল।

গলাটা নামিয়ে চাওলা বলল: প্রেমের ব্যাপারে আমি কাঁচা ছিলুম। এক সময় সকলেই বোধহয় থাকে। তাই না?

বলে হাসতে লাগল। বলল: গল্পটা সংক্ষেপে বলি। মিস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হবার পর হঠাৎ এক দিন মনে হল, মেয়েটা আমায় ভালবাসে। মনে হতেই যা হল, নিজেকে হিরো বানিয়ে তুললুম। ঝোঁকের মাথায় একখানা গাড়িও কিনে ফেললুম। কিন্তু হলে হবে কি! ঝানু আই-সি-এস আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঝপ করে এক দিন পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় জরুরি দরকার, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধার কর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পারতুম না, কিন্তু পিছিয়ে এলুম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব! পরে জানতে পেরেছিলুম, বুড়ো আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন অমনি করে।

হাসতে হাসতে চাওলা যোগ করল : বুড়োর ধারণা, পয়সাওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা বার করবেই, আর ধার কর্জ করে দিলে প্রেমটা খাঁটি বুঝবে।

তার কথার ধরনে আমিও হাসলুম। বললুম : কিন্তু মেয়ে কী বলে ?

মেয়ে !

চাওলা চমকে উঠে বলল : সে মোটেই তার ভাইয়ের মতো নয়। ও মেয়ের মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। তবে বিয়ে করতে রাজী হলে বুঝতুম, খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যে বলবে না।

চাওলার দু চোখে যেন শ্রদ্ধার আভাস দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গটা আমি পালটে নিয়ে বললুম : আমার সম্বন্ধে আর কী শুনলে সেখানে ?

নিজেকে সামলে নিতে চাওলার সময় লাগল না, হেসে বলল : দু দিন পরে তুমি কোটিপতি হবে, অর্ধেক রাজত্ব আর—

রাজকন্যা ?

রাজকন্যা নিয়ে তো রাজা বসেই আছেন, রাজকন্যার মত হলেই হল।

তাই নাকি !

সে কি, তুমি জান না বুঝি ? রাজা যে নিজেই তাঁর রাজকন্যা পাঠিয়েছিলেন তোমার কাছে। মেয়ের মত পেলেই তিনি প্রস্তাব করবেন।

মনে হল, এই সন্দেহ ছিল মামা মামীর মনে, হয়তো স্বাতির মনেও। কিন্তু চাওলার মতো মন খুলে বলতে কেউই সাহস করেন নি। আমি চুপ করে রইলুম।

১৬

সেই মেয়েটির সঙ্গে যে আবার আমার দেখা হবে, তা ভাবতে পারি নি। এক জন দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে সে এসে চাওলার ঘরে ঢুকল। দম দেওয়া পুতুলের মতো চাওলা লাফিয়ে উঠে বলল ঃ হ্যালো, মিস্টার বাত্রা। ইউ আর রিয়েলি প্রেশাস।

মেয়েটি বলল ঃ আর আমি বুঝি ফেল্‌না।

চাওলা পরম কৌতুকে বলল ঃ উঃ কী জেলাস! তোমাকে প্রেশাস বললে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে বীণা।

দিল্লীর দুর্গের ভিতরে এই মেয়েটিকেই আমি দেখেছিলুম। কিন্তু সেদিন ভাল করে পরিচয় হয় নি। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। আমার দিকে তাকিয়ে চাওলা বলল ঃ ঝগড়ার আগে এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

বীণার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে সে আমাকে স্মরণ করবার চেষ্টা করছে।

চাওলা বলল ঃ ঠিক চিনেছ। সেদিন ফোর্টের ভেতর পরিচয় হয়েছিল। গোপালবাবু মিস্টার গোস্বামীর ভাগনে।

মিস্টার গোস্বামীকে এরা চেনে না বলে যোগ করল, বলল ঃ সিনিয়ার ব্যানার্জির বন্ধু হলেন মিস্টার গোস্বামী।

বীণা জিজ্ঞাসা করল ঃ মিত্রার বাবার কথা বলছ?

চাওলা বলল ঃ হ্যাঁ। দিল্লীতে ইনি নতুন এসেছেন।

বলে আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম ঃ আমি এঁদের চিনে ফেলেছি।

কিন্তু আমার সঙ্গে এঁদের সম্পর্কটা তুমি জান না। বীণা

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বোন। ঠিক নিজের বোনেরই মতো। আর ইনি আমার ভগিনীপতি। চেহারা দেখে কি মনে হয়? কবি, না আর্মির লোক?

আর্মির লোক হতে কবির বাধা নেই।

বল কি!

বাঙলা দেশের ইতিহাসে নজির আছে। কবি নজরুল ইসলাম শুনেছি গোলাগুলি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

চাওলা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: তোমাকে বলিহারি দিই। মিস্টার বাত্রা আর্মির অফিসার হয়েও কবিতা লেখেন বলে আমরা আশ্চর্য হই।

আমি কেরানী হয়েও যদি নাচতে পারতুম, তুমি আশ্চর্য হতে।

কী সাংঘাতিক!

চাওলা একেবারে চিৎকার করে বলে উঠল: তুমি যে বীণার কথাও জান দেখছি!

আমি কিছু না জেনেই বলেছিলুম। তাই নিজেও বেশ আশ্চর্য হলুম। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করলুম না।

চাওলা বলল: বীণা চণ্ডীগড়ে চাকরি করছে, আর—

বাধা দিয়ে বীণা বলল: আর কিছু নয়, নাচ আমি ভুলে গিয়েছি।

চাওলার সঙ্গে আমি তার খাটের উপর বসলুম, আর বীণারা বসল চেয়ারে। তারপরে আমি বললুম: ভয় নেই, এখানে আমি আপনাকে নাচতে বলব না। যদি অনুমতি করেন তবে নাচ গানের সম্বন্ধে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

চাওলা হঠাৎ তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং এক মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলল: এইবারে তোমার প্রশ্ন কর।

মানুষকে নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করা আমাদের চিরকালের অভ্যাস। খানিকটা সঙ্কোচ হয়, দ্বিধা আসে খানিকটা। তারপরে

ভিতরের তাগিদে সহজ হবার চেষ্টা করি। এই সদ্যপরিচিত নূতন মানুষকে কী ভাবে প্রশ্ন করব ভেবে পাচ্ছিলুম না। চাওলা আমাকে তাড়া দিয়ে বলল : এমন ইতস্তত করছ কেন! বলেছি তো বীণা আমার নিজের বোনের মতো, তোমারও বোন মনে করতে পার।

হেসে বললুম : দ্বিধা সেজন্যে নয়, ভাবছি কী জিজ্ঞেস করব। এ অঞ্চলের নাচ গান সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা।

চাওলা বলল : নাচ গান যদি শিখতে না চাও, তবে আমিই তোমাকে প্রথম পাঠ দিতে পারি।

বীণা হাসল তার কথা শুনে।

হাসছ কেন, আমাকে কি একেবারেই আনাড়ি ভাব!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল : গান সম্বন্ধে তুমি যা জান, তার বেশি আর কোন কথা নেই। মিঞা তানসেনের দেশ দিল্লীতে মার্গ সঙ্গীত হল প্রধান—মানে ধ্রুবপদ খেয়াল। গজল, কাওয়ালিও চলে। কিন্তু তোমাদের যা সম্পদ সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো মধুর কোন গান এদিকে প্রচলিত নেই। কিন্তু নাচ আছে। লোকে বলে লক্ষ্ণৌ-এর কথক আর জয়পুরের কথক। যদি কয়েক দিন থাক এখানে, তাহলে দিল্লীর কথক তোমাকে দেখাতে পারি, কিংবা চণ্ডীগড়ের কথক।

বলে সকৌতুকে তাকাল বীণার দিকে।

মিস্টার বাত্রা বললেন : আমরা কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি।

তাহলে আজ রাতেই একটা ছোটখাট আসর বসতে পারে।

বীণা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : আপনি কিন্তু এখনও কোন প্রশ্ন করেন নি।

বললুম : বৃন্দাবনে আমি কয়েকটা দিন কাটিয়ে এসেছি। ভেবেছিলুম, কৃষ্ণলীলা কিছু দেখতে পাব, মানে নাচ গান ইত্যাদি। কিছু না দেখে সন্দেহ হচ্ছে, দেখবার মতো আদৌ কিছু আছে কিনা।

বীণা বলল : আছে বৈকি। ব্রজভূমির নাচ হল রাসলীলা, কৃষ্ণের

কৈশোর ও যৌবনের নাচ, রাধার সঙ্গে প্রেম ও গোপাদের সঙ্গে লীলা এই নাচের বিষয়। পায়ের কাজ কথকেরই মতো, কিন্তু স্টাইল অনেক

বললুম: নাচের কথা আমি কোথাও শুনি নি।

বীণা বলল: হোলির সময় হলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতেন। সে সময় ব্রজের মেয়েরা যত রঙ খেলে, তার চেয়ে বেশি করে নাচ গান।

বীণা থামতেই চাওলা বলে উঠল: নৌটঙ্কির বিষয় কিছু বল।

নৌটঙ্কি এখন আর ভদ্রলোকের জিনিস নয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: আপনি শুনেছেন?

বললুম: শুনি নি।

নৌটঙ্কি যখন নৃত্য নাটক ছিল, আর গান গেয়ে পুরাণের গল্প কিংবা বীরত্বের কাহিনী শোনাত, তখন একটা ইজ্জত ছিল। এখন পুরনো দিনের শুধু নাগারাটাই আছে, গানের সঙ্গে টন টন করে বাজে। তারই সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা ঢুকেছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে এখন আর নৌটঙ্কি দেখবেন না, নৌটঙ্কি শুনতে এখন আপনাকে বস্তিতে যেতে হবে।

হোটেলের বেয়ারা এই সময় কয়েক গ্লাস সরবত নিয়ে এল। চাওলা একটা গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: লস্যি খাও।

আমি দেখলুম ঘোলের সরবত। খেয়ে তফাতটা বুঝতে পারলুম। ঘোলের মতো রুগীর পথ্য নয়, দইএরই বেশ সুস্বাদু সরবত। আইস-ক্রীমের সঙ্গে কুলফির যেমন তফাত, এও কতকটা তেমনি।

বীণাও একটা গ্লাস হাতে নিয়ে বলল: দিল্লীতে মানুষ হয়ে এই হয়েছে যে না শিখলাম পাঞ্জাবী নাচ, না উত্তর প্রদেশের। পাঞ্জাবের সঙ্গে তো সম্বন্ধ এক রকম ঘুচেই গেছে।

কেন?

যে পাঞ্জাবে আছি, সে তো আমাদের দেশ নয়। নিজের দেশ

ছেড়েছি এত শৈশবে যে কিছুই মনে পড়ে না।

বীণা খেই হারিয়ে ফেলছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম: কাজরী কি আপনাদের নাচ?

উত্তর প্রদেশের বর্ষায় কাজরী, আর ঝুলা গান। আরও আছে ঘুঙ্গুর পরা আহিরদের নাচ, আর কাহারদের কাহারবা। জোড়ায় জোড়ায় নাচে ছাপেলি। সাধারণতঃ এ সব নিচু জাতের নাচ, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

চাওলা আমাকে কটাক্ষ করে বলল: আর কিছু জানবার আছে?

কী সম্বন্ধে?

নাচ গান, কাব্য সাহিত্য—

মিস্টার বাত্রা যে কবি তা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললুম: এঁরা তোমার কাছে বেড়াতে এসেছেন। আমি এঁদের বিরক্ত করলে অভদ্রতা হবে।

মিস্টার বাত্রা বললেন: অভদ্রতা কিছুতেই হবে না। তবে আমি সম্বন্ধেই আমি বেশি ওয়াকিবহাল।

বললুম: ও সবে আমার রুচি নেই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন তো মনোযোগ দিয়ে শুনি।

মিস্টার বাত্রা বললেন: পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি কোন খাঁটি পাঞ্জাবীকে ধরবেন। আমি উর্দুতে কিছু কবিতা লিখে বদনাম কিনেছি, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলতে পারি।

তাহলে আরও ভাল হয়।

কেন?

দেশে আজকাল হিন্দী হিন্দুস্থানী আর উর্দু নিয়ে মহা গোলমাল বেধেছে। আমরা এই তিনটে ভাষার খেই হারিয়ে ফেলছি।

মিস্টার বাত্রা কথাটা মেনে নিয়ে বললেন: একটা সোজা জিনিস মনে রাখবেন। হিন্দী এসেছে সংস্কৃত থেকে। আর উর্দু বোধ হয় আরবী ফার্সী থেকে। হিন্দী আর উর্দু মিলিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা।

একটু থেমে বললেন: সরোজিনী নাইডু নাকি বলেছেন, উর্দুর মা হিন্দী বাবা ফার্সী, অর্থাৎ সোজা কথায় উর্দু হল মুসলমানী হিন্দী। এ ভাষার প্রথম কবি কে, তা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। কেউ বলেন আমীর খসরু, কেউ বলেন কবীর, আবার কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের মুহম্মদ ওয়ালা। খসরু তাঁর ফার্সী কবিতায় হিন্দী শব্দ ব্যবহার করতেন, আর কবীর তাঁর হিন্দী কবিতায় আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতেন। সমালোচকদের মতে দুজনের একজনও খাঁটি উর্দু কবি নন। যাই হোক উর্দু ভাষার জন্ম এই সময়ে হলেও উর্দু সাহিত্যের জন্ম হয়েছে অনেক পরে। কয়েকটি শতাব্দী বাদ দিয়ে একেবারে উনবিংশ শতাব্দীতে আসতে হয়। স্যর সৈয়দ আমেদ খান কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে আলিগড় আন্দোলন শুরু করেন। প্রধানত তাঁরা গদ্য লেখক ছিলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তা বোধ। এর আগের শতাব্দীতে যে কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের নাম আপনি মনে রাখতে পারবেন না। মীর্জা জান-ই-জানান মুহম্মদ রফি সওদা মীর দর্দ মীর তাকি মীর—এ সব নাম সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য দরকার। আপনি মনে রাখুন গালিবের নাম। গালিব উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। সৌন্দর্যবাদী গজলের কবি গালিব পত্রসাহিত্যেরও স্রষ্টা। হায়দ্রাবাদের মীর্জা দাঘ হালীর মতো সম্মানের অধিকারী হন নি। প্রথম যুগে হালী যখন মানুষকে ভালবাসতেন, তখনকার কবিতা আমার ভাল লাগত তিনি বলেছিলেন,

এহি হ্যায় ইবাদৎ এহি হ্যায় ইমান
কে কার আবে দুনিয়ামে ইনসান কো ইনসান।

মানুষ মানুষের কাজে লাগবে,—এই তো হল ধর্ম। এরই নাম ভগবানের আরাধনা। তার পরেই স্যর সৈয়দের সংস্পর্শে এসে হালীর জাতীয়তা বোধ এল, এল সাম্প্রদায়িকতা। সে সব কবিতা আমার ভাল লাগে না। হালী গদ্যে জীবনী রচনা করেছেন, আর প্রবর্তন করেছেন সমালোচনা সাহিত্যের।

মিস্টার বাত্রা এঁদের নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন না। বললেন: কবি ইকবালের নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি।

বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে তাঁর লেখায় একটা সার্বজনীন আবেদন দেখা দেয়। আমরা তাঁর কবিতায় দার্শনিক মনোভাব, প্রবন্ধে রাজনীতির প্রভাব ও জীবনে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখতে পাই। এঁরই সমসাময়িক ছিলেন ব্রজনারায়ণ চকবস্ত। অকালে মৃত্যু না হলে উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধতর করে যেতেন। আনবর ইলাহাবাদীর নামও উল্লেখযোগ্য। এর পর বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর যুগে এল প্রগতি আন্দোলন। কবি ও কথাশিল্পী এসে যাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন জোশ মলিহাবাদী ও মুন্সী প্রেমচাঁদ। মলিহাবাদী এ যুগের সব চেয়ে জনপ্রিয় কবি। আগে বিপ্লবী কবি ছিলেন, এখন রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় গভীরতার চেয়ে আবেগ বেশি। সিনেমার গান লিখে তিনি আরও জনপ্রিয় হয়েছেন। এর সঙ্গে আরও অনেক কবি আছেন, তাঁদের কথা বলতে হলে আজ এই ঘরেই রাত কেটে যাবে।

চাওলা বীণার দিকে চেয়ে বলল: তোমাদের আপত্তি না হলে গোপালবাবুর আপত্তি হবে না জানি।

বীণা যেন চমকে উঠে বলল: আমাদের আজ ফিরতে দেবে না বুঝি?

আমি হেসে বললুম: ভয় পাবেন না, আমাকেও ফিরতে হবে।

মিস্টার বাত্রা বললেন: কথা সাহিত্যের গল্পটা আপনাকে সংক্ষেপে বলছি। মুন্সী প্রেমচাঁদ উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের এত বড় দিকপাল যে তাঁর আগের ও পরের লেখকেরা সবাই ম্লান হয়ে আছেন। উপন্যাস বলতে যা বুঝি তা গত শতাব্দীর শেষ দিকে নাজির আহমদ কিছু লেখেন। হালিম সরুর ও রতন সারসারেরও নাম কিছু আছে। তারপরেই প্রেমচাঁদ এই শতাব্দীর প্রথম বছর

থেকেই উপন্যাস লিখেছেন। ১৯৩৬ সালে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মতও আমি শুনেছি। একটি প্রবন্ধে তিনি এই যুগের শোষক ও শোষিত সম্প্রদায়ের কথা লিখেছিলেন। অর্থ আজ মানুষের শুধু সামাজিক মর্যাদার নয়, মহত্ত্বের ও প্রতিভারও মানদণ্ড। শুধু মানুষ নয়, শিল্প ও শিল্পীও আজ অর্থের পায়ে মাথা বিকিয়েছে। কিন্তু এই সভ্যতা চিরদিন বাঁচবে না। মানুষ আবার মানুষ হবে।

মিস্টার বাত্রা বললেন: প্রেমচাঁদের পর যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষণ চন্দর প্রধান। দেশে বিদেশে এঁর সমাদর। সিনেমার কল্যাণে ইনি ও আব্বাস এখন জনপ্রিয়তম। তবে নিষ্ঠাবান লেখক হিসাবে উপেন্দ্র নাথ আশ্‌ক রাজেন্দর সিং বেদীর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

বীণা বলল: সাময়িক পত্র পত্রিকায় যাঁদের লেখা পড়ি, তাঁদের কারও নামই তুমি করলে না।

মিস্টার বাত্রা বললেন: অল্প কয়েকটি নাম করলে ইনি মনে রাখতে পারবেন। নিজের বিদ্যে বুদ্ধি দেখিয়ে তো লাভ নেই।

হেসে বললুম: সত্যি কথা। কিন্তু আপনার নিজের কবিতা একটিও শোনালেন না।

মিস্টার বাত্রা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: চণ্ডীগড়ে আসুন, একটির বদলে আপনাকে আমার গোটা কবিতার খাতাটা পড়ে শোনাব।

বীণাও উঠে দাঁড়াল।

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম: আপনারা বেড়াতে এলেন, অথচ আমি আপনাদের দু জনকেই কষ্ট দিলুম।

বীণা বলল: কাল সকালে চলুন না আমাদের সঙ্গে, পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী দেখে ফিরবেন।

চাওলা হেসে বলল: গোপালবাবুর এখনও দিল্লী দেখা সম্পূর্ণ হয় নি।

নমস্কার করে তুজনে বেরিয়ে গেলেন। আমরা খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলুম।

চাওলার কাছে খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরতে আমার একটু দেরিই হল। গাড়ি চালাতে চালাতে চাওলা বলল: বীণাদের দেখলে তো, কেমন মানিয়েছে এদের।

একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলল: রূপের মোহটা সাময়িক, সত্য হল মনের মিল। ওরা তুজনেই শিল্পী, ওদের মিলন হয়েছে সার্থক।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

এক সময় চাওলা আবার বলল: তোমার বোনেরও বোধহয় একটা ব্যবস্থা হল।

কেমন?

রাণার ভাল লেগেছে। বাপের মত পাবার জন্যে বোধহয় তোমাদের ডিনারে ডাকবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এত খবর তুমি কোথায় পাও?

বললুম না, ছেলেটা চালিয়াৎ নয়, সোজা সরল প্রকৃতির মানুষ আমাদের রাণা ব্যানার্জি।

বলে মনের আনন্দে চাওলা হাসতে লাগল।

এবারে আমি তার হাসির ভিতর যেন আরও একটা নতুন সুর শুনতে পেলুম।

বাড়ি ফিরতেই স্বাতি আমায় চেপে ধরল, বলল : কোথায় গিয়েছিলে ?

মামা মামী শুনতে না পান, এমনি মৃদু স্বরে বললুম : তোমার বিয়ের ঘটকালি করতে।

স্বাতি জবাব দিল : হুঁ। ওই চাওলার সঙ্গে, না আর কারও সঙ্গে ?

কাকে পছন্দ ঠিক করে বল তো ? চাওলা, না রাণা ?

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : রাণাবাবুকে পছন্দ করলে বোধ হয় তোমার ঘটক বিদেয়টা পছন্দ মতো হয় !

বলেই মুখে কাপড় দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল।

মামী এগিয়ে এসেছিলেন, আশ্চর্য হয়ে বললেন : অমন করে হাসছিস যে ?

স্বাতি বলল : হাসব না ? আমরা বসে আছি না খেয়ে, আর গোপালদা বলছে—

সত্যিই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। চাওলার সঙ্গে তার হোটেলে খেয়ে এসেছি।

খেয়ে এসেছ ! বেশ তো। তাতে এমন কি আর অপরাধ হয়েছে !

তার পরেই বললেন : কী খেলে ? তোমাদের ঐ চাওলাই খাওয়াল তো।

এ প্রশ্ন আমার কাছে নূতন নয়। কলেজের ছুটিতে যখন বাড়ি আসতুম, তখন এই ধরণের অজস্র প্রশ্নে মা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কী খেতে দেয়, কখন খেতে দেয়, রোজই এক খাওয়া কি না। কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলে কী কী পদ হয়েছিল, কোন্‌টা

ভাল লাগল, তাতে বিশেষ কোন মশলা পড়েছিল কি না, এই সব। রাগ করলে চলবে না, বিরক্ত হবারও উপায় নেই, প্রচুর ধৈর্য নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

হেসে বললুম : সে পাঞ্জাবী খাওয়া, শুনতেও আপনার ভাল লাগবে না।

আপত্তি করে মামী বললেন : পাঞ্জাবীরা কি আর মানুষ নয়, না তারা যা খায় তা সবই অখাদ্য !

তর্ক না করে আমি বললুম : তন্দুরে সেঁকা মোটা রুটি আর দুম্বার মাংস। কাঁচা পেঁয়াজ আর ঝাল আচার ছিল তার সঙ্গে।

ঝাল খেতে পারলে তুমি ?

দিব্বি চেটে পুটে খেলুম। চপ চপ করছিল ঘি, অনেকক্ষণ ধরে হাতে সাবান ঘষতে হল।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন : বল কী ! দিল্লীর হোটেলে এখনও ঘিয়ে রান্না হচ্ছে ?

আমি সত্যি কথাই বললুম : হোটেলে ঘি আসে না। ঘি আসে চাওলার গ্রামের বাড়ি থেকে। খেতে বসে রুটিতে মাখায় আর ডালে ঢালে। বাঙ্‌লা দেশে অমন ঘি আমরা খাই নি।

মামা এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন, এবারে বললেন : পাঞ্জাবীরাই দুধ ঘি খেতে জানে। তাই চেহারাও অমন সুন্দর।

অন্য দিনের মতো আমি আমার খাট বিছিয়েছিলুম বাহিরে। মামা মামী শুয়ে পড়বার পরে স্বাতি বেরিয়ে এসে একখানা চেয়ার নামিয়ে আমার কাছেই বসল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল : একটা সত্যি কথা বলবে ?

মিথ্যে তো আমি কখনও বলি না।

একটুখানি ম্লান হাসি হাসল স্বাতি, বলল : সে কথা তোমার সত্যিই বটে।

তবে জিজ্ঞেস কর।

আমি শুয়ে পড়েছিলুম, আবার উঠে বসলুম।

স্বাতি ইতস্তত করছিল। আমি চাইলুম আকাশের দিকে। বড় অন্ধকার মনে হচ্ছে নিজের চারি ধার। আকাশে কি আজ চাঁদ নেই? কী তিথি আজ? স্বাতিকে তবু সাহস দিলুম: বল।

স্বাতি হঠাৎ সত্যি কথাই বলে ফেলল: কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

আমি তোমার প্রশ্নটা বলব?

স্বাতি চমকে উঠে বলল: তুমি পারবে বলতে?

চেষ্টা তো করতে পারি!

স্বাতি তার বড় বড় চোখ আমার চোখের উপর তুলে ধরল।

বললুম: তুমি মিত্রার কথা জানতে চাইছ।

না না, মিত্রাদির কথা কেন জানতে চাইব! তার জন্যে আমার মাথা ব্যথা কিসের?

আমি হেসে জবাব দিলুম: একটু আছে বৈকি। মেলামেশাটা বেশি করছে কি না!

স্বাতি জবাব দিল না। অন্ধকারে তার মুখের ভাবও ভাল করে দেখতে পেলুম না।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে আমি চাওলার গল্প বললুম স্বাতিকে: লোকটা এখনও বোধ হয় মিত্রাকে ভালবাসে।

তাই কি!

মেয়েটাকে এখনও শ্রদ্ধা করে বলেই এই সন্দেহ হয়েছে। মানুষ এক বার যাকে ভালবাসে, তাকে সে সহজ ভাবে দেখে না, দেখে রঙীন কাচের ভেতর দিয়ে। সেই কাচ কোন দিন ভেঙে গেলে মন তার বিষিয়ে যায়। তখন ঘৃণা করে। অত্যন্ত তীব্র সেই ঘৃণা। মিত্রাকে ঘৃণা করবার মতো কোন কারণ এখনও ঘটে নি।

মিত্রাদির দিকটা ভেবে দেখেছ?

তার সুযোগ পাই নি।

আমি পেয়েছি। তুমি যদি কেরানী না হয়ে হতে শুধু জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র, তা হলেও তোমায় নিয়ে সে ওখলা যেতে পারত চুপিচুপি পিকনিক করতে।

আমি এ কথা মানতে পারলুম না, বললুম : ও মেয়ে তেমন নয়, তোমার হিসেবের ভুল হচ্ছে।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : তুমি যে এই উত্তর দেবে আমি জানতুম।

এ কথার জবাব দেবার মতো যুক্তি আমার নেই। তাই হার স্বীকার করলুম : তুমি আমায় ভুল বুঝলে সত্যিই দুঃখ পাব।

স্বাতির দৃষ্টি কি সজল হল! আকাশভরা নক্ষত্র জ্বলছে মিটমিট করে, তাদের একটুও আলো নেই কেন! প্রয়োজনের সময় কাজেই যদি ওরা না লাগল তো সারা রাত অমন করে কেন জেগে থাকে!

খানিক ক্ষণ পরে স্বাতি আবার কথা কইল, বলল : ও কথা থাক, আর কী খবর পেলে বল।

সে খবর তোমার ভাল লাগবে কি?

তা না লাগুক, সব খবর কি আর ভাল লাগে!

আমি রাণার কথা বললুম : তোমাকে তার ভাল লেগেছে। তার বাপের মত হলেই তোমার কাছে প্রস্তাব করবে।

হুঁ।

বলে স্বাতি শুধু মাথা নাড়ল।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : এ খবর তুমি জানতে নাকি?

তেমনি গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : এ সব অনুমান করা কি আর শক্ত কাজ!

কী বলবে তুমি?

এই বারে স্বাতি হেসে বলল : সে কথাও কি তোমাকে বলতে হবে নাকি?

তার হাসি দেখে আমিও হেসে বললুম : ক্ষতি কী?

ক্ষতি আছে বৈকি।

বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি তার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিয়ে বললুম: হঠাৎ পালাচ্ছ কেন?

কিছু মাত্র চিন্তা না করে স্বাতি তখনই জবাব দিল: তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ দেখে।

আমার বিস্ময়ের যেন আর অন্ত রইল না, বললুম: আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি!

স্বাতি বলল: আমি কেন, বাবা মাও তো আজ এই কথাই বলছিলেন।

আজ বুঝি আমায় নিয়ে তোমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে?

আমাদের বোলো না, হয়েছে বাবা মার। আমি আড়াল থেকে শুনেছি।

সেই আলোচনার কথা শোনবার জন্য আমি স্বাতির আর একটু কাছে ঘনিয়ে বসলুম। স্বাতিও কাছে এল। আমি তার এই কাছে আসা দেখেই বুঝতে পারলুম যে তার কিছু বলবার ছিল। সেই কথা বলতে না পারলে সে শান্তি পাবে না। তবু আমার একটা অনুরোধের জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। বললুম: বল এই বারে।

কী ভাবে শুরু করবে বোধ হয় সে ভেবে পাচ্ছিল না। আমি তাকে সাহায্য করবার জন্যে বললুম: মামা বলছিলেন যে গোপাল ছেলেটা মন্দ নয়, কিন্তু একেবারে অকেজো। তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি জেদী না হত।

স্বাতি যেন চমকে উঠে বলল: তুমি বাবার কথা শুনেছ?

হেসে বললুম: কান দিয়ে শুনি নি, শুনেছি মন দিয়ে।

স্বাতি আমার মুখের উপর তার অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফেলল। বললুম: বলছিলেন, পোষ্যপুত্র হবার লোভ দেখিয়ে বোধ হয়

ভুলই করেছেন।

আত্মস্থ ভাবে স্বাতি বলল : মা খুবই ভয় পেয়েছেন। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা চলে না, কাজেই পোষ্যপুত্র হলে—

স্বাতি হঠাৎ থেমে গেল।

বললুম : কী হবে, বাঁচব না?

স্বাতির কণ্ঠে যেন আর্তনাদ শুনলুম : না না, ও কথা বোলো না।

কেন জানি না, আমার হাসি পেল। বললুম : আচ্ছা, বলব না।

কিন্তু স্বাতিও আর কোন কথা কইল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : তারপর?

তার পর! তার পর তো আর কিছু নেই।

আমি জানতুম, এর পরে স্বাতি আর কিছু বলবে না, বলতে পারবে না। তাই জোর করলুম না।

আমি গরিবের ছেলে, কিন্তু আমার মর্যাদা বোধ বড় লোকের চেয়ে কম নয়। মামার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যদি তাঁর ব্যবসা দেখার ভার নিতুম, তা হলে আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে মামার আপত্তি হত না। তাঁর একমাত্র কন্যাই তো সব পাবে। তার জন্য ধনী জামাইয়ের প্রয়োজন হত না।

মামা এখন অন্য কথা ভাবছেন। টাকাটাই তো সব নয়, মেয়েদের জীবনে যা সব চেয়ে বড় তা তার সিঁথির সিঁদুর। ঐটুকু রক্ষা পেলেই তার সব রক্ষা হল। জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র যে হবে, তার পরমায়ুর দায়িত্ব নেবেন না বিধাতা। মেয়ে তাঁর একটি। আর যাই করুন, সেই মেয়ের জীবন নিয়ে তিনি ছিনিমিনি কিছুতেই খেলবেন না।

স্বাতি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল : এবারে শুতে যাই।

এবারে আমি তার হাত ধরে বসাতে পারলুম না। কেমন একটা

সঙ্কোচে হাত আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল। যে কথা জানবার ইচ্ছা মনের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছিল, সে কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। সে কথা জানতে চাওয়া বুঝি যায় না। বড় অভদ্র শোনাবে, বড় নির্লজ্জ শোনাবে। তার চেয়ে সে আজ ঘুমোতে যাক। আরও তো দু এক দিন এখানে আছি, আর এক সময় প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া যাবে।

যাবার সময়েও স্বাতি এক বার পিছন ফিরে দেখল।

ডাকব কি তাকে ?

না, থাক্। আজ থাক্। আর এক দিন ডাকব।

১৮

অনেক দূরে দূরে স্টেশন। অনেক দেরিতে দেরিতে থামে। গাড়িতে বসে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবি। খটখটাং করে একটা পুল পেরোতেই আবার চমকে উঠি। যমুনার পুল নয় তো! যমুনা দেখে আর এক বার ভয় পেয়েছিলুম ওখলায়। সেই কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সকাল বেলায় মামা বেরিয়ে যাবার পর মিত্রা এসেছিল। রাণার ছোট গাড়িখানা চালিয়ে সে একাই এল। স্বাতির দিকে চেয়ে আমি একটু হাসলুম। কিন্তু স্বাতি সে হাসির জবাব দিল না। মামা বললেন: এস মা, এস।

স্বাতিকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তার শরীর ভাল নেই। তা না হলে আজ মিত্রাকে দেখে তারই সব চেয়ে বেশি আনন্দ হবার কথা। এদের সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হয়েছিল, স্বাতি আমার কাছে এমনিই কিছু প্রত্যাশা করেছিল। সে অনুরোধের কথা আমি আজও ভুলি নি।

স্বাতির সমর্থন না পেলেও আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম: স্বাতি কাল বলছিল, আপনি আসবেন।

স্বাতির দৃষ্টি কঠিন হল, কিন্তু আশ্চর্য হল মিত্রা। বলল: সে রকম কথা তো আমি তাকে বলি নি!

স্বাতি প্রতিবাদ করল না, সমর্থনও না। বলল: গোপালদা ঐ রকম। মানুষকে লজ্জায় ফেলে আনন্দ পায়।

হেসে বললুম: আজ কোথায় নিয়ে যাবেন? ওখলায়?

বিস্ময়ে মিত্রা অভিভূত হয়ে বলল: স্বাতি এ কথাও বলেছে বুঝি?

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি নিঃশব্দে তাকে রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। কিন্তু মিত্রা অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্য! তাকে বললুম না যে গাড়ির পিছনে আমি তার টিফিন বাস্কেট দেখতে পেয়েছি, আর ওখলা ছাড়া ভাল পিকনিকের জায়গা আমার জানা নেই।

আমি কিছুই বলছি না দেখে স্বাতি উত্তর দিল : সাংঘাতিক লোক। গোপালদাকে আপনি বিশ্বাস করবেন না মিত্রাদি।

লক্ষ্য করলুম যে শুধু মাত্র লজ্জা এড়াবার জন্যই স্বাতি কথা কইল। কথাগুলো সহজ হলেও বলার ধরনটা সহজ নয়। আন্তরিকতার সুর নেই তার কণ্ঠস্বরে।

মিত্রা বলল : ওখলা জায়গাটা ভাল, পিকনিকের উপযুক্ত জায়গা।

আমিও তাই শুনেছি।

বলে আড় চোখে একবার স্বাতিকে দেখবার চেষ্টা করলুম।

আপনার আজ কাজ নেই তো কোন?

আমার আর কাজ কী? দিল্লী তো আর ডালহৌসি স্কোয়ার নয়, এখানে আমি স্বাধীন মানুষ। উনিশ শো বাষট্টি সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন করব।

মুচকি হেসে মিত্রা বলল : আপনি তো চাকরি করেন!

গর্বের সুরে বললুম : ভারত সরকারের নয়। আর নির্বাচনের অধিকার সবারই আছে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে মিত্রা বলল : তা হলে চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়াতে যাব?

বলে, আমি আর একবার চাইলুম স্বাতির দিকে।

মামী বললেন : যাও না, বেলা তো বেশি হয় নি, ঘুরে এসো।

স্বাতি পাশের ঘরে সরে গিয়েছিল, তার অনুমতিটা পাওয়া গেল না। মনে হল, ইচ্ছা করেই মিত্রা তাকে ডাকল না, আর স্বাতিও ইচ্ছা করেই সরে গেল। মেয়েটা সত্যিই বড় ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ না হলে এমন অভিমান হবে কেন!

আমাদের খুব দেরি হবে না তো?

দেরি! দেরি আর কী হবে! সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরে আসব।

মামী ব্যস্ত হয়ে বললেন: সে কি, দুপুরে খাবে না তোমরা?

মিত্রা খুব সহজ ভাবেই জবাব দিল: দুপুরের খাবার আমার সঙ্গে আছে। চা-ও আছে।

মামী যে আশ্চর্য হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলুম। কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে তৈরি হয়ে আসবে—এ তাঁর ধারণার অতীত। আমি রাজী না হলে কী হত, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই মিত্রার গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বসলুম তার পাশেই, সেই আমাকে আগে উঠিয়ে দিল।

গাড়ি যখন ছেড়ে গেল, পিছনে চেয়ে দেখলুম যে স্বাতি আমাদের লক্ষ্য করছে। এক রকম অদ্ভুত আনন্দে মন আমার ভরে গেল। পথ চলতে চলতে আমি আমার আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করলুম। স্বাতিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কেন আমার মন আনন্দে ভরে গেল! এ আনন্দ কি অমানুষিক নয়?

তারপর আশ্চর্য হলুম মিত্রার প্রশ্ন শুনে: মনে হচ্ছে, বেশ একটু কৌতুক বোধ করছেন!

কৌতুক!

হঠাৎ আমি কোন জবাব দিতে পারলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, কী জবাব দেওয়া যায়।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে মিত্রা বলল: ঠিক ধরেছি তো!

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না। আমি মিথ্যা কথা

বলব না। স্বাতির কথাও না। তাই আমাকে নীরবে থাকতে দেখে মিত্রা বলল : কৌতুকেরই কথা যে!

কিন্তু কেন, সে কথা বলল না।

কিন্তু আমি বললুম : ঠিক তা নয়। আমার ভাল লাগছে।

গম্ভীর ভাবে মিত্রা বলল : এ আপনার ভদ্রতার কথা, মনের কথা নয়

প্রতিবাদ করে আমি বললুম : ভদ্রতা আমি জানি নে, মিথ্যে কথাও বলতে চাই নে।

মিত্রা খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল : আমার আচরণ যে খানিকটা কৌতুকপ্রদ হয়েছে, সে আমি নিজেই বুঝতে পারছি!

মিত্রার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম, বললুম : না না, আমি আপনার কথা মোটেই ভাবি নি। আমি ভাবছিলুম—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলুম না। কেন জানি না আমার মনে হল যে সে কথা শুনলে মিত্রা খুশী হবে না।

ও।

মিত্রাও এর বেশি কিছু বলল না। শুধু গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল আরও খানিকটা।

এবারে আমি মিত্রার কথা ভাবলুম। স্বাতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে সে দেখে নি, আমি দেখেছি। আমার ভাবনা যে তাকে ঘিরে, মিত্রা সে কথা জানে না। সে নিজের কথাই ভাবছে, ভাবছে নিজের আচরণের কথা। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। প্রথম দিন দিল্লী দেখতে বেরিয়ে মিত্রা বলেছিল, দাদার জন্যেই আজ এলুম, কিছুতেই সে ছাড়ল না। নইলে দিল্লী আমরা একশো আট বার দেখেছি। আজ দাদা নেই, রাণার অফিস আছে, তবু মিত্রা এসেছে। একাই এসেছে। এসেছে রাণার ছোট গাড়িখানা নিজে চালিয়ে। তার এই পরিবর্তনে আমি কৌতুক অনুভব করব, মিত্রা এইটেই আশঙ্কা করেছে। কিন্তু আমি তার কথা ভাবছি না জেনে তার

আরাম পাবার কথা ছিল, সে আরাম পেয়েছে কি ?

মিত্রা চুপ করে ছিল। আমার ভাবনা হল বাঁধনহারা। মিত্রা দুঃখ পেয়েছে, এ কথা ভাবতে আমার ভাল লাগল। মনে হল, সত্যি কথাটা না বললেই বোধহয় সে খুশী হত। সে আমার কাছে এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে, সারাটা দিন আমার সঙ্গে কাটাবে বলে। আমি অন্যের কথা ভাবছি বলে তার আন্তরিকতাকে অশ্রদ্ধা করেছি। তাতে আমার পৌরুষ প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে মূর্খতা, অভাব দেখিয়েছি সৌজন্যের। এত ক্ষণ পরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হল। কিছু একটা বলার প্রয়োজন মনে করে তার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম।

গাড়ি তখন দিল্লী-মথুরা রোডে এসে পড়েছে। মিত্রা গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

এই উপলক্ষ্য নিয়েই প্রশ্ন করলুম : বেশ জোরে চলেছি আমরা। ওখলা বুঝি অনেক দূরে ?

দূর! তা দূর বৈকি।

কিন্তু কত দূর তা বলল না। আমিও চুপ করে রইলুম। এক সময় আমার অপেক্ষার ভঙ্গি লক্ষ্য করে বলল : নিজাম-উদ্-দীন স্টেশন পেরিয়ে ওখলা রেল স্টেশন। বাঁয়ে মোড় নিয়ে ওখলার খাল আর সরকারী সেচ দপ্তর।

মিত্রা যে আর কিছু বলবে না, তা আমি জানি। তাই তাকে কথা বলাতে হলে আরও কিছু প্রশ্ন করার প্রয়োজন। অনেক ভেবে বললুম : 'দৃষ্টিপাতে' ওখলার উল্লেখ পেয়েছি।

হুঁ।

মিত্রা আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমি কী বলি! পাশাপাশি বসে যাব, অথচ কথা কইব না একটাও! বড় অস্বস্তি বোধ হল। বললুম : আপনি বড় স্বল্পভাষী. এতটা না হলেও ক্ষতি ছিল না।

মিত্রা হাসল আমার কথার উত্তরে। আমি হাসলুম না, বললুম: মিতভাষী হওয়া ভাল, যেমন মিতব্যয়ী। কিন্তু কথায় কৃপণ হতে নেই।

আমি কি কৃপণ?

মনের কথা মনে চেপে রাখলেই কৃপণ বলব।

এবারে উত্তর দিতে মিত্রা বিলম্ব করল না, বলল: আমি বুঝি তাই করছি?

করছেন না? কত কথাই তো আপনার বলার আছে, বলবার ইচ্ছাও আছে। অথচ কিছুই বলছেন না।

সে কি!

হিসেবে আমার হরদম ভুল হয়, কিন্তু আজকের হিসেব যে নির্ভুল, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আপনি কি অন্তর্যামী?

অন্তর্যামী না হলে কি মানুষের মন জানা যায় না? মন জানাজানির খেলায় মানুষ ছোট কিসে?

মিত্রার দৃষ্টি ছিল পথের উপরে নিবদ্ধ। চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল। উত্তর দিল না।

আমি কি ভুল বলছি?

মিত্রা এ কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল: আমরা অত শত ভাবি নে।

উত্তর শুনে আমি হাসলুম।

হাসলেন যে?

বললুম: যারা কথা কম বলে, তারা ভাবে বেশি। এই সত্য যদি মানতে হয়, তা হলে বলব যে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভেবেছেন।

মিত্রা চুপ করে রইল।

আমি বললুম: বেশি ভেবেছেন বলেই আজ এসেছেন। আর কিছু বলবেন বলেই এত দূরে আমায় টেনে আনলেন।

মিত্রা হঠাৎ গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল। সে কি থেমে পড়বে? আমি কি অপমান করলুম তাকে, না আঘাত দিলুম।

একটা মোড়ের কাছে পৌঁছেছিলুম। খচ করে একটা শব্দ তুলে বাঁ দিকের হলদে আলোর হাতটা বেরল। মিত্রা বাঁয়ে ঘুরল। সামনে ওখলা।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিত্রা জিজ্ঞেস করল: আপনার কি আসবার ইচ্ছে ছিল না?

সামনে ওখলা দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলুম। বললুম: আমার অন্য প্রশ্ন। আপনার বলবার যে কিছু কথা আছে, সেই সত্য আপনি সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

এবারে মিত্রা লুকোল না। বলল: কথায় মন দিলে যে গাড়ি যমুনায় নামবে।

যমুনার কথায় আমি ভয় পেলুম। চোখের সামনে ভেসে উঠল যমুনার শীর্ণ ধারা, বিস্তীর্ণ বালির ভিতর দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। প্রকৃতির সাদা বুকের উপর এক ফালি নীল কাপড়। বেগ নেই, গর্জন নেই। তবু ভয় পেলুম। যমুনা যে যমের ভগিনী। আর কটা দিন পরে ঐ ধারা বইবে আমার জীবনের উপর দিয়ে।

গাড়ি থামিয়ে মিত্রা হেসে উঠল। নিজে নেমে ঘুরে এসে আমার দরজা খুলে দিয়ে বলল: যমুনার নামে যে ভয় পেলেন মনে হচ্ছে।

ভয় আমি সত্যিই পেয়েছিলুম, কিন্তু তার কথার উত্তর দিলুম না।

নেমে আসতেই মিত্রা বলল: কেমন জায়গাটি বলুন তো?

ভাল করে চারি ধারটা চেয়ে দেখলুম। এমন খোলা জায়গাও আছে দিল্লীতে। এমন ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশ। ওদিকে যমুনার ধারা, এদিকে আগ্রার খাল। বাঁধের উপর দিয়ে যমুনার জল গড়িয়ে আসছে। সেখানে গামছা দিয়ে মাছ ছেঁকে তুলছে কয়েকটা দুরন্ত ছেলে। এ দিকের বাগানের ভিতর চক্রাকারে

বসেছে জন কয়েক মেয়ে পুরুষ। ভারি ভাল লাগল জায়গাটি উত্তর দিতে আমি ভুলে গেলুম।

মিত্রা বলল: কী ভাবছেন বলুন তো!

নিজেকে আমি সামলে নিয়ে বললুম: এই খাল দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে হলধর বলরামের কথা। তিনি নাকি তাঁর লাঙ্গল দিয়ে যমুনার জলকে নগরের দিকে তরঙ্গিত করেছিলেন। বিদেশের ও দেশের পণ্ডিতরা বলেন, কৃষির জন্যে এ দেশে সেই প্রথম খাল কাটা। এ দেশে কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো সেই প্রথম।

মিত্রা আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, বললুম: আমাদের ইতিহাস যমুনার প্রথম খাল কাটার গৌরব দেয় ফিরোজশাহ তুঘলুককে। হিসারে জলের জন্যে সেই খাল কাটা হয়। আকবর সেই বোঁজা খালের সংস্কার করেছেন বলে শুনেছি। শাহজাহানের ইঞ্জিনিয়ার আলি মর্দন খান দিল্লী ও রোহতকের খাল কাটেন।

একটা দীর্ঘ শ্বাসের শব্দ পেয়ে আমি মিত্রার দিকে তাকালুম। মিত্রা বলল: আশ্চর্য লোক আপনি। এমন সুন্দর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার ইতিহাস মনে পড়ছে!

আমি লজ্জা পেলুম। তবু হেসে বললুম: চরিত্র দোষ!

এবারে মিত্রাও হাসল।

আমরা একটি গাছের ছায়া বেছে নিয়ে মাটিতে বসলুম। চারি দিক ঝকঝক করছে সকালের পরিচ্ছন্ন রোদে। আরও কিছু বেলা হলে হয়তো তীব্র হবে। নাও হতে পারে। এই স্নিগ্ধ পরিবেশটি যদি মনের উপরেও তার মায়া বিস্তার করে, তা হলে আকাশের রোদে এই গাছের ছায়াটি কখনও উত্তপ্ত হবে না। মনের চেয়ে বড় আর কিছু আছে কি?

মিত্রা বলল: স্বাতিকে কেন ফেলে এলুম এ কথা এখনও জিজ্ঞেস করেন নি।

বললুম : অসৌজন্য হবে, তাই করি নি।

মিত্রা বলল : কিন্তু আমি তাকে না এনে কি অসৌজন্য প্রকাশ করি নি!

কেন?

এত দিন তো আমরা এক সঙ্গেই বেড়াচ্ছি! আর তার আসারও কোন বাধা ছিল না।

আমি কথা কইলুম না দেখে মিত্রাই আবার বলল : ইচ্ছে করেই আমি তাকে ডাকি নি।

এ কথা যে আমারও জানা, তা বলতে পারলুম না।

মিত্রা খানিক ক্ষণ আমার প্রশ্নের অপেক্ষা করল। তার পর বলল : কেন এমন করলুম, জানতে চান না?

জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই। আর—

আর কী?

অধিকারও নেই।

এ আপনার ভদ্রতা। কিন্তু আমি তো আপনার সঙ্গে ভদ্রতা করি নি, আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি আপনাকে এখানে টেনে এনেছি।

সম্মতি না থাকলে এলুম কী করে?

আপনার কৌতূহল নেই বলুন।

নেই নয়, কৌতূহল চেপে রাখবারই শিক্ষা পেয়েছি।

থাক তর্ক। আমি নিজেই আপনাকে এর কারণ বলি।

বলে মিত্রা থেমে গেল। সে কী বলবে আমি জানি না, কিন্তু মনে হল যে সত্য কথাটা সে বলতে পারছে না। হয়তো ঠিক এমন করে বলা যায় না, বলবার সময় এখনও হয় নি। তবু আমি তার মুখের দিকে চেয়ে চোখের দৃষ্টি দিয়ে মনের আগ্রহ বিস্তার করে দিলুম।

অনেকক্ষণ নারব থেকে মিত্রা বলল : আপনার পোশাকী রূপটা আমরা দেখেছি। ইচ্ছে হল, আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

আপনিই বলুন, স্বাতিকে সঙ্গে আনলে কি সে সুযোগ আমার হত।

মানি, তা হত না। কিন্তু তার প্রয়োজন কী? প্রশ্নটা মনে এলেও মুখে এল না। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মিত্রা বলল: মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে, অভিনেতার মতো সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজস্ব, সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়। আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা তৃতীয় রূপও আছে। সেটা তার একান্তে কোন এক জনের সামনে, যাকে সে—

একটা ঢোঁক গিলে বলল: ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলল: মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে, তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মতো একটা কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়। শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাত থাকে না। মানুষকে চিনতে হলে তাই তাকে একান্তে দেখতে হয়।

কিন্তু তার জন্যে যে অন্য চোখ চাই।

দূরের মেয়ে পুরুষরা হঠাৎ এক সময়ে হেসে উঠলেন।

আর মিত্রা বুঝি লজ্জা পেল।

আমি বললুম: আপনি লজ্জা পেলেন! কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি। তার জন্যে অন্য চোখ চাই, অন্য মন।

দু চোখ নামিয়ে রেখেই মিত্রা প্রশ্ন জানাল: সে আমাদের আছে কি?

ভয়ে আমি চমকে উঠলুম। মনে হল, সামনের ঐ যমুনার ধারা বুঝি এই দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতেই গ্রাস করে ফেলবে আমাকে। যমুনার হিমশীতল নীল জল।

আমার উত্তরের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মিত্রা বলল: আবার ভয় পেলেন?

ভয়! ভয় পাব কেন!

বলে আমি হাসবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমি জানি, হাসিতে আমার প্রাণ ছিল না।

মিত্রা বলল : তবে ?

বললুম : আমি অন্য কথা ভাবছি।

অন্য কথা ?

হ্যাঁ। আমি আমার নিজের জীবনের কথাই ভাবছি, নিজের আদর্শের কথা। আমি কি সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতে যাচ্ছি না ? স্বাতি আমাকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আদর্শভ্রষ্ট কেন হবেন ?

কেন হব !

আমি ভাবতে লাগলুম, আমার আদর্শের কথা মিত্রাকে বলা যায় কি না। কিন্তু সেই আদর্শের কথা আমার কাছেই কি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ! অনিশ্চয় আশঙ্কায় এখনও যে আমার পা মাটিতে পড়ে নি, আমি যে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছি।

আমার উত্তর না পেয়ে মিত্রা বলল : বুঝেছি, এখনও আপনি সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি।

ঠিক তাই কি !

আমি ভাবতে লাগলুম।

মিত্রা বলল : নানা রকমের সংস্কার আমাদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে। কুসংস্কার বলব না, ভাল সংস্কারও অনেক আছে। তা থেকেও আমরা মুক্তি পাচ্ছি নে। সমাজ আমাদের প্রতিকূল, বিশ্বাসের হাওয়াও বইছে প্রতিকূলে। দেখেও আমরা দেখছি না, শিখেও আমরা শিখছি না। সত্যিই আমরা বড়ই স্থিতিশীল।

এ আমি কী শুনছি ! নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হল না। দিল্লীর এই মেয়ে আমাকে স্থিতিশীল বলে কৃপা করবে !

বললুম : সমাজের এ অবস্থায় স্থিতিশীলতাই ভাল। প্রগতির পথ তো আমরা খুঁজে পাই নি। ভুল পথে এগিয়ে সমাজটাকে

আরও নষ্ট করে লাভ কী?

প্রগতির পথ কি আমরা খুঁজে পাই নি?

বললুম: সমাজ ব্যবস্থাকে রাতারাতি উল্টে দেওয়াকেই প্রগতি বলে না। সত্যিকার সংস্কার হয় কিছু বর্জন ও কিছু গ্রহণ দিয়ে। কতটুকু বর্জন করতে হবে আর কতটুকু গ্রহণ, আমরা সেইটে এখনও বুঝতে পারি নি।

মিত্রা এ কথার উত্তর দিল না।

সারা দিন ওখলায় কাটিয়ে আমরা যখন উঠতে যাচ্ছি, মিত্রা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: চাওলার কথা কিছু জানতে চাইলেন না?

তার কি প্রয়োজন আছে?

প্রয়োজন! আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার আছে। আপনি জানতে না চাইলেও আমি বলব।

বলে চাওলার গল্প আমাকে বলল: ওকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে মিত্রাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হল। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় আজও দেখি নি। গোড়া থেকেই এ কথা আমি অনুভব করছিলুম। এই বারে আমার সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে তা বিশ্বাস করলুম। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে, এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লাগল। বললুম: ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী?

চলতে চলতে মিত্রা বলল: তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়োনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে

আর একটা মতবাদের ভারে সে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি খানিকটা পেয়েছি। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তাই প্রতিবাদ করলুম না। ইচ্ছে হল, আমার সম্বন্ধে তার ধারণার কথা জানতে চাই। কিন্তু সাহস হল না।

গাছের ছায়া তখন সন্ধ্যার ছায়ায় মিলে গেছে। আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলুম।

গাড়ি থেকে মিত্রা নামল না। আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল।

বাড়ির চেহারা দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে, কিন্তু বাতি একটিও জ্বলছে না। শুধু ঘরের ভিতর থেকে সেতারের সুর শুনতে পেলুম। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছে।

কিন্তু মামা-মামী গেলেন কোথায়? এ সময় মামা বাহিরে বসে থাকেন, আর বাতি জ্বেলে মামী বসেন আহ্নিকে। তাঁরা কি আজ বাড়ি নেই?

ঘরের ভিতর পা বাড়াতে আমার মন সরল না। পা ঝুলিয়ে সিঁড়ির উপর বসলুম। স্বাতির সেতার শুনতে পাচ্ছি।

ভারি মিষ্টি হাত স্বাতির, কিন্তু বড় করুণ সুর। মনে হল, কিছুই যেন তার পাওয়া হয় নি। যার জন্যে অপেক্ষা করে আছে অনেক দিন অনেক রাত্রে, সে বধির, সে তার ডাক শুনতে পায় না। দেবাদিদেবের মতো সে ধ্যানে বসে আছে, সামান্য তপস্যায় কি তার ধ্যান ভঙ্গ হবে? কিন্তু প্রকৃতি এই সুর শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। স্তব্ধ হয়ে আছে চঞ্চল হরিণ, শস্য খসে পড়ছে মুখ থেকে। মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে গেছে। আমিও কি আজ হরিণের মতো গান শুনছি?

আমি যে অন্ধকারে লুকিয়ে তার বাজনা শুনেছি, স্বাতি টের পায় নি। কোন দিন টের পেত না। পরে আমিই তাকে বলেছিলুম, জিজ্ঞাসা করেছিলুম কী রাগিণী! স্বাতি উত্তরে বলেছিল তোড়ি। এক সময় বনের হরিণের মুখ থেকে মাঠের শস্য রক্ষার জন্য চাষী মেয়েরা এই রাগিণী গাইত। কিন্তু সায়াহ্নের রাগিণী এ নয়।

এমন অভিভূতের মতো কতক্ষণ আমি বসেছিলুম মনে নেই। চেতনা ফিরে পেয়েছিলুম মোটরের শব্দে। বড় একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনের রাস্তায়। নিজেকে সামলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামল রাণা। পিছনের দরজা খুলে ধরতেই মামা-মামীও নেমে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে রাণাও এল তাঁদের সঙ্গে।

অন্ধকারে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মামাই চমকালেন সব চেয়ে বেশি। বললেন: গোপাল, তুমি এখানে?

স্বাতি তখনও সেতার বাজাচ্ছে। বললুম: বাজনা শুনছি।

তবু মামা তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন: তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

বললুম: ভেতরে গেলে স্বাতি আর বাজাবে না।

কিন্তু ভিতরে যাবার দরকার হল না। তার আগেই স্বাতি থামল। দুঃখিত স্বরে রাণা বলল: নিশ্চয়ই আমাদের কোলাহল তার কানে গেছে।

আমি জানি, আমাদের কোলাহল তার কানে যায় নি। সে থেমেছে তার রাগিণী সম্পূর্ণ হয়েছে বলে।

এস এস, ভেতরে এস।

বলে মামা এগিয়ে গেলেন। আমরা গেলুম তাঁর পিছনে।

ঘরে গিয়ে স্বাতিকে দেখতে পেলুম না। সেতার রেখে দিয়ে সে পাশের ঘরে গেছে। রাণাও ক্ষুব্ধ হল। তবু বলল: চমৎকার শুনলুম। কাপড় বদলাতে মামীও পাশের ঘরে গেলেন। আমি বসলুম মামার পাশে।

মামা জানতে চাইলেন: তুমি কতক্ষণ ফিরেছ?

বললুম: আপনাদের কিছু আগে।

পাছে আরও কিছু জানতে চান, তাই নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করলুম: আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

বলে রাণার দিকে তাকালুম।

রাণা বলল: বিরলা মন্দির।

সেই সঙ্গে যোগ করল: কিন্তু স্বাতি আজ একটা মজার কথা বলেছে। মন্দির হয় বৈদ্যনাথের বা বিশ্বনাথের। বিরলার আবার মন্দির কী। আজকের দিনে কি আমরা কুবেরের পূজো করব?

বলে পরম আনন্দে হাসতে লাগল।

বললুম: ঠিকই তো বলেছে।

ঠিক কিসে?

রাণা সোজা হয়ে বসল।

ঠিক নয়? শিবের চেয়ে কি কুবের বড়? বিষ্ণুর চেয়ে বিরলা?

রাণা এবারে সশব্দে হেসে উঠল, বলল: আপনার বুদ্ধিও দেখছি স্বাতির মতো। আরে, বিরলা কি মন্দিরের ঠাকুর? মন্দির তৈরি হয়েছে বিরলার পয়সায়, তাই তার নাম বিরলা মন্দির।

কথা শেষ করবার আগেই আমি প্রশ্ন করলুম: তবে মন্দিরের দেবতা কী?

রাণা হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। চট করে উত্তর দিতে পারল না।

হাসতে হাসতে আমি প্রশ্ন করলুম: কেদারনাথ, না বদরিনারায়ণ?

হঠাৎ বুঝি রাণার মনে পড়ে গেল, বলল: লক্ষ্মীনারায়ণ।

বললুম: দেখলেন তো! সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে শেঠ রাজা বলদেবদাস বিরলা।

কাপড় বদলে মামী ফিরে এসেছিলেন। বললেন: গোপাল ঠিকই বলেছে। অমন সুন্দর মন্দির, কিন্তু মনে হল যেন যাদুঘর দেখছি। ঘর ভর্তি ছবি, দেয়াল ভর্তি লেখা, মস্ত বাগান, বিরাট ধর্মশালা—কিন্তু মনে তেমন ভক্তি এল না। দেবতার মূর্তি যেন পুতুলের মতন। এরই সঙ্গে কালী মন্দিরের তুলনা কর। সে যেন আলাদা জগৎ। আপনা থেকে মন নুয়ে পড়ে। সেখান থেকে উঠে আসতে ইচ্ছে করে না।

মনে পড়ল, আমিও কোথাও এ কথা পড়েছি। মামী আজ অন্তর

দিয়ে যা উপলব্ধি করে এলেন, কে যেন তা লিখে রেখে গেছেন। রাণাও এ কথার প্রতিবাদ করল না।

মামীকে আজ বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। বললেনঃ দক্ষিণ ভারতের কথা তোমার মনে আছে গোপাল? সেখানকার মন্দিরের কথা?

এই তো সেদিন দেখে এলুম।

সেদিনই বটে। এখনও চোখের সামনে সব ভাসছে। রাতে প্রণাম করবার সময় বাবা রামেশ্বরকে যেন আমি দেখতে পাই। কী গম্ভীর সৌম্য মূর্তি!

তবু তো আমরা কাছে যেতে পারি নি! দূর থেকেই প্রণাম করেছিলুম।

মামা বললেনঃ সে দুঃখ আমার যাবে না।

মামা তাঁর পকেট থেকে তামাকের পাউচ আর পাইপ বার করছিলেন। সে দিকে দৃষ্টি পড়তেই মামী ব্যস্ত হয়ে বললেনঃ দেখলে রামখেলাওনের আক্কেল, এখনও কফি আনল না। এসেই তো আমি বলে এলাম।

বাধা দিয়ে রাণা বললঃ তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

কেন হব না! এত পরিশ্রম করে ফিরে এলে, একটু তাড়াতাড়ি দেওয়া কি উচিত নয়?

মামীকে আজ বড় প্রগল্‌ভ মনে হচ্ছে। তাঁকে এত কথা বলতে আমি শুনি নি। দিল্লীর কালী মন্দির কি তাঁর এতই ভাল লেগেছে!

এই যে, বলতে বলতেই হাজির করেছে।

বলেই রাণা আবার সোজা হয়ে বসল।

মামী তাঁর নিজের সামনের তিপয়টা কাছে টেনে নিলেন। রাম-খেলাওন তারই উপরে কফির সরঞ্জাম রাখল।

অন্য দিন এ কাজ স্বাতির। আজ মামী এ ভার নিজের

হাতে নিলেন। তবু তাঁর মেয়ের কথা মনে পড়ল। বললেন : মেয়েটা আজ কোথায় গেল ?

রাণা ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল।

কেন জানি না, একটা দুরন্ত ভাবনায় মন আমার অশান্ত হল। একটু অস্থিরতা, একটা বেদনা বোধ। গভীর যন্ত্রণাময়।

মামা তাঁর পাইপে আগুন ধরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনও চঞ্চলতা দেখলুম না। কতকটা ইচ্ছে করেই যেন কথা বলছেন না।

কফি ঢালতে ঢালতে মামী বললেন : বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে।

তার পর নিজেই সে কথা সমর্থন করলেন : তা তো পাবেই। লজ্জা না থাকলে সে আবার কেমন মেয়ে!

সবাইকে এক এক পেয়ালা কফি এগিয়ে দিলেন। আমার দিকে বাড়িয়ে দেবার সময় বললেন : গোপাল বুঝি জান না ?

একটা অন্ধকার আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা আমার গুমরে গুমরে উঠছিল। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম : কি মামীমা ?

স্বাতির যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল : বলে রাণার দিকে তাকিয়ে বললেন : রাণার সঙ্গে বিয়ে।

এ সংবাদ তো আমি চাওলার কাছেই পেয়েছিলুম। কিন্তু এ যে এত শীঘ্র স্থির হয়ে যাবে, তা ভাবি নি। মুমূর্ষুর মৃত্যুতেও একটা ধাক্কা লাগে, সেই রকমের একটা ধাক্কা লাগল মনে। তবু উত্তর দিতে হল, উত্তর না দিলে ভাল দেখাত না। বললুম : চমৎকার।

কিন্তু চমৎকারের শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসের ভগ্নাংশ ছিল। একটুখানি শুকনো হাসি দিয়ে সেই ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করলুম।

আনন্দ ও গর্বে মেশানো একটা উদ্ধত ভঙ্গিতে রাণা তখন তার কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। কোন কথা কইল না।

কেন জানি না, আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত যাত্রার প্রাক্কালে রামখেলাওন নিরুদ্দেশ হয়েছে হাওড়া

স্টেশনে। মামা আমাকেই তার বদলি পাকড়ালেন। কামরার বিপর্যস্ত মালপত্র যথা স্থানে গুছিয়ে রেখে সুস্থ হয়ে বসতেই মামী বললেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখনি গোপাল। তাঁর বলার ভঙ্গিতে আগে দেখার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে নি, স্বাতির পরিচয়টাই বড় ছিল। স্বাতি আমার বোন। পাতানো হলেও বোন। সারাটা পথ আমাকে এই সম্বন্ধকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সেই নির্দেশের ইঙ্গিত আমি শুনেছি। আজও মনে হল, স্বাতির বিয়ের সংবাদ দিয়ে আমাকে বুঝি সজাগ করে দিলেন তিনি।

কিন্তু এ সবের কী দরকার আছে? আমার মনে হল, এ মামীর আনন্দ নয়, এ তাঁর দুর্ভাবনার কথা, তাঁর আশঙ্কার কথা। প্রগল্‌ভতা দিয়ে তিনি তাঁর ভয়কে জয় করার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে বাচাল হতে দেখি নি।

মামার আজ অন্য রূপ দেখেছি। বড় স্থির, বড় গম্ভীর। আমাদের কথায় তাঁর কান আছে কিনা জানি না, মন যে নেই তা বুঝতে পারি। কী একটা অতৃপ্তি তাঁকে খোঁচা দিচ্ছে, তামাকের ধোঁয়া দিয়ে তা ঢাকতে পারছেন না।

দিল্লীতেই বিয়েটা হোক, কী বল!

উত্তর আমাকে দিতে হল না, দিল রাণা। আমার দিকে চেয়ে বলল: আপনারও তাতে বোধ হয় সুবিধে হবে। এলাহাবাদ থেকে দিল্লীই বোধ হয় কাছে।

মামী রাণাকেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন: বোশেখেই হোক, কী বল?

রাণার উত্তর ছিল তৈরি, কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে বলল: সেই ভাল। দেরিতে গরমও বাড়বে।

মামী বললেন: গরমের চেয়েও বর্ষাটা খারাপ। তারপরেই তো অকাল।

আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী বল?

মুখের সঙ্গে আমার মন করেছে বিদ্রোহ। যা ভাবছিলুম তা বলতে পারলুম না। বললুম: শুভ কাজে দেরি করতে নেই।

মামী বললেন: ঠিক বলেছ। বোশেখের প্রথম দিনটিই সব চেয়ে ভাল হবে।

আমি মামাকে লক্ষ্য করছিলুম। তিনি যেন ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর চোখ খোলা আছে, কিন্তু পলক পড়ছে না। তাঁর অন্য ভাবনা, অন্য চেতনা। তিনি যেন ভিন্ন জগতের মানুষ।

এক সময় রাণা ফিরে গেল। মামী উঠে গেলেন। বসে রইলুম আমরা দুজনে। আমি আর মামা।

স্বাতি এখন কী করছে?

২০

রোজকার মতো রাতে আমি বাইরেই শুয়েছিলুম। কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। জেগে জেগে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

স্বাতি আজ খাবার টেবিলে বসে নি। মাথা ধরেছে বলে আগেই শুয়ে পড়েছিল। আমি কি তার মাথা ধরার কারণ জানি? মনে হল জানি। আমার সামনে সে বেরতে চায় নি। এক জন আদর্শভ্রষ্ট পুরুষের সামনে তার বেরোবার প্রয়োজন বুঝি ফুরিয়ে গেছে। এক দিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সে লোক আজ মরে গেছে। সাবিত্রীর মতো সেই মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারের সাধনা নিতে তার আপত্তি ছিল না! কিন্তু অনেক দুঃখে আজ সে জেনেছে যে সেই দেহে আর রক্ত মাংস নেই, একটা শুকনো কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে। তাতে প্রাণ সঞ্চার হলে সে নিজেই সারাক্ষণ ভয় পাবে। বুঝতে পারলুম যে বৈষয়িক জগতে লাভ করতে গিয়ে স্বাতিকে আমি হারিয়েছি। বিয়ে করে রাণা তার দেহটাই শুধু পেত, মন পেত না। স্বাতি স্বেচ্ছায় তার মন রেখেছিল আমার কাছে বাঁধা।

কিন্তু কেন হারালুম? জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হতে রাজী হয়েছি বলে? কিন্তু কেন রাজি হয়েছি, সে কথা তো গোপন করি নি। অর্থের লোভ আমার ছিল না, আজও নেই। লোভ যার উপর, সে অনেক বড় জিনিস। সে রত্ন পাবার জন্য আমি সবই বোধ হয় হারাতে পারি। তবু কেন অবুঝ হল স্বাতি? কেন ভুল বুঝল?

রাগ হল স্বাতির উপর। কেন সে কিছু চায় না? আমি কি তাকে কোন অধিকার দিই নি? মুখে না বললেই কি কিছু দেওয়া হয় না? মন দেবার কথাও কি মুখে বলতে হবে? কী দিয়েছে স্বাতি! সে তো মুখে কিছুই বলে নি! তবে আমি কী করে সব জানলুম?

মনে হল, আমার ক্ষতি করেছে মিত্রা। সকাল বেলা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে স্বাতিকে আঘাত দিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে ভুল বোঝবার। স্বাতি যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকে তো সে আমাকে তার দুর্বলতারই পরিচয় দিচ্ছে। মিত্রার চেয়ে সে ছোট কিসে? নাইবা থাকল তার বাহিরের জৌলুস, আমি যে তার ভিতরের সম্পদ দেখেছি সে কথা কি সে জানে না?

হঠাৎ আমার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। মনে হল, যা এত ক্ষণ ভেবেছি সে সবই মিথ্যা। স্বাতি আমাকে ভুল বোঝে নি, ভুল বুঝতে পারে না। সে হয়তো দুঃখ পেয়েছে তার বাবা-মার আচরণে। তাঁদের উপর অভিমান। আশৈশব লালন করেও তাঁরা তাকে বুঝতে পারলেন না, বোঝবার চেষ্টাও করলেন না। তার কি কোন মতামত নেই? রাণার প্রস্তাবে সম্মত হবার আগে তার সম্মতির কি কোন প্রয়োজন ছিল না? সে কি কেষ্টনগরের পুতুল যে ভাল খদ্দের পেলেই বেচে দেওয়া চলে?

মিত্রার কথাও আমার মনে পড়ল। আজ সারা দিন একান্তে কাটিয়েও যাকে আমি চিনতে পারি নি, আজ এই মুহূর্তে মনে হল যে তাকে আমি চিনে ফেলেছি, আমার কাছে সে আর দুর্জ্ঞেয় নয়। তার সমস্ত আচরণের আড়ালে আছে যে শাশ্বত মেয়েটি, সে আমার অনেক দিনের চেনা। অন্ধকারের ভিতর আমি তাকেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

দিল্লীর লাল কেল্লায় যখন চাওলার সাক্ষাৎ পাই, তখন মিত্রা তার পরিচয় দিয়েছিল বন্ধু বলে। আজ বুঝতে পারলুম যে চাওলার সঙ্গে তার বন্ধুতারই সম্পর্ক, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু চাওলা এতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। পঞ্চনদবাসী সেই যুবক বোধ হয় নারীকে শুধু বন্ধু রূপেই পেতে চায় না, আরও কিছু প্রত্যাশা রাখে। যাকে ভালবাসে, তাকে ঘরে আনতে চায় গৃহিণী করে। পুরুষের এ চাওয়া চাওলা অন্যায় মনে করে না, কিন্তু মিত্রা অস্বীকার করে।

পুরুষকে ভালবাসলেই তার স্ত্রী হতে হবে, শাস্ত্রেও বোধ হয় এমন বিধান নেই। মিত্রা তো শাস্ত্রও মানে না।

আমাকেও কি মিত্রা এমনি বন্ধু রূপে পেতে চায়, না আর কিছু ?

সকাল বেলায় এক সঙ্গে এল রাণা ও মিত্রা। মামীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন।

মামা বাহিরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন ঃ এস।

রাণা এগিয়ে এসে বলল ঃ বাবা আসতে পারলেন না, তাই আমরাই এলাম। আজ রাতে আপনারা আমাদের বাড়িতে খাকেন।

আমিও বাহিরে ছিলুম। মিত্রা আমার দিকে তাকাল।

মামা বললেন ঃ খাওয়া-দাওয়ার আবার কী দরকার ?

মামী বললেন ঃ ঠিকই তো। তার চেয়ে আজ তোমরাই এখানে খাও।

আমরা ?

মামী বললেন ঃ ক্ষতি কী। সন্ধ্যে বেলায় গল্প গুজব করবে, রাতে একেবারে খেয়ে ফিরবে।

মিত্রার মুখের দিকে তাকাল রাণা। কাজেই জবাবটা মিত্রাই দিল, বলল ঃ আমরা তো আগেই খেয়েছি, না হয় আর এক দিন হবে। আজ বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন, আজ আপনারা আমাদের বাড়ি চলুন।

এর পরে বোধ হয় আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তবু রাণা আমার সমর্থন চাইল, বলল ঃ তাই ঠিক নয় গোপালবাবু ?

সম্মতি দেবার অন্য মালিক। আমি তাই কোন উত্তর দিলুম না।

মিত্রা এবারে সবার দিকেই চাইল, বলল ঃ আপনারা না বলবেন না।

অনুরোধে সিক্ত হল মিত্রার কণ্ঠস্বর।

মামা হার মানলেন, বললেন : না বলবার যে পথ রাখলে না মা, রাজী হতেই হবে। শরীর ভাল থাকলে নিশ্চয়ই যাব।

এই সম্মতিতে রাণার চেয়েও খুশী হল মিত্রা। সে তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলুম।

স্বাতি কোথায় ?

তার পরেই মিত্রা বলল : খুড়ি, বৌদি কোথায় ?

বলল আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত মৃদু স্বরে। রাণা ও আমিই বোধ হয় শুনতে পেলুম।

বললুম : কাল থেকে আর দেখতে পাচ্ছি নে। ভেতরে গিয়ে খুঁজে দেখুন।

মিত্রা আমার উত্তরের অপেক্ষা করে নি। তার আগেই সে ভিতরে চলে গিয়েছিল।

বাহিরে আরও একখানা মোটর দাঁড়াবার শব্দ পেলুম। দেখলুম, চাওলাও আসছে। মনে হল যে এই মুহূর্তে যেন চাওলার প্রয়োজন ছিল। সেই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।

আরে আরে চাওলা যে !

বলে রাণা হিন্দীতে আলাপ শুরু করল।

চাওলাও তার অভ্যাস মতো ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল : এইখেনেই যে তোমার দেখা মিলবে তা জানতুম।

রাণা আশ্চর্য হয়ে বলল : বল কি ! তুমিও হাত গুণতে শুরু করলে নাকি ? কিন্তু তুমি তো আমার হাত দেখ নি !

আমি তো হাত দেখি না, আমি কপাল দেখি। লাল কিলায় তোমার কপাল দেখেছিলাম।

তার পরেই আমাকে প্রশ্ন করল : তোমার বোন কই ?

বললুম : ভেতরে।

মামা-মামীও মিত্রার সঙ্গে ভিতরে গিয়েছিলেন। চাওলা আমার দিকে চেয়ে আর একটু হাসল।

আমার সঙ্গে করমর্দনটা নিঃশব্দেই হয়েছিল। বললুম : হাসলে যে ?

চাওলা আবার হেসে বলল : ওই কাজটিই তো শুধু পারি।

তার পর গম্ভীর হয়ে রাণাকে বলল : গোপালবাবুকে নিতে এলুম। আজ দিল্লীর বাইরে যাচ্ছি কিনা।

তোমার গ্রামে ?

ঠিক ধরেছ। যাব আর আসব।

পাশের ঘর থেকে মিত্রাও বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল। বেরিয়ে এসে আমাকে বলল : কিন্তু আজ তো আপনার যাওয়া হবে না।

মাঝখান থেকে আমি সরে দাঁড়াতেই মিত্রা ও চাওলা দাঁড়াল মুখোমুখি। মনে হল, চাওলা বোধ হয় এতটা আশঙ্কা করে নি। নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় নিল। তার পর জবাব দিল : কখন দরকার গোপালবাবুকে ?

সন্ধ্যে বেলায়।

ঠিক আছে। ডিনারের আগেই আমি পৌঁছে দেব।

রাণা তবু একটু আপত্তি তুলে বলল : আজ কি না বেরোলেই চলে না ?

চলবে না কেন! কিন্তু সারা দিন ঘরে বসে গোপালবাবু কী করবেন ?

মিত্রা বলল : তোমার সঙ্গে বেরিয়েই বা করবেন কী ?

প্রশ্নটা রূঢ়, একটু তিক্তও যেন। চাওলা তবুও হেসে বলল : তোমাদের দিল্লী তো গোপালবাবুকে দেখিয়েছ, এবারে আমাদের দিল্লী দেখাব।

ও।

বলে মিত্রা থামল। তাকাল আমার দিকে। আমার মনে পড়ল কাল বিকেলের কথা। ওখলায় গাড়িতে উঠবার আগে চাওলার

এই পরিচয় পেয়েছিলুন মিত্রার কাছে। এক চোখে দেখা কি সম্পূর্ণ হয়, আমি ভাবলুম। ভগবান আমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন, ডান বাঁ দুটো দিক এক সঙ্গে দেখবার জন্য। আমরা যখন এক চোখে দেখি, তখন নিশ্চয়ই ভুল করি।

চাওলা আমায় আদেশ করল : তা হলে চলুন।

বললুম : কাপড়টা বদলে নিই। রাতের কাপড়।

তাহলে স্নানটাও সেরে নিন। গ্রামে অসুবিধে হবে।

কেন ?

কোন আড়াল নেই। কুয়োর ধারে খোলা জায়গায় নাইতে হয়, কিংবা পুকুরের খোলা ঘাটে। নদী থাকলে ঘরে নাইতে বলতুম না। সে জলের একটা আকর্ষণ আছে, তৃপ্তি আছে। খোলা মাঠের মতো, খোলা হাওয়ার মতো।

একটা ভ্রূকুটি করে মিত্রা সরে গেল। আর আমি ভেতরে গেলুম স্নানের জন্য।

মামা আমার পথ আটকে বললেন : তুমি নাকি বাইরে বেরোচ্ছ ?

বললুম : সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

পাশ থেকে মামী বললেন : দুপুরে এক দিনও খাচ্ছ না, কী যে করছ বুঝি না।

উত্তরে আমি একটু হাসলুম।

আমি স্নানের ঘর থেকেই গাড়ির শব্দ পেলুম। রাণা ও মিত্রা ফিরে গেল। মামা বোধ হয় চাওলাকে নিয়ে বারান্দায় বসেছেন।

বাহিরে বেরিয়েই বাধা পেলুম স্বাতির কাছে। যে মেয়ে কাল রাত থেকে আমায় এড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সে নিজ থেকেই কাছে এল। কোন ভূমিকা না করেই বলল : তোমার কোথাও যাওয়া হবে না গোপালদা।

সে কি।

আমার বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

স্বাতি বলল : আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না।

স্বাতি বলল : চাওলা লোকটাকে আমার ভাল লাগে না।

এবারে আমি হেসে বললুম : মেরে ফেলবে আমাকে ?

তুমি ঠাট্টা কোরো না।

বলে স্বাতি আমার হাত তুটো চেপে ধরল।

আমার রোমাঞ্চ জাগল। মনে হল, সারা জীবন ধরে বুঝি আমি এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করেছি। এমন পাওয়া বুঝি আমি কখনও পাই নি।

ঝনঝন করে কোথায় একটা শব্দ হতেই স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু সে তো ছেড়ে দেওয়া নয়। তার চেয়ে শক্ত বাঁধনে যে সে আমার মনটাকে বেঁধে ফেলেছে। তাকে ছাড়াব কোন্ শক্তি দিয়ে!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বেদনায় ভারাক্রান্ত তার মন, সেই মনের ছায়া পড়েছে তার তু চোখে। ছলছল করছে, না বললেই উপছে পড়বে অবাধ্য জল। আমি না বলতে পারলুম না। হাসি মুখে পরাজয় স্বীকার করে নিলুম, বললুম : তাই হবে।

স্বাতি পালিয়ে গেল।

চাওলাকে এ কথা বলতেই সে চমকে উঠল। বলল : সে কি!! এইটুকুতেই তোমার মত পালটে গেল!

বললুম : কী করব ভাই, উপায় নেই।

হাসতে হাসতেই চাওলা বলল : কাপুরুষ তুমি। সামান্য একটা মেয়ের কথায় তোমার ইচ্ছাকে তুমি জলাঞ্জলি দিলে!

আমাকে আসতে দেখে মামা উঠে গিয়েছিলেন। আমি তারই সুযোগ নিয়ে বললুম : সামান্য মেয়ে সে নয় ভাই, সে অসামান্য।

চাওলার যেন বিশ্বাস হল না আমার কথা, বলল : বল কি ! মিত্রাকে তুমি অসামান্য বল ?

সত্যি কথা আমি প্রকাশ করলুম না, বললুম : কেন বলব না ?

অনেক ক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে হাসল চাওলা। তার পর বলল : প্রেমে পড়ে প্রথমে আমিও তাই ভাবতুম।

এখন কি তোমার মত বদলেছ ?

কেন বদলাব না ! চোখে তো আর রঙীন ঠুলি নেই। মোহ ভাঙতেই খাঁটি রূপটা দেখতে পেয়েছি।

মুখটা তার কানের কাছে এনে বললুম : তবু তো তাকে ভালবাস !

চাওলা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাকে প্রথম দিন থেকেই পুরনো মনে হয়েছে। তার সঙ্গে যে এক দিনের পরিচয় নয়, পরিচয় যে জন্মান্তরের, এ কথাই মনে হয়েছে তার কথায় আর তার ব্যবহারে। এই সাহস নিয়েই তার সঙ্গে রহস্যে প্রবৃত্ত হলুম।

চাওলাও উত্তর দিল হেসে, বলল : ভালবাসা বলতে তুমি কী বোঝ জানি নে। কিন্তু আমি যা বুঝি, মিত্রা তা স্বীকার করে না।

সে কি !

তোমায় বলি নি কি, আমি ভালবাসতে চাই একটি মেয়েকে। কিন্তু যাকে ভালবাসব, তাকে চাই আমার সমস্ত অধিকারের মধ্যে। তুনিয়ার আর কেউ তার ওপর কোন দাবী রাখতে পারবে না।

তার কথার মাঝেই আমি মন্তব্য করলুম : সাবাস ! এই তো পুরুষের ভালবাসা ! আদিম যুগ থেকে আজও পর্যন্ত একেই তো আমরা শ্রদ্ধা করে আসছি।

চাওলা একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল : কিন্তু তুমি শ্রদ্ধা করলে কী হবে ভাই ? যে শ্রদ্ধা করলে আমার জীবনটা সার্থক হত, সে তো অন্য কথা বলে।

সবটুকু শোনবার জন্য আমি বললুম : তাই নাকি!

আর বল কেন! সে মেয়ের মত অন্য রকম। সে ভাবে, ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে ভালবেসেও কুমারী থাকা চলে। বন্ধুকেও তো লোকে ভালবাসে?

সমর্থনের ভঙ্গিতে আমি বললুম : সত্যিই তো, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কি শুধু স্বামী-স্ত্রীর?

চাওলা বোধহয় চটে উঠল, বলল : এ সব তত্ত্ব কথা বলতে বেশ লাগে। যে ভোগে, সেই বোঝে।

তার পর ভয় দেখিয়ে বলল : আমিও তো রইলুম। দেখব, এ সব কথা তোমার কত দিন ভাল লাগে!

আমি হাসলুম তার বলার ধরন দেখে।

চাওলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল : চলি এবারে। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু কিছু বলার আগেই মামা বেরিয়ে এসে বললেন : সে কি, তুমি একা যাচ্ছ, গোপাল যাবে না?

ভাবছি, বাড়িতেই থাকি।

যাবে বলে তৈরি হলে—

বলে মামা তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আর আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না।

চাওলা আবার অনুরোধ করল : চল না, সন্ধ্যের আগেই আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। পাকা কথা দিচ্ছি।

কিন্তু—

কিন্তু নয় গোপালবাবু। আমি তোমাকে বলছি, তোমার সত্যিই ভাল লাগবে। শহরের মানুষ তুমি, গ্রামের আবহাওয়া তুমি যথার্থ উপভোগ করবে।

মনে মনে ভাবলুম, তা হয়তো করব। কিন্তু স্বাতির অনুরোধ

ঠেলে যাই কী করে। সে তো কখনও কিছু চায় নি, হয়তো আর কিছু চাইবারও অবকাশ পাবে না। তাকে দুঃখ দিয়ে আমার কী লাভ হবে।

কিন্তু স্বাতি আমাদের সবাইকে চমকে দিল। বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে সে বাহিরে এল। বলল: গোপালদার সঙ্গে আমিও যাব বাবা।

বড় বড় চোখ মেলে চাইল চাওলা। মামার চোখও কপালে উঠল। বললেন: তুমি যাবে?

স্বাতি সহজ ভাবে জবাব দিল: মা মত দিয়েছেন, তুমি রাজী হলেই যেতে পারি।

কিন্তু—

কিন্তু নয় বাবা, আমিও একটু বেড়িয়ে আসি। এস গোপালদা।

বলে এগিয়ে গেল।

আমরা তার অনুসরণ করলুম।

২১

গাড়িতে বসে অনেক ক্ষণ আমি কথা কইতে পারলুম না। বেদনার মতো তীব্র একটা অনুভূতিতে আমার সারা অঙ্গ অবশ হয়ে রইল। এ কি বেদনা, না আনন্দ! আনন্দের শেষ বুঝি বেদনার মতো গভীর। বেদনার শেষে যেমন আনন্দ।

স্বাতি যে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, এ আমার কল্পনার অতীত ছিল। যে মেয়ে আমাকে যেতে দেয় নি, সে নিজে বেরিয়ে এল। আমাকে যেতে দিতে যার ভয়, সে এল আমারই সঙ্গে! এ কি আমাকে সাহস দিতে, না আমাকে রক্ষা করতে!

হঠাৎ আমার হাসি পেল। ভাবলুম, এ কী ছেলেমানুষী আমার! সামান্য একটা ঘটনার কত গভীর অর্থ খুঁজছি!

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের খানিকটা আভাস পেল। বলল: আমার কাণ্ড দেখে তুমি হাসছ তো গোপালদা?

স্বাতি কথা কইল বাঙলায়। কিন্তু চাওলাও তার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম: স্বাতি হিন্দী জানে না, ইংরেজী বলে থেমে থেমে। দরকার হলে তোমার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা কইবে।

কিন্তু চাওলা আমাদের বিস্মিত করে বলল: বাঙলা আমি একটু একটু বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না।

বাঙলাতেই বলল এই কথা কটি।

স্বাতি আনন্দ প্রকাশ করে বলল: এই তো দিব্যি বাঙলা বলছেন!

বললুম: কোথায় শিখলে বাঙলা?

চাওলা বাঙলাতেই উত্তর দিল: মিত্রার জন্যে।

তারপর ইংরেজীতে তার কারণ বলল : অবাঙালীরা বড় গোঁড়া, বিশেষ করে হিন্দী ভাষাভাষীরা। তারা নাকি নিজেদের ভাষা ছেড়ে আর কোন ভারতীয় ভাষা শেখে না, শিখতে চায় না। অথচ বাঙালীদের দেখ, দেখ আর সব প্রদেশবাসীদের, ঝর ঝর করে তারা কেমন হিন্দুস্থানী বলছে।

আমার মনে হল, কথাটা মিথ্যে নয়। বললুম : তা বটে।

চাওলা গম্ভীর হল—ছদ্ম গাম্ভীর্য, বলল : তুমিও এই কথা বললে ! গান্ধীজী বাঙলা শেখেন নি ? বাঙলা লেখেন নি ?

হেসে বললুম : তোমার মতোই শিখেছিলেন। তবু তাঁকে দোষ দিই না, হিন্দীটাও তাঁর নিজের ভাষা নয়।

চাওলা হাসতে লাগল।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম : একটা কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগছে। কী করে মামীর মত পেলে ? আমাদের মতো দুটো অপোগণ্ডের সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে দিতে তাঁর আপত্তি হল না ?

আমার প্রশ্ন শুনে বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে স্বাতি হাসল। বলল : মায়ের কাছে মতই যদি নিতে না পারলাম তো মেয়ে কিসের !

তা সত্যি ! মেয়েদের তো ছলের অভাব নেই !

স্বাতি ভৎর্সনা করল তার দৃষ্টি দিয়ে।

দুজনে বসবার ছোট গাড়ি। আমরা চাপাচাপি করে বসে ছিলুম। মাঝখানে আমি, স্বাতি আমার বাঁ দিকে। গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললুম : আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করছে না ?

ভয় করব তোমাকে !

স্বাতি হাসল। তার আজকের হাসিতে আমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা স্বাতিকে দেখছি। শুধু কি চেনা ? গোটা মেয়েটাকে আমি দেখছি। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ভাবে দেখছি। কিন্তু কোথা থেকে এই স্বচ্ছতা এল ! একটা রাতের ভিতর এত

পরিবর্তন এল কী করে ? মনে হল, ঐ কথা কটি বলেই স্বাতি আমাকে বিদ্রূপ করল।

কোথায় যাবে তোমরা গোপালদা ?

চাওলা তার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল, উত্তর সেই দিল ইংরেজীতে। বলল : দিল্লীর একটা গ্রামে। গ্রাম দেখতে।

ভারি চমৎকার আইডিয়া তো ! নিশ্চয়ই গোপালদার নয় !

এ কথাও চাওলা বুঝল, বলল : শখটা কিন্তু এঁরই, আমি শুধু প্রস্তাব করেছি। আমরা দিল্লী বেড়াতে এসে মরা দিল্লী দেখি। যে দিল্লী বেঁচে আছে, নিয়ত যুদ্ধ করছে বাঁচবার জন্যে, তার দিকে ফিরেও চাই না।

কোন কথা না বলে আমরা তাকে বলবার অবকাশ দিলুম।

চাওলা বলল : দিল্লী দেখতে আমরা কুতুব মিনার পর্যন্ত যাই, কখনও কখনও সূর্যকুণ্ড পর্যন্ত। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে পথের পাশে যে সব গ্রাম আছে, তা দেখি না। দিল্লী কি শুধু নয়া দিল্লী আর পুরনো দিল্লীর সমারোহ, না তোমাদের কলকাতাই বাঙলা দেশ ? আমাদের ভ্রমণ তো বিদেশীর ভ্রমণের মতো। বিদেশ থেকে যখন বড় বড় নেতারা আসেন, আমরা তাঁদের চোখ বেঁধে বড় বড় জায়গাগুলো দেখিয়ে দিই, বড় বড় শহর, কারখানা, পরিকল্পনা। বলি এই ভারতবর্ষ। তাঁরা হাতে তালি দিয়ে বলেন, সাবাস, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে কী অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে ভারতের। কিন্তু—

চাওলা থামল।

তারপর হাসল লজ্জিত ভাবে। বলল : অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম, তাই না ?

আমি তাকে উৎসাহ দিতে বললুম : বাজে কথা কেন !

আর লজ্জা দিও না। এ সব কথা বলবার সময় নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি।

একটু থেমে বলল : আমি গরিবের ছেলে, গরিবের দুঃখ আমি

জানি। পেটের ধান্দায় শহরে থাকি, কিন্তু গ্রামে আমার নাড়ির টান। গ্রামেই আমরা মানুষ হয়েছি কিনা।

স্বাতি প্রশ্ন করল : দিল্লীতে আপনি একা থাকেন ?

একাই তো। নিজে বিয়ে করি নি, বাবা মাও এলেন না গ্রামের মায়া ছেড়ে।

আপনার দেশ কোথায় ?

দেশ। সে অনেক দূরে। এখন আর সেখানে যাবার অধিকার নেই। দিল্লীর কাছেই কিছু জমি পেয়েছি। বাবা মা এখন সেখানেই আছেন।

আমরা কি তাঁদের কাছেই যাচ্ছি ?

যদি আপনার আপত্তি না থাকে, দুপুরটা আজ সেখানেই কাটানো যাবে।

আপত্তি থাকবে কেন। আপনার বাবা মাকে দেখতে পাব, সে তো আমাদের ভাগ্যের কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মনে হবে অন্য কারণে।

দুর্ভাগ্য আবার কিসের ?

পছন্দ মতো খেতে পাবে না। গ্রামের মানুষ তাঁরা। বেশি বেলায় অতিথি এলে শুধু ডাল আর রুটিই খেতে দেবেন। আচার অবশ্য দু-এক রকম পাবে।

স্বাতি বলে উঠল : চমৎকার খাবার। আচার আমার খুব ভাল লাগে।

চাওলা খুশী হয়ে বলল : তাই নাকি। আমার মাও আচার ভালবাসেন। কম করেও বত্রিশ রকমের আচার খাওয়াতে পারবেন।

বিস্ময়ে অভিভূত হল স্বাতি, বলল : বলেন কী।

আর বত্রিশ রকম আচারের ইতিবৃত্ত দিতে লাগল চাওলা, বলল : সমস্ত সব্জী আর কাঁচা ফলের আচার পাবে। এর ভেতরেও আবার দু রকম আছে—একটা পাকা আচার, সেটা সারা বছর রাখা চলে।

আর একটা কাঁচা। সেটা দিন কয়েক মাত্র খাওয়া চলে, কতকটা তোমাদের অম্বলের মতো।

স্বাতির বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে, বলল: অম্বল আপনি জানলেন কোথায়?

জানব না কেন, মিত্রাদের বাড়িতে যে চাটনি আর অম্বল আমি অনেক খেয়েছি।

এবারে বাঙলায় বলল। স্বাতি অপর্যাপ্ত ভাবে হাসল তার কথার ধরন দেখে।

কিন্তু আমরা তো খেতে যাচ্ছি নে, আমরা যাচ্ছি দেখতে। কী দেখাবে তাই বল?

চাওলা বলল: দেখতে যখন যাচ্ছ, নিজের চোখেই দেখো। আগে ভাগে বলে কেন রস ভঙ্গ করি।

তবু?

দেখবে কিছু সুস্থ মানুষ। সভ্যতার মুখোসপরা মানুষ তো অনেক দেখেছ, তাদের সঙ্গে এদের তুমি মিলিয়ে নিও।

কুতব রোড ধরে আমরা চলেছিলুম। কুতব মিনার পৌঁছে আমরা বাঁয়ে মোড় নিলুম। তুঘলুকাবাদের পাশ দিয়ে সূর্যকুণ্ডের পথ। সেই পথে আমরা যাব। গাড়ির গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে চাওলা বলল: আমি জানি, আমাদের সম্বন্ধে তোমার কোন প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। অনেক কিছু দেখে তোমার আশ্চর্য লাগবে।

কী রকম।

এই ধর আমাদের মেয়েদের কথা। পুরুষদের চেয়ে কি তারা কম মজবুত?

তার পর এই কথাটি প্রমাণ করবার জন্য একটা উদাহরণ দিল। বলল: মনে কর, কোন মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে, আর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোন ছোকরা হয়ত একটু হাসি মস্করা করে

ফেলল। মেয়েটিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। বলল, এস, দেখি তোমার পাঞ্জার জোর। বলে তার হাত চেপে ধরল, বলল, ছাড়িয়ে যাও, তবে মরদ বলব। সেই হাত ছাড়িয়ে চলে যাবে, এমন ছোকরা বেশি মিলবে না।

বলে চাওলা হাসতে লাগল।

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম : তুমি পারবে তো ?

আমি ? আমার কথা আর বোলো না। শহরের মেয়ের কাছেই আমি হেরে যাচ্ছি।

স্বাতির হঠাৎ একটা পুরনো কথা মনে পড়ল, বলল : সে দিন এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে, তাঁকে তো আর আনলেন না ?

আমার মনে হল, এই প্রশ্ন করে স্বাতি তার মেয়েলি মনের পরিচয়টাই শুধু দিল। চাওলাও বোধ হয় এমনি কিছু ভাবল, বলল : কিন্তু যার জন্যে করলুম সে কিছু জিজ্ঞেস করল না।

তার পরেই প্রসঙ্গ পালটে বলল : বীণা আমার এক বন্ধুর বোন, বিবাহিতা। তার স্বামীর সঙ্গে দিল্লী এসেছিল। স্বামীর ফুরসত নেই বলে আমিই তাকে দিল্লীর ফোর্ট দেখিয়ে দিলুম।

হেসে যোগ করল : গোপালবাবু সব জানেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, মিত্রার জন্য তার দুঃখ বোধ হচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অন্য রকম ভেবেছে।

ইচ্ছে হল বলি যে সম্বন্ধটা মধুর, বন্ধুর বোন কতকটা বউএর বোনের মতোই। কিন্তু সঙ্গে স্বাতি আছে বলে কথাটা চেপে গেলুম।

তবু খানিকটা রহস্য করবার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না। বললুম : যার জন্যে করলে, সে জিজ্ঞেস নাই বা করল। কিছু ফল পেয়েছ তো ?

স্বাতি বুঝতে পারে নি। তাই বলল : কিসের ফল গোপালদা ?

বলল আস্তে আস্তে অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে। চাওলা শুনতে পেয়েছিল, উত্তরটা তাই সেই দিল : কী করব বলুন, ঘি যখন সোজা আঙুলে ওঠে না, তখন আঙুল একটু বাঁকাতে হয়। ডাকলে কাছে না এলে, ভয় দেখিয়ে কাছে আনবার চেষ্টা। বীণাকে মিত্রা চেনে না। এক সঙ্গে সামনে পড়ে যেতেই দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় এল। একটু ঢং করে ঈর্ষা জাগাবার চেষ্টা করেছিলুম।

হাসতে হাসতে বলল : তাকে আবার বলে দিও না যেন!

চাওলার ছেলেমানুষি এখনও যায় নি দেখছি। উত্তরে আমরা হাসতে লাগলুম।

তোমরা যে হাসবে আমি জানি। অন্যের বুকে কাঁটা ফুটলে কি সে ব্যথা বোঝা যায়?

ছি ছি, এ কথা কেন বলছ! সমস্ত মানুষের দুঃখ যার নিজের বুকে, তার মুখে এ কথা সাজে না।

এইবারে চাওলা অট্টহাস্য করে বলল : ঠিক বলেছ গোপালবাবু। নিজের বুকে ব্যথা না থাকলে কি অন্যের ব্যথা বোঝা যায়! কিন্তু আজ কেন এ কথা বললাম জানো? মিত্রার প্রসঙ্গ আমার শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে আমার আর চাইবার কিছু নেই। তুমি এবারে নতুন জীবন শুরু করছ, সহজ ভাবে সুস্থ ভাবেই কোরো। পরে যেন আমার মতো পস্তাতে না হয়।

আমার পাশে গায়ে গা মিলিয়ে আছে স্বাতি। শুধু তার দেহেরই উত্তাপ পাচ্ছি না, একটা দেহাতীত আনন্দও পাচ্ছি। ঠিক এমন করে স্বাতিকে কখনও পাই নি। এমন করে সে কখনও মেশে নি। মনের দিক থেকে আমরা কত নিকটে এসে গেছি, সে কথা আমিও ভাল করে ভেবে দেখি নি। চাওলা আমাদের সম্পর্কের কথা জানে না, জানে বোন বলেই। তাই অমন স্পষ্ট করে মিত্রার কথা বলতে পারল। কিন্তু আমার সঙ্কোচ বোধ হল, আমি তার মতো স্পষ্ট জবাব দিতে পারলুম না। বললুম : আমাকে তুমি ভুল

বুঝেছ। দিল্লীতে আমি হৃদয় চর্চা করতে আসি নি, এসেছি দিল্লী দেখতে। আর—

কথাটা মুখে আটকে গেল।

কিন্তু চাওলা থামতে দিল না, বলল : আর কী ?

নিজের আসাবধানতার জন্য লজ্জা বোধ করলুম, তবু উত্তরটা দিয়ে দিলুম : আর এদের জন্যে।

বলে স্বাতিকে দেখালুম।

মোটরের ঝাঁকানিতেও স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে স্বাতির দেহটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। আমার ভাল লাগল।

চাওলা সহজ ভাবেই নিল আমার কথাটা, বলল : তা কি বুঝি নে ? এঁরা না থাকলে তোমার দিল্লী দেখার শখ হত না। কিন্তু দেখতে এসে—

বলেই থেমে গেল। পরম কৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি উত্তর দিলুম না। চাওলার তাতে আপত্তি নেই। বলল : শুনলাম কাল ওখলায় পিকনিক হল, আজ ডিনার। বেশ জমেছে দেখছি।

এবারে আমি বিরক্ত হলুম। লোকটার কি গাত্রদাহ হচ্ছে ! বললুম : আজ কী দেখাবে তাই বল।

আড়চোখে চাওলা আমার মুখের দিকে তাকাল। কী বুঝল জানি নে, কথার মোড় ফেরাতে দেরি করল না। বলল : এক সাহেবের গল্প মনে পড়ছে।

সত্যি গল্প, না তোমার তৈরি ?

সত্যি নয়, আমার তৈরিও নয়।

তবে ?

আমার শোনা গল্প। যে বলেছে, তার তৈরি কিনা আমি জানি নে। তৈরি হলেও কোন ক্ষতি নেই। কেন না গল্পটা সত্যি হতেও পারত।

ভূমিকাটি তো ভালই লাগল।

স্বাতি বলল : আমি না হয় সত্যি বলেই মনে করব।

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : ধন্যবাদ।

তারপর গল্প শুরু করল : তখনও ইংরেজের রাজত্ব। সাহেবদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে দিল্লীর আশেপাশের লোকেরা খেতে পায় না। অর্থাৎ সারা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর বুকের রক্ত জল করে ক্ষেতে যে ফসল ফলায়, তা খায় রাজধানীর লোক, আর চাষীরা উপবাসী থাকে। তুমি অস্বীকার কর এ কথা ?

চাওলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু উত্তর দিল নিজে, বলল : এখনও তো এই অবস্থা। কিছু যব কিছু বাজরা কিছু ভুট্টা এ সবের রুটি যদি দুখানা জুটল তো তাদের বাপের ভাগ্যি। ছোলা নামে একটা শস্য ভগবান দিয়েছিল বলেই তো এরা বেঁচে আছে। ছত্রিশ পদ খাদ্য হয় ছোলা থেকে, কচি শাক থেকে কটকটে ছোলা পর্যন্ত, ঘণ্ট থেকে মিষ্টি।

শেষ দুটি কথা চাওলা বাঙলায় বলেছিল।

স্বাতি হেসেই আকুল হল, বলল : এ সব কথা কোথায় শিখলেন ?

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : মিত্রার ড্রয়িং রুমে। এক দিন চৌত্রিশ পদ হাতে গোনবার পর শেষ পদ দুটি ভেবে পাচ্ছিলাম না। মিত্রাই বলেছিল, ঘণ্ট আর মিষ্টি। ছোলা শাকের ঘণ্ট আর বেসনের লাড্ডু।

তারপরই বলল : কিন্তু দেখ, কী বলছিলাম ভুলে গেলাম।

আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম : সাহেবের গল্প।

ঠিক বলেছ। এই খবর শুনে সাহেবরা তো রেগে কাঁই। এক হোমরা চোমরা সাহেব নিজে তদন্তে গেলেন। মোটরে চেপে সোজা এই রাস্তা দিয়ে। গ্রামখানা আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব।

বলেই একবার আমার দিকে তাকাল।

বললুম : তারপর ?

চাওলা বলল: চাষারা তখন চাষ করছে। ভয়ানক ব্যস্ত। সূর্য মাথার ওপর উঠতে তো আর দেরি নেই, খানিক ক্ষণ পরেই চাষ বন্ধ করতে হবে। বাড়ির বৌ-ঝিএরা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খাবার নিয়ে মাঠে এসেছে?

না এসে আর উপায় কী! ছোকরারাও যে মাঠে এসেছে রাতের শেষ প্রহরে, সূর্য ওঠবার ঢের আগে। বুড়োরা তো এসেছে প্রায় মাঝ রাতে। আকাশের তারা দেখে তারা কাজে বেরোয়, শহরের মতো সূর্য দেখে নয়।

বিস্ময়ে স্বাতি অভিভূত হল। বলল: অন্ধকারেও জমি চাষ করে!

উৎসাহ পেয়ে চাওলা বলল: না করলে যে বিপদ। বিকেল বেলায় আবার বেরোতে হবে। রোদে পোড়া মাটিতে তখন পা রাখে কার সাধ্যি! পেটের জন্যে তবু অনেককেই বেরোতে হয়।

এ যে আমাদের দেশের ময়রার মতন হল। রসগোল্লার দোকান খুলে বসেছো কিন্তু সেই রসগোল্লা খাচ্ছে খদ্দের, আর মাছিতে রস খাচ্ছে।

চাওলা উপভোগ করল স্বাতির রহস্যটা, বলল: একেবারে খাঁটি কথা। ওদের ফসল খাচ্ছে মহাজন, আর রক্ত শুষছে জমিদার।

বাধা দিয়ে বললুম: কিন্তু সাহেবের কী হল?

চাওলা তার গল্পের ভিতর ফিরে এসে বলল: সাহেব! গাড়ি থেকে নেমে সাহেব বললেন, ওদের সঙ্গে ওদেরই খাবার খাবেন। মহা আপত্তি উঠল তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের। বলল, সে একেবারেই অসম্ভব। ওরা কি মানুষ যে সাহেব নিজে ওদের খাবার খাবেন! কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা, তিনি খাবেনই। নিরুপায় হয়ে তারা একখানা রুটি এগিয়ে দিল, তার ওপর খানিকটা সেই ছোলার শাক। না আছে

কাঁটা চামচে, না প্লেট ন্যাপকিন: জামার হাত গুটিয়ে সাহেব বললেন, ওদের মতো করেই খাবেন।

স্বাতির চোখ দেখে মনে হল গল্পটা সে উপভোগ করছে। চাওলা একটুখানি থামতেই বলল: তার পর?

তার পর আর কী! রাতে সেঁকা জোয়ারের রুটি, কম করেও দেড়পো ওজন, শুকিয়ে একেবারে তক্তা হয়ে গেছে। সাহেব বাঁ হাতে রুটিখানি নিয়ে ডান হাতে সেই শাকটুকু খেয়ে ফেললেন। বললেন, বেশ খাবার, কিন্তু বড় কম খায় এরা। বলে রুটিখানা ফেরত দিয়ে বললেন, নাও, প্লেটখানা নাও।

দমকা হাসিতে স্বাতি একেবারে গড়িয়ে পড়ল। রুটিকে প্লেট ভাবল? কী বুদ্ধি আপনার সাহেবের!

আমরাও হাসলুম অপর্যাপ্ত ভাবে।

২২

চাওলার বাবাকে আমাদের ভাল লেগেছিল। পক্ককেশ বৃদ্ধকে যে এমন সুন্দর দেখায় এর আগে আমাদের জানা ছিল না। যেমন গৌর বর্ণ তেমনি প্রসন্ন দৃষ্টি। মনে হল যেন তিনি এক সঙ্গে তিনটি সন্তানকে গ্রহণ করলেন। চাওলার মাকে দেখতে পেলুম না, বোধ হয় মা নেই।

বাহিরের বারান্দায় বসে ভদ্রলোক একখানি বই পড়ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চাওলা উঠতে দিল না। নিজেই খান কয়েক বেতের চেয়ার বার করে আনল। তার পর স্বাতিকে ডেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। বলে গেল : বাবার সঙ্গে বসে একটু গল্প কর। আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করি।

চাওলার বাবা বললেন : আমার মাকে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

চাওলা হেসে বলল : চা ভাল হবে।

আমি বললুম : খাওয়া যাবে তো ?

একটা কটাক্ষ হেনে স্বাতি চাওলার সঙ্গে চলে গেল।

আমি বসে রইলুম চাওলার বাবার সঙ্গে।

দু একটা কুশল প্রশ্নের পর আমি তাঁর হাতের বইখানা দেখতে চাইলুম। তিনি তা এগিয়ে দেবার সময় বললেন : পড়তে পারবে কি !

সত্যি কথা। বোধ হয় পাঞ্জাবী ভাষা। নেড়ে চেড়ে বইখানা আমি ফেরত দিলুম।

চাওলার বাবা বললেন : কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী।

এই দেশের ?

বৃদ্ধ হেসে বললেন : এই দেশেরই।

আমার চোখে বোধ হয় তিনি কৌতূহল দেখলেন। বললেন :

মহাপুরুষদের জীবনী বোধ হয় সুখপাঠ্য হয় না। তাই প্রথম জীবনে আমরা পড়ি না। পড়তে পড়তে এখন মনে হচ্ছে যে এসব জিনিস সকল বয়সেই ভাল লাগা উচিত।

বললুম: চরিত্র গঠনের উপরেই সব নির্ভর করে। দেশে তো লেখকের অভাব নেই, কিন্তু সকলে ঐ বই লিখবেন না। কেউ ভাবেন, সিনেমা না হলে কোন বই লেখার সার্থকতা নেই। কেউ ভাবেন, পাঠ্য পুস্তক হলেও শ্রম সার্থক। যে বই সিনেমা হবে না, প্রচুর বিক্রিও হবে না, সে রকম বই লিখে লাভ কী!

ভদ্রলোক আবার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ চেয়ে রইলেন।

লজ্জা পেয়ে আমি বললুম: কার জীবনী আপনি পড়ছিলেন?

রবিদাসের। চামার রবিদাস বা রায় দাস। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম রায়দাসী সম্প্রদায়। উত্তর ভারতের চামার প্রভৃতি জাতের মধ্যেই তাঁর আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

তাঁর কথা শুনে মনে হল যে এই সম্প্রদায়টি তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন না। কেন দেখছেন না তা তিনি নিজেই বললেন: রামানন্দ ও কবীরের পর রবিদাসের কথা আমার ভাল লাগছিল না।

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন: রবিদাসের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাঁর জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বেশি কিছু নেই, যতটুকু আছে তাতে তাঁর নিজের সম্প্রদায় তাঁকে ছোট করেছে। যে রামানন্দ বলেছিলেন,

জাতি পাঁতি পুছাই নাহি কোই।
হরি কো ভজে সো হরি কা হোই।

সেই রামানন্দের শিষ্যকে জাতে তোলবার জন্য তাঁর শিষ্যদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

একটু থেমে বললেন: রামানন্দর কথার মানে বুঝেছ তো?

কিছু বুঝেছি।

কার কী জাত আর কার সঙ্গে সে খায়, এ সব কথা জিজ্ঞাসা

কোরো না। হরিকে যে ভজনা করে, সে হরির আপন জন।

বললুম ঃ খুব ভাল কথা।

তারপর বললেন ঃ রবিদাসের শিষ্যরা যা বলেছে, তা তোমাকে সংক্ষেপে বলি। জন্মান্তরে রবিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কামারনীর কোলে জন্মাবার পরে তিনি তাঁর স্তন্যপানে বিমুখ হন। তাঁর ইচ্ছায় ঈশ্বর রামানন্দকে বললেন এই পরিবারকে দীক্ষা দেবার জন্য এবং রামানন্দ দীক্ষা দেবার পর নবজাত শিশু মায়ের দুধ খেলেন। একবার নাকি ব্রাহ্মণরা তাঁর সঙ্গে একত্র বসে খেতে অস্বীকার করেন। তারপর তাঁরা দেখে আশ্চর্য হন যে তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন করে রবিদাস বসে খাচ্ছেন। রবিদাস তাঁর দেহের চামড়া কেটে দেখিয়ে দেন যে তাঁর উপবীত আছে শরীরের ভিতরে।

অদ্ভুত কথা!

তিনি বললেন ঃ কিন্তু এ সবের কি কোন দরকার ছিল? রবিদাস ভক্ত, ভগবানের নাম করে তিনি জীবনে সুখী হয়েছিলেন। কোন পার্থিব প্রাপ্তির আশা তাঁর ছিল না।

বললুম ঃ এ যে আমাদের সংস্কার! বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমানকেও তো আমরা ব্রাহ্মণের অংশে জন্ম বলে প্রচার করতে চেয়েছি।

কিন্তু কৃষ্ণকে আমরা গোয়ালা বলেই মেনে নিয়েছি, আর রামচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় বলে।

তাও সত্যি।

রামানন্দ কবীর ও রবিদাস প্রায় সমসাময়িক। ধর্ম মতের পার্থক্য বেশি না হলেও তাঁদের আলাদা সম্প্রদায়। তাড়িয়ে না দিলে রামানন্দ বোধহয় রামানুজ সম্প্রদায়েই থেকে যেতেন।

কে তাঁকে তাড়িয়ে দিল?

তাঁর গুরু রাঘবানন্দ। রামানন্দের জন্ম প্রয়োগে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বংশে। শিক্ষালাভ করেন বারাণসীতে, দীক্ষা নিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের রাঘবানন্দের কাছে। তারপর একবার তীর্থ পরিক্রমা

করে ফিরে আসতেই গুরু শিষ্যের বিবাদ বাধল। গুরু বললেন, তীর্থ পর্যটনের সময় জাতি রক্ষা নিশ্চয়ই সম্ভব হয় নি। রামানন্দ বললেন, জাত আমি মানি নে।—

জাতি পাঁতি পুছাই নাহি কোই।
হরি কো ভজে সো হরি কা হোই।

রামানন্দকে আলাদা হয়ে তাঁর নূতন সম্প্রদায় গড়তে হল।

কবীরও এই কথাই বলেছিলেন।—

জাতি পাঁতি কুল কাপরা যেহ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহো রামানন্দ যেউ রহে ঝক্‌মারি॥
জাতি হমারা বাণী কুল করতা ঔর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি॥

কবীর ছিলেন রামানন্দের খাঁটি শিষ্য, কিন্তু রামানন্দ তাঁকে স্বেচ্ছায় দীক্ষা দেন নি।

কবীরের জন্ম বিবরণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। মুসলমানরা বলে, তিনি মুসলমান ছিলেন, আর বৈষ্ণবরা তাঁকে হিন্দু বলে দাবী করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর শবদেহ নিয়েও হিন্দু-মুসলমানে কাড়াকাড়ি পড়েছিল। মুসলমানেরা বলে, আমরা কবর দেব। হিন্দুরা বলে, আমরা পোড়াব। সেই সময় নাকি কবীর নিজেই বলেন, আমার আবরণ তুলে দেখ। মৃতদেহের আবরণ সরিয়ে সবার চক্ষু স্থির। কোন মৃতদেহ নেই, শুধু এক রাশি ফুল। পাঠান রাজা বিজলি খাঁ অর্ধেক ফুল নিয়ে গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মাতৃভূমি মগর গ্রামে কবর দিয়ে সমাধি স্তম্ভ তুললেন। আর বাকি অর্ধেক ফুল কাশীরাজ বীরসিংহ দাহ করে কবীর চৌর নির্মাণ করলেন।

চাওলার বাবা থামতেই আমি চাওলা ও স্বাতিকে দেখতে পেলুম। স্বাতির দৃষ্টিতে পরম কৌতুক লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পারলুম যে তারা অনেক ক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করছে। তার হাতে একটা ট্রেতে তিনটি গ্লাস, চতুর্থটি চাওলার হাতে। স্বাতি প্রথমে

চাওলার বাবাকে একটি গ্লাস নিতে অনুরোধ করল, তারপর আমাকে। বলল : খেয়ে দেখ তো, ঠিক তৈরি হয়েছে কিনা।

বললুম : তোমরা তো চা তৈরি করতে গিয়েছিলে।

স্বাতি নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল : বেশ লোক! দিল্লীতে কি চা খেতে পাও না যে এখানে এসেও চায়ের জন্যে মন কেমন করছে!

হেসে জিজ্ঞাসা করলুম : ব্যাপারটা কী?

উত্তর চাওলা দিল, বলল : মাঠ্ঠা।

স্বাতি বলল : যেখানে এসেছি, সেখানকার জিনিসই খাব।

চাওলার বাবা প্রচুর খুশী হলেন, বললেন : চমৎকার কথা। মন যদি এমন খোলা থাকে তো দুঃখ কোন দিন আসবে না।

স্বাতি বোধ হয় এ কথার মর্ম বুঝল না, তবু আমার দিকে একটা গর্বের ভঙ্গিতে তাকাল।

চাওলার বাবাকে আমি মনে করিয়ে দিলুম : আপনি আমাকে কবীরের কথা বলছিলেন।

মনে আছে।

একটু থেমে বললেন : অলৌকিক কথা সকলের বিশ্বাস হয় না বলে বলতে ভয় পাই।

আমার মনে হল, স্বাতিকে দেখেই তিনি এ কথা বললেন। তবু উত্তরটা আমিই দিলুম। বললুম : অনেক মানুষ তো ভগবানেও বিশ্বাস করে না, তাই বলে কি ভগবান নেই?

সত্যি কথা। ভক্তমালে কী লিখেছে জান? কবীর এক ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার পুত্র। শৈশবেই মেয়েটি বিধবা হয়েছিল। তারপর যেদিন পিতার সঙ্গে তাঁর গুরুর কাছে গিয়েছিল, গুরু তার ভক্তি দেখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, পুত্রবতী হও। গুরুর আশীর্বাদে সেই কন্যার পুত্র হল। আর কলঙ্ক ভয়ে মা তাকে দূরে পরিত্যাগ করে এল। সেই পুত্রকে মানুষ করেছিল এক জোলা ও তার স্ত্রী।

সেই জন্যেই কবীর জোলার পুত্র বলে পরিচিত।

স্বাতির মুখ দেখে মনে হল যে এই গল্প তার বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু কোন কথা সে কইল না।

চাওলার বাবা বললেন: কবীর-পন্থীরা এই গল্প মানেন না। তাঁরা বলেন যে কাশীর কাছে লহর তালাওএ এক পদ্ম পাতার ওপরে শিশু কবীর ভাসছিলেন। জোলারা তাঁকে দেখতে পেয়ে নিয়ে যায়।

কবীরের দীক্ষার গল্প নিয়ে কোন মতভেদ নেই। প্রথমে তিনি জোলার কাজ শিখেছিলেন, কিন্তু সেই কাজে তাঁর মন লাগত না। এই সংসার অসার বলে তাঁর মনে হত। কী করে ভবসাগর পার হবেন সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হতেন। শেষ পর্যন্ত রামানন্দের কাছে মন্ত্র নেবার সংকল্প করলেন। কিন্তু ম্লেচ্ছ হয়ে রামানন্দকে পাবেন কী করে? এক দিন এক বৈষ্ণব বুদ্ধি দিলেন, এক কাজ কর। রাত থাকতে রামানন্দর বাড়ি গিয়ে তাঁর দরজার সামনে শুয়ে থাক। রামানন্দ শেষ রাতে গঙ্গা স্নানে বার হন। তাঁর পা তোমার গায়ে পড়লে যে নাম উচ্চারণ করবেন, সেই তোমার গুরুর মন্ত্র হবে। কবীর তাই করলেন। রামানন্দ তাঁর গায়ে পা তুলেই পিছিয়ে এলেন, বললেন: রাম রাম। কবীরের দীক্ষা হল রাম নামে।

কবীর যখন তীর্থ পর্যটনে বার হয়েছিলেন, দিল্লীর বাদশাহ সিকন্দর লোদী তাঁকে বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কবীর প্রতারক বলে খবর রটেছিল। বাদশাহ তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যমুনার জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, তারপর আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হাতির পায়ের নিচে ফেলেছিলেন। যমুনা তাঁকে গ্রহণ করে নি, আগুন তাঁকে দগ্ধ করে নি, হাতি ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

চাওলার বাবা কতকটা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন: কবীরের ঘরে

ভগবান এসেছিলেন বারে বারে। এক শীতার্ত রাত্রে ঘরে তাঁর অন্ন নেই। মায়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কবীর এক খানি কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে চললেন। পথে এক দরিদ্র নগ্নপ্রায় বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তার কষ্ট দেখে কবীর সেই কাপড় খানি তাকে দান করে বাড়ি ফিরলেন। মনে তাঁর সুখ ছিল, কিন্তু দুর্ভাবনা ছিল উপবাসী মায়ের জন্য। কিন্তু বাড়ি ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মা তাঁর রান্না বান্না করে বসে আছেন। কবীর জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব তুমি কোথায় পেলে মা? মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন, তুমিই তো লোকের হাতে টাকা পাঠালে!

চাওলার বাবা খানিক ক্ষণ কোন কথা কইতে পারলেন না। তার পর বললেন: অসংখ্য লোক তাঁর বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে গেছে। কে যুগিয়েছে খাবার তা কেউই জানেন না।

এ সবই বিশ্বাসের কথা। অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা শুনেছি। নীরব থেকে আমি তাঁকে আরও বলবার সুযোগ দিলুম। বৃদ্ধ বললেন: কবীরের কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।

সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাঁউ।
হাঁজী হাঁজা সব্‌সে কিজিয়ে বইঠে আপন গাঁও॥

সকলের সঙ্গে মেলামেশা কর, আর সকলের নাম নাও, দেখা হলে সকলকেই বল হাঁজী হাঁজী, নিজের জায়গাটি কখনও ছেড়ো না। বলতেন—

মন্‌কা ফেরৎ জনম্ গয়ো
গয়ো না মন্‌কা ফের।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর
মন্‌কা মন্‌কা ফের॥

জপের মালার গুটি ঘুরোতে ঘুরোতেই জীবনটা গেল, মনের

ঘোর তবু কাটল না। তাইতেই বলি এবারে হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরিয়ে দেখ।

একা এই নির্জন গ্রামে চাওলার বাবাকে দেখলুম মনের গুটি ঘুরিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

সারাটা দিন চাওলার গ্রামে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমরা দিল্লী ফিরে এলুম। স্বাতির আজ আনন্দের সীমা নেই। মনে হল, সে যেন নতুন জীবন পেয়েছে। এমন উদার জীবনের আস্বাদ সে বুঝি আগে কখনও পায় নি। আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। ধনুষ্কোডিতে সমুদ্র বেলায় ঝিনুক কুড়োবার কথা। সে দিনও সে এমনি করে হাসিতে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। সে দিন আমি তার আনন্দের ভাগ নিয়েছিলুম, কিন্তু আজ নিলুম বেদনার বোঝা। মনের ভিতর কোথায় একটা বেদনা খচ খচ করছিল, স্বাতির এই উল্লাসে হল রক্ত ক্ষরণ। তবু আমি হাসলুম, আর স্বাতি আমাকে দেখে হাসল।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে হাসি আমাদের শুকিয়ে গেল। বসবার ঘরে বসে যে ভদ্রলোক মামার সঙ্গে গল্প করছিলেন, শুনলুম তিনিই রাণার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি। খাঁটি সাহেব। শুধু পোশাকে নয়, কথায় ও ব্যবহারেও। যে ভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন, মনে হল, আমি বুঝি মন্ত্রীদের এক জন। আত্মপ্রসাদে বুকখানা ফুলে ওঠা উচিত ছিল।

চাওলা যে বুদ্ধিমান, তাতে সন্দেহ নেই। বাড়ির সামনে এক খানা বড় গাড়ি দেখেই নিজের গাড়ি থেকে নামে নি। অস্পষ্ট ভাবে বলেছিল: ব্যাপার সুবিধের নয়। মনে হচ্ছে, খোদ কর্তা এসেছেন।

বলেই ফিরে গিয়েছিল। তার ভাব দেখে মনে হয়েছিল, বেচারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করল।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করতে পারলুম না।

মামা বললেন: মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও গোপাল। মিস্টার ব্যানার্জি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আবার মিস্টার ব্যানার্জি বলছ!

বলে ভদ্রলোক আপত্তি জানালেন।

গভীর ভাবে মামা ধোঁয়া নিচ্ছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন: তুমি আমাকে নীতীশই বোলো। দূরত্বটা তো সম্বন্ধের নয়, সেটা কালের। কালের দূরত্বকে অতিক্রম করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয় না।

ভদ্রলোকের ইংরেজী শব্দ প্রীতি লক্ষ্য করলুম। বাঙলার ভিতর এত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছিলেন যে সংলাপ পুরোপুরি ইংরেজী হলেই বোধ হয় সহজবোধ্য হত।

কথা না বলে এবারেও মামা মাথা নাড়লেন।

মামার দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম: আপনারা যাবেন না?

মামা এবারে তাঁর পাইপ নামালেন মুখ থেকে। বললেন: তোমার মামীকে নিয়েই বিপদ হয়েছে। হঠাৎ তাঁর শরীরটা বিগড়ে বসেছে।

সেকি!

মামা বললেন: যাবার সমস্তই ঠিক। পার্লামেন্ট থেকে ফিরে এই বিপদ দেখছি।

মিস্টার ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন হলেন না। মনে হল, এ খবর তিনি আগে পেয়েছেন এবং তাঁর উদ্বেগের কারণও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হলুম। সরাসরি ভিতরে চলে গেলুম মামীর খোঁজে।

চাদর জড়িয়ে মামী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন: বোসো।

আমি তাঁর পায়ের কাছে বসলুম।

আমায় আরও একটু কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন: তোমরাই যাও। ওদের সাহেবিআনার ভেতর আমাকে আর ডেকো না।

মামীর অসুখের কারণ আমি বুঝতে পারলুম। তিনিও লুকোলেন না, বললেন: শুনলাম, ওদের বেয়ারা বাবুর্চি সব মুসলমান। এঁটো কাঁটারও কোন জ্ঞান নেই।

আমি মেনে নিয়ে বললুম : বিচিত্র নয়। ওঁরা শুনেছি বিলেতে ফেরত সাহেব।

ঠিক বলেছ।

মামী উৎসাহ পেয়ে বললেন : তোমার মামাকে একবার দেখ। এক কথায় তুমি যা বুঝলে, তোমার মামার মাথায় তা ঢুকছে না। সকাল থেকেই নানা ওজর আপত্তি।

মামার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমি সঙ্গত মনে করলুম না। মামী নিজেই বললেন : বলছেন, বিলেত গেলেই কি জাত যায়? তারপর বলছেন, কী ভাববে আমাদের বল তো! জমিদার বলে তো সারা জীবন ঘৃণা করেছে, এ সব করলে কি আর মেলামেশা করবে!

মামার এ দুর্বলতার কথা আমি জানি। গোলামী করে যে যুগে সরকারের খেতাব পাওয়া যেত, মামা সেই যুগের রায় সাহেব। আর গোলামী তো সরকারের করতে হত না গোলামী সরকারের দেশের লোকের। জাতে ওঠবার জন্য মিস্টার ব্যানার্জিরা তখন বোনার্জি লিখতেন, আর শ্রীকান্ত লিখত এস. কেন্ট।

এ সব কথা মামীর অজানা নেই। বললেন : নাই বা করল মেলামেশা। ওরা কি আমাদের স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে দেবে!

এ কথার উত্তর আমার তৈরি ছিল। কিন্তু দিলুম না। বড় অশিষ্ট শোনাত, বড় উদ্ধত। ওঁরা কি করবেন জানি না, কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি তাঁদের মেয়ে নেবেন। সমাজে তাঁর ছেলের প্রতিষ্ঠা আছে, ঘরে পয়সা আছে, মেয়ে তাঁদের সুখে থাকবে। এই কথাটি মামী ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারলুম না। বললুম : স্বাতি কোথায়?

চান করছে।

বলে মামী চুপ করে রইলেন। অনেক ক্ষণ আর কোন কথা কইলেন না।

আরও খানিক ক্ষণ বসে থেকে আমি উঠে পড়লুম।

মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে আমাদের সময় লাগল না। মামা আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন। আজ প্রথম আমি তাঁর মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারলুম না। মনে হল, মনে তাঁর একটি মাত্র ভাব নেই, একাধিক চিন্তায় আজ তিনি পীড়িত হচ্ছেন। আমরা পিছনে বসলুম। মিস্টার ব্যানার্জি বসলেন সামনে ড্রাইভারের পাশে।

খানিকটা এগিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। বললেন: উৎসবটা কবে হচ্ছে?

কিসের উৎসব আমি বুঝতে পারলুম। পোষ্যপুত্র নেবার উৎসব ছাড়া আর কী হতে পারে। বললুম: সামনের সপ্তাহেই বোধ হয় দিন পড়বে।

মিস্টার ব্যানার্জির ঠোঁটের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। কেস থেকে আর একটা সিগারেট বার করে মুখের টুকরোতেই জ্বালিয়ে নিলেন। বললেন: নিশ্চয়ই খুব ধুমধাম হবে?

বোধ হয় না।

কেন?

অনেক বার তো ধুমধাম করে দেখলেন। এক বারও ফল ভাল হল না।

হুঁ।

বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

গায়ে পড়ে গল্প করবার বয়স আমাদের নয়। এক বার আমি স্বাতির দিকে ও আর এক বার স্বাতি আমার দিকে চেয়ে দুজনেই চুপ করে বসে রইলুম।

এক সময় মিস্টার ব্যানার্জি আবার প্রশ্ন করলেন: তুমি তো দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে এলে, তোমার কী মনে হয়?

তিনি কী জানতে চাইছেন, তা তাঁর প্রশ্নে যে স্পষ্ট হল না, তিনি নিজেও তা বুঝতে পারলেন। বললেন : আমি তাঁর পরিবারের কথা জানতে চাইছি। ছেলে পিলে কেন বাঁচে না, সেই কথা।

তাঁর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলব!

মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। পিছন ফিরে বললেন : ভাগ্যে তুমি বিশ্বাস কর?

না করে উপায় কী?

ইচ্ছে করেই আমি এ কথা বললুম। এই জবাব পেয়ে তিনি খুশী হবেন জানলে এ কথা বলতুম না।

মিস্টার ব্যানার্জি আমাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন : এ যুগের ছেলে হয়ে তুমি ভাগ্যে বিশ্বাস করবে, আমার জানা ছিল না। ভাগ্যকে তোমরা গড়ে তুলবে, আমি এই আশা করি তোমাদের কাছে।

সঙ্গত ভাবেই তা করেন এবং এক দিন আমরাও নিজেদের ভাগ্য গড়ব। তবে সে দিন আসতে এখনও দেরি আছে।

দেরি কিসের?

সত্য কথাটা আমার মুখে এসে গেল, চেষ্টা করেও চাপতে পারলুম না। বললুম : ক্ষমতা যে দিন আমাদের হাতে আসবে, সে দিন আমরা নিজেদের ভাগ্য গড়ব।

ভদ্রলোক আবার চমকে উঠলেন, বললেন : তুমি কি—

আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। রাজনীতির চর্চা আমি করি না।

এ রকম কথা তো—

মিস্টার ব্যানার্জি কথা শেষ করলেন না।

বললুম : আপনিই বলুন, কী নিয়ে আমরা ভাগ্য গড়ব! আমাদের সঙ্গতি কী! শুধু বিদ্যা দিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে যদি ভাগ্য গড়া সম্ভব হত, তা হলে দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ত না। শিক্ষার তো প্রসার হচ্ছে প্রতি দিন!

হেসে বললুম: একবার দেখুন না আমার অদৃষ্ট। গরিব মাস্টারের ছেলে, করি কেরানীগিরি। মামাবাবুর মুখে যা শুনছি, তা তো অর্ধেক রাজত্ব পাবার মতন। তার পর আজ নেমন্তন্ন খাব আপনার বাড়ি। আপনারই গাড়ি চড়ে যাচ্ছি।

স্বাতি হাসছিল মিষ্টি মিষ্টি করে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করার জন্যে বললুম: বাঙলা দেশে তো ঢের লোক আছে আমার মতন। কই, তাদের ভাগ্যে তো এ সব জোটে না!

মিস্টার ব্যানার্জি এবারে স্বীকার করলেন: তা ঠিক। তুমি এ কথা বলতে পার বৈকি।

স্বাতির দিকে চেয়ে আমিও একটুখানি হাসলুম।

মিস্টার ব্যানার্জির সরকারী কোয়ার্টার দূরে নয়। গল্পে গল্পে কোথা দিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছে গেলুম, অন্ধকারে তা টের পেলুম না। রাণা ও মিত্রা বাহিরেই অপেক্ষা করছিল। গাড়ির শব্দ পেয়েই এগিয়ে এল।

শুধু আমাদের দুজনকেই আশা করছিল কিনা জানি না, কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে রাণা বলল: ওঁরা এলেন না!

উত্তর আমি দিলুম: ওঁদের শরীর ভাল নেই।

মিত্রা প্রশ্ন করল: কোন অসুখ করে নি তো?

বললুম: সে রকম কিছু নয়। তবে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল।

রাণা সমর্থন করে বলল: তা বটে।

মিস্টার ব্যানার্জি আর অপেক্ষা করলেন না, বললেন: তোমরা গল্প কর।

বলেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন।

মিত্রাকে অনুসরণ করে আমরা তাদের বসবার ঘরে এলুম।

আসন গ্রহণ করে রাণা বলল: তার পর চাওলার সঙ্গে বেড়িয়ে এলেন তো!

এলুম বৈকি।

কেমন লাগল ?

অনেক দিন এমন আনন্দ পাই নি। মনে হল যেন এক নতুন রাজ্যে গেছি, নতুন জীবন পেয়েছি সেখানে। ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই না স্বাতি ?

রাণা চমকে উঠল, বলল : আপনিও গিয়েছিলেন নাকি !

উত্তরে স্বাতি শুধু হাসল। বিজয়িনীর হাসি। তাকাল মিত্রার দিকে।

মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

আমি বললুম : অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও যে পুরুষ ও নারীর জীবন এমন মধুর হয়, এ আমার জানা ছিল না। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতুম না। অভাব বোধ নেই, অভিযোগ নেই কারও ওপরে কী সুখী ওরা, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

মনোযোগ দিয়ে মিত্রা শুনছিল, বলল : আমাদের কি অভাব বোধ বেশি, না অভিযোগ সবার ওপরে ?

হেসে বললুম : ভুল হল। আপনাদের অভাব নেই বলেই অভাব বোধ নেই। আর অভিযোগ জানাবার প্রয়োজনও আপনাদের হয় না, তার আগেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমি যাদের কথা বলছি, তারা দু বেলা খেতে পায় না, কাপড় নেই সারা গা ঢাকবার। এ সব যারা কেড়ে নিচ্ছে, তাদেরও তারা ভালবাসে।

মিত্রা একটা কটাক্ষ করে বলল : আপনার সঙ্গে চাওলার বেশ মিল আছে দেখছি।

বললুম : চাওলার সঙ্গে কেন, সব মানুষের সঙ্গেই আছে। মানুষ তো সহানুভূতিশীল। নিজের দুঃখেই তার দুঃখ নয়, পরের দুঃখেও তার সমান দুঃখ হওয়া উচিত।

আমার জন্যে আপনার দুঃখ হয় ?

হয় বৈকি।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলুম। মিত্রা আর একটা প্রশ্ন

করে আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল: আমার কোন দুঃখ আছে ভাবেন ?

কেন বুঝব না ? আপনার দুঃখ তো আরও গভীর, আরও মর্মান্তিক। জীবনে কী করবেন, আপনি তা ভেবে পাচ্ছেন না। এই জিজ্ঞাসাই আপনাকে সারা ক্ষণ পীড়া দিচ্ছে।

স্বাতি কোন কথা কইল না। রাণা এত ক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিল, এবারে বলল: আপনি কি কখনও গণৎকারের কাজ করেছেন গোপালবাবু ?

আমি হাসলুম তার কথা শুনে, বললুম: মানুষ মাত্রেই গণৎকার অন্তর্যামীও বটে। মানুষ বলতে আমি গোটা মানুষকে বোঝাচ্ছি: ভগবানের তৈরি মানুষ, সভ্যতার হাসপাতালে হৃদয়-কেটে-বাদ-দেওয়া মানুষ নয়।

ওরে বাবা! এ সব যে বড় বড় কথা।

তার পর স্বাতির দিকে ফিরে বলল: আসুন স্বাতি দেবী, আমরা সহজ কথা বলি।

স্বাতি আগ্রহ দেখিয়ে বলল: ঠিক বলেছেন, গোপালদার কথাই শুধু বড় বড়।

বলে কটাক্ষে আমার দিকে চাইল।

আমি বললুম: এটা বাঙলীর উত্তরাধিকার।

রাণা হাসল আমার কথা শুনে, বলল: তা যা বলেছেন। বাঙালী এক সময় ভাল কথাই বলত।

স্বাতি আপত্তি করে বলল: এখনই বা মন্দ কী বলে!

বলেই আমার দিকে চাইল।

আজ স্বাতির ব্যবহারে আমি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। তার সকালের আচরণের সঙ্গে সারা দিনের ব্যবহারের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি নে। আজকের এই স্বাতিই তো আমার চিরকালের চেনা মেয়ে। সকাল বেলার স্বাতিকেই আমার অচেনা মনে হয়েছিল।

তবু আমি সহজ হতে পারলুম না। আমার বুকের ভিতর এখনও যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে।

মিত্রা এ সব কথায় কান দিল না। বলল ঃ আপনি আমার সম্বন্ধে যে কিছু ভেবেছেন, তা বুঝতে পারছি। আমার জিজ্ঞাসা কি শুধু আমারই জিজ্ঞাসা ?

তা কেন হবে। কিন্তু লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কেন বলতে পারেন ?

এ যুগের লোকের ভাববার ধৈর্য নেই বলে।

মিত্রা আরও একটু শোনবার অপেক্ষা করছিল। বললুম ঃ গতানুগতিকতা এই যুগটাকে পেয়ে বসেছে। ভেড়ার পালের মতো আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছি। দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেই বিপদ। তখনি আসে নানা রকমের জিজ্ঞাসা।

রাণা স্বাতির দিকে ফিরে বলল ঃ এ যে দর্শন আলোচনা হচ্ছে। আসুন, আমরা অন্য কিছু বলি।

স্বাতি বলল ঃ সেই ভাল।

কিন্তু চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

মিত্রা আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কেন এমন হয় বলতে পারেন ?

এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। প্রতিবাদ আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু প্রতিবাদ জানাবার অধিকার কোন দিন ছিল না। এখন আমরা সেই অধিকার সঞ্চয় করছি। ধর্মের বিরুদ্ধে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনীতির বিরুদ্ধে এমন কি সমস্ত রকমের সংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ, তার বিচার আমরা করছি না। কিছু পরিবর্তন হলেই তা মঙ্গল আনবে, এই আমাদের ধারণা।

একটু থেমে আবার বললুম ঃ কিন্তু দুঃখ কিসের জানেন ? দুঃখ এই যে আমাদের মেষপালকই শুধু বদলেছে। কিন্তু তাদের নীতির বদল হয় নি। এখনও আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছি, আর দু ধারে

লাঠি হাতে চলেছে মেষপালকরা। দল থেকে কেউ খসে পড়লেই লাঠির আঘাতে তাকে দলভুক্ত করা হচ্ছে। বেশি বেয়াড়ামি করলে রাস্তার ধারে ফেলেই চলে যাচ্ছে। দলের ভেতর বিদ্রোহী ভেড়া তারা চায় না। আত্মসচেতন মানেই তো বিদ্রোহী।

এই সময়ে বেয়ারা এসে রাণাকে ডেকে নিয়ে গেল।

মিত্রা বলল : আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করতে পারেন ?

বললুম : সর্বনাশ ! যে কথা ভেবে সমস্ত দেশের বড় লোকেরা হিমসিম খেয়ে গেল, তার নির্দেশ দেব আমি ! অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

মিত্রা একটু কঠিন ভাবে জিজ্ঞেস করল : তবে আপনি কী করবেন ?

আমি ? আমার প্রয়োজন যদি কোন দিন হয়, সে দিন আমি এগিয়ে আসব। কোন ভার পেলে সে দায়িত্ব আমি হাসি মুখে বহন করব। সেই শক্তি আমি সঞ্চয় করছি!

প্রসন্ন মেজাজে রাণা ফিরে এল। মিত্রার পাশে বসে বলল : অমনি অমনি করব না, কী খাওয়াবি বল্ !

মিত্রা কোন উত্তর দিল না।

রাণা বলল : আচ্ছা ঠিক আছে, খাবার পরেই হবে।

খাবার পরেই সেই কথা হল। অনেক ক্ষণ রহস্য করে রাণা সেই প্রস্তাব উপস্থিত করল। মিত্রাকে বিবাহের প্রস্তাব। এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না থাকলেও মনে আশঙ্কা ছিল। তাই আকাশ থেকে পড়ার মতো করুণ অবস্থা হল না। বললুম : কঠিন কথা। ভেবে দেখবার কথা।

রাণা উচ্ছ্বসিত ভাবে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। মিত্রা তাকে থামিয়ে দিল।

বললুম : মনে হয়, এলাহাবাদে এই প্রস্তাব পাঠানো উচিত।

হাসতে হাসতে রাণা বলল : প্রসঙ্গটা সেইখান থেকেই এসেছে।

জ্ঞানশঙ্করবাবু নিজেই আপনার সংবাদ দিয়েছেন।

পূর্বাপর অনেকগুলো ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেক প্রশ্নের মানে এবারে সহজ হয়ে গেল। বললুম : আমার এক জন আত্মীয় আছেন। জীবনে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমি একটা পরামর্শ করতে চাই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! বাবা নিজেই তাঁদের বলেছেন। তাঁদের মতেরও দরকার আছে বৈকি!

রাণার কথা আমি সমর্থন করলুম না, প্রতিবাদও জানালুম না। বললুম : আজ আসি তা হলে।

বড় গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল। মিত্রা এল না, রাণা একাই আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল।

২৪

আগ্রা স্টেশন কখন এসেছি কখন ছেড়ে গেছি খেয়াল করি নি। যমুনার পুলের উপর ট্রেন উঠতে চমকে উঠলুম। শুধু পুলই তো নয়, নিচে যমুনার সেই নীল ধারা। এক দিকে শুধু বালি। আর এক ধার দিয়ে সেই শীর্ণ ধারা এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। এপারে আগ্রা শহর আর ওপারে যমুনা ব্রীজ স্টেশন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আরও একটা রেলের পুল দেখা যাচ্ছে। ওর উপর দিয়েও বড় লাইনের গাড়ি চলে। আগ্রা ফোর্ট ইদ্গা হয়ে আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট যায়। আমরা সেই ক্যান্টনমেণ্ট ছেড়ে রাজা-কি-মণ্ডি আগ্রা সিটি হয়ে যমুনা ব্রীজ যাচ্ছি। আরও একটু এগিয়ে তাজমহল দেখতে পেলুম। যমুনার উপর শাহজাহানের তাজমহল।

তাজমহল দেখেছিলুম ললিতা বৌদির সঙ্গে। শুধু দিনেই নয়, রাত্রেও। দিল্লী যাবার পথে দু দিনের জন্য আগ্রায় নেমে পাঁচ দিন আটকা পড়েছিলুম। যাবার আগের দিন ললিতা বৌদি বললেন: এ আপনার ভাল হচ্ছে না ঠাকুরপো। আজ সোমবার, সামনের বিস্যুৎ-বারে পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় তাজমহল না দেখে কেউ আগ্রা ছেড়ে যায় ?

বললুম : আমার পূর্ণিমা হবে দিল্লীতে।

তা জানি ঠাকুরপো। ও পূর্ণিমা তো সারা বছর। তার জন্যে আকাশের পূর্ণিমা কেন নষ্ট করবেন ?

তর্কে হেরে গেলুম। কিন্তু হেরে গিয়েও ভাল লাগল। কাল যখন আগ্রায় এসে নেমেছিলুম তখন এই ললিতা বৌদির নামও আমি জানতুম না। আজ তাঁর অনুরোধ আমি ফেলতে পারলুম না। কোন দিন পারব বলেও মনে হয় না। আমার স্মৃতির খাতায় নাম তাঁর পাকা হয়ে গেছে।

আমি এসেছিলুম জ্ঞানশঙ্করবাবুর বোনের বাড়ি। বোনের উপযুক্ত ছেলেকে কর্তা পোষ্য নিয়েছিলেন। সেই ছেলে আজ বেঁচে নেই। কিন্তু বৌদি আছেন। বিধবা ললিতা বৌদি।

কর্তার বোনকে আমি মাসিমা বলে ডাকলুম। তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। অবিশ্রাম কান্না। দু বছর আগে তাঁর ছেলে মারা গেছে। মনে হল, দু বছরের জমা কান্না কাঁদছেন।

কিন্তু ললিতা বৌদিকে কাঁদতে দেখলুম না। যা দেখলুম, তা প্রসন্ন হাসি। এতটুকু দুঃখের ছোঁয়া তাতে নেই। বললেন: আগ্রা দেখেছেন ঠাকুরপো? দেখেন নি? বেশ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু বেড়ানো হবে। ঘরের ভেতর একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি।

গলা নামিয়ে বললেন: বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন! শ্বশুর দোকান নিয়ে ব্যস্ত, আর ইনি—

বলেই বৌদি চুপ করলেন।

ধবধবে সাদা থান পরা বৌদি। বয়স কতই বা হবে, আমার চেয়ে নিশ্চয়ই কম। আমি তাঁর অলক্ষিতে একবার ভাল করে তাঁকে দেখলুম। প্রাণশক্তি কি তাঁর ঝিমিয়ে গেছে, না সেই শক্তি তিনি দাবিয়ে রেখেছেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এত বড় বাড়িতে মানুষ মাত্র দুটি। মাসিমা আর ললিতা বৌদি। মেসোমশাই তো ব্যবসা নিয়েই সারা ক্ষণ মেতে আছেন। কিন্তু কার জন্য এত পরিশ্রম? মাসিমা নাকি মাঝে মাঝেই এই প্রশ্ন করেন। পরিশ্রম কি মানুষের জন্য? মেসোমশাই তার উত্তর দেন। ও তো একটা অভ্যাস। নেশার মতো পরিশ্রমের অভ্যাসও মানুষ পেয়ে বসে। কাজেই বাড়িতে থাকেন দুটি মানুষ। মাসিমা আর ললিতা বৌদি। মাসিমা কাঁদেন, ললিতা বৌদি কী করেন জানতে এখনও বাকি আছে।

কী ভাবছেন ঠাকুরপো?

প্রশ্ন করলেন ললিতা বৌদি। আর আমি উত্তর দিলুম : আপনার কথাই ভাবছি।

সর্বনাশ! দু দিনের জন্যে বেড়াতে এসে আপনিও কি চোখের জল ফেলছেন আমার জন্যে?

ভয় নেই বৌদি, চোখে আমার জল নেই। থাকলে হয়ত সুবিধে হত। সময় অসময়ে কাজে লাগাতে পারতুম।

যা বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওটার অভাব অনুভব করি। মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা ফেলতে পারলে কিছু বদনামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম।

বদনাম কিসের?

এখনও শোনেন নি নাকি?

কালই তো এসেছি, মেলামেশাও করি নি কারও সঙ্গে। বদনাম কোথায় শুনব?

বৌদি বেশ উপভোগ করলেন আমার কথা, বললেন : একেবারেই ছেলেমানুষ আছেন দেখছি।

আমি স্বীকার করলুম : তা সত্যি। সংসার নেই, সংসারের অভিজ্ঞতাও আমার হয় নি।

না না, আমি তা বলছি না। দেখছেন না আমার শাশুড়িকে। সারা দিন সকলের সামনে কাঁদছেন। তাঁরই পাশে আমার চোখ একেবারে শুকনো। আমি কাঁদতে পারি নে। আপনি আমার বদনাম করবেন না?

বলেই উত্তর চাইলেন আমার কাছে।

বললুম : চোখের জল কি মন থেকে আসে?

আমিও তো সেই কথাই জানতে চাই। আকাশের জলের উৎস জানি মেঘ। ঠাণ্ডা পেলেই ঝরে পড়ে। আমার মনে কি কোন মেঘ নেই?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন বৌদি, পরক্ষণেই সামলে নিলেন,

বললেন : কী ভুলই করছি বলুন। চোখের জল কোথা থেকে আসে না জেনেই তর্ক করছি। আপনি জানেন ঠাকুরপো ?

বললুম : জানি না, কোন দিন ভেবেও দেখি নি।

বৌদি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন : ভেবে দেখা আমাদের উচিত, তাই নয় কি ?

হঠাৎ আমার মনে হল, গলাটা যেন ভিজে ঠেকছে। ঢোক গিলতে কনকন করে উঠল কণ্ঠনালীটা।

বৌদি হেসে ফেললেন, বললেন : আপনিও দেখছি ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষির কি দেখলেন ?

চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল কেন ?

আপনার দেখছি ঈগলের দৃষ্টি।

তার চেয়ে আসুন, পরামর্শ করে বেড়াবার একটা প্রোগ্রাম করি : আগ্রার ধোঁয়া আর ধুলোই তো শুধু দেখলেন। সত্যিকার আগ্রারও কিছু দেখুন।

যেতে যখন দেবেন না, তখন দেখেই যাই কিছু। কিন্তু কী দেখাবেন বলুন তো !

বিনি পয়সায় গাইডের কাজ করতে পারব না। এখানে সরকারী গাইডের ফী কত জানেন ? সারা দিনের জন্য বার টাকা, আর এক বেলার জন্যে আট। শুধু ফোর্ট দেখতেই আড়াই টাকা, চার জনের বেশি হলে পৌনে চার, আর পাঁচ টাকা দিতে হবে আট জনের জন্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাইড নিলে অবশ্য আদ্ধেক খরচ। খরচ করতে রাজী আছেন ?

বলে বৌদি হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম : এ আপনার যোগ্য ফী হল না।

তবে মোটা রকমেরই কিছু দেবেন।

তার পরেই বললেন : কিন্তু বেরোবার মতটা আপনাকে আদায় করতে হবে।

বৌদির মুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম : আচ্ছা।

দুপুরে মেসোমশাই যখন খেতে এসেছিলেন, বেড়াবার মত আমি চেয়ে নিলুম। বৌদিকে সঙ্গে দিতে মাসিমার কিছু আপত্তি ছিল। বৌদি তখনই তা মেনে নেওয়াতেই মাসিমা রাজী হয়ে গেলেন।

একখানা টাঙ্গায় বসে বৌদি হেসেই আকুল।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : অত হাসি কিসের বৌদি ?

আমার শাশুড়িকে দেখলেন তো !

তা তো দেখলুম, কিন্তু অত হাসবার কী আছে ?

হাসি না থামিয়েই বৌদি বললেন : আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ বললে রাগ করব, সে বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বললুম : এবারে গড়ে পিটে একটু মানুষ করে নিন।

তাই করতে হবে দেখছি।

একটু থেমে বললেন : আমার শাশুড়ির সন্দেহটা লক্ষ্য করেন নি ? তিনি ঠিক টের পেয়েছিলেন যে আপনাকে যেতে না দিয়ে বেড়াবার ফন্দিটা আমিই দিয়েছি। তাইতেই তাঁর আপত্তি ছিল আমাকে বেরোতে দেবার। তখনি আমি তাঁর মতে মত না দিলে তিনি আপনার সঙ্গে এক জন দোকানের কর্মচারী দেবার প্রস্তাব করতেন। কর্তা ভাবতেন, দোকানে এক জন কর্মচারীর প্রয়োজন আপনার বেড়াবার প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি। সেই কথাটি প্রকাশ করে ফেললেই বিপদ হত। শাশুড়ি ঠাকরুণের মতে দোকান করাটাই এই সংসারের সব চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ। কাজেই কুরুক্ষেত্র বাধত আনিবার্য ভাবে।

ঠিক এই রকম কথা আমি আর কার মুখে শুনেছি মনে করতে পারছি নে।

আমাদের কথা ?

আপনাদের নয়। শুনেছি অন্য কোনও পরিবারের কথা। গিন্নী

নাকি ভাবেন, তাঁর তদারকের জন্যেই সংসারটা চলছে, আর কর্তার উদয়াস্ত খাটুনি তাঁর স্বভাবের দোষে। সংসারের কাটি ভেঙে যিনি কুটো করেন না, সংসারের জন্যে তাঁর আবার প্রয়োজন কিসের।

পাশে চেয়ে দেখলুম, বৌদির মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। অতর্কিতে তাঁর কোথায় আঘাত দিয়ে ফেলেছি জানি না। দুঃখ হয় নিজের অসাবধানতার জন্য। বললুম: আগ্রা বড় নোংরা শহর, তাই না বৌদি?

বৌদি সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। বললেন: এ কি আজকের শহর ঠাকুরপো! এ শহর মোগল বাদশাহের তৈরি।

বললুম: সর্বনাশ! আপনারও দেখছি পুরাতত্ত্বের জ্ঞান টনটনে।

বৌদি হেসে বললেন: কার কথা মনে পড়ল?

আমিও হেসে জবাব দিলুম: স্বাতির।

বৌদি কৌতূহলী হয়ে বললেন: স্বাতির নাম তো শুনি নি ঠাকুরপো। এ আবার কে?

একটি মেয়ে।

আকাশের তারা যে নয় তা তো বুঝতেই পারছি। মুঠোর ভেতর, না নাগালের বাইরে?

নিজের বোন কিনা জিজ্ঞেস করলেন না?

আমার এটুকু খবর বৌদি রাখেন, বললেন: আপনার আত্মীয় যে কেউ নেই, সে কথা আমরা জানি। বলুন এবারে।

বললুম: কী হলে মুঠোর ভেতর বলে, তা জানতে যে বাকি আছে বৌদি।

বৌদি হেসে বললেন: ভগবানের এমনি মায়া যে ঐ জ্ঞানটিই চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় না। প্রেমের কোন শাস্ত্র নেই, ব্যাকরণ নেই। অধ্যয়ন অধ্যাপনার অবকাশ এর ভেতর নেই।

বলেই আমার দিকে চেয়ে ধমক দিলেন, বললেন: বলুন, দেরি করবেন না।

হেসে বললুম : এই ঝাঁকুনির ভেতর স্বাতির গল্প ঠিক জমবে না। তার ওপর পূর্ণিমা পর্যন্ত যখন আছি—

অত দিন অপেক্ষা করব আমি ?

আমার প্রস্তাব বৌদির পছন্দ হল না।

বললুম : তার আগেই না হয় বলব। এখন থাক্।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমি বললুম : মহাভারতে এক শহরের নাম পেয়েছিলুম অগ্রবণ। পণ্ডিত মশাই তার মানে বলেছিলেন বনস্য বৃন্দাবনস্য অগ্রম্ ইতি। তাঁর মতে এই আগ্রাই মহাভারতের অগ্রবণ। টলেমির ম্যাপ আমি দেখি নি। কিন্তু শুনেছি যে তাতে আগারা নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে।

আমার ভুল ধরলেন, এই তো! কিন্তু মুখ্যু মেয়ের ভুল ধরে কি আপনার গৌরব বাড়বে ঠাকুরপো ?

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম : ছি ছি! আপনি এ কী বলছেন! আমি বিদ্যার বড়াই করব আপনার কাছে!

তবে ?

এ সব আমারই উদ্ভট শখ।

পাহাড়ী ঝর্ণার মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেন ললিতা বৌদি। তাঁর হাসির উচ্ছ্বাসে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলুম।

বললেন : শুধু শুধু বেচারি স্বাতির দোষ দিচ্ছিলেন। পুরাতত্ত্বের শখ স্বাতির, না আপনার ?

হেরে গিয়ে আমি হার স্বীকার করতে রাজী হলুম না। বললুম : জাতের জন্যে ওকালতি করছেন বুঝি ?

বৌদি তখনই উত্তর দিলেন, বললেন : আক্রমণ করতে হয়, সামনে করুন। আড়ালের মানুষকে টানাটানি করলে আমি আপত্তি করবই।

বললুম : ঘাট হয়েছে, আর করব না।

বৌদি খুশী হয়ে বললেন : এইবারে বলুন আপনার পুরাতত্ত্বের কথা।

সব কথা কি আর মনে আছে। তবে যত দূর জানি, বর্তমান আগ্রার পত্তন করেন সিকন্দর লোদী। দিল্লী থেকে যমুনার স্রোত বেয়ে যখন নেমে আসেন, এই স্থানটি তাঁর পছন্দ হয়। পছন্দ হতেই নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান। বছর না ঘুরতেই ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল সেই রাজধানী। বাদশাহ তবু দমলেন না, নতুন করে আবার রাজধানী গড়লেন।

বৌদি বললেন: আমরা কত ভুল জানি দেখুন। আগ্রার প্রায় সবাই বলে যে এই শহর ছিল আকবর বাদশাহর।

বললুম: সে কথাও তো মিথ্যে নয়। যে কেল্লায় আমরা যাচ্ছি সে তো আকবর বাদশাহরই তৈরি। তাঁর সময়েই ছিল আগ্রার চরম সম্মান। কিন্তু মোগল বাদশাহরা তার আগেও এ শহরে ছিলেন। যমুনার পরপারে শুনেছি এক আরামবাগ আছে, বাবরের তৈরি বাগান। তাঁর শবদেহ কাবুলে নিয়ে যাবার আগে নাকি এইখানেই রাখা হয়েছিল।

বাধা দিয়ে বৌদি অন্য কথা বললেন: আমরা রামবাগ বলি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ নাকি নূরজাহানের জন্যে তৈরি করেছিলেন। কাবুলের কী একটা বাগানের ঢঙে তৈরি।

পর ক্ষণেই বললেন: যমুনার ওপারেও এক দিন যেতে হবে। রামবাগ বা চিনি-কা-রৌজা না দেখলে ক্ষতি নেই, ইৎমদ-উদ্-দৌলা দেখবার জিনিস।

ইৎমদ-উদ্-দৌলার নাম আমি শুনেছি। ছ বছর ধরে নূরজাহান নির্মাণ করেছিলেন তাঁর মা ও বাপ মির্জা ঘিয়াস বেগের কবর। বিরাট বাগানের মাঝখানে লাল পাথরের বেদীর ওপর শাদা মার্বল পাথরের অপূর্ব অট্টালিকা। মমতাজ বেগমের বাপ মায়ের কবরও নাকি এইখানে।

চিনি-কা-রৌজার নাম আমি শুনি নি।

বৌদি বললেন: না শুনলে ক্ষতি নেই কিছুই। যমুনার পুল

পেরিয়ে বাঁ দিকে আলিগড়ের রাস্তা ধরলে বাঁ হাতে প্রথমে ইৎমদ-উদ্-দৌলা, তার পর চিনি-কা-রৌজা আর রামবাগ। সবই কাছাকাছি। শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আফজল খানের কবর এই চিনি-কা-রৌজায়।

গল্পে গল্পে কখন আমরা ফোর্টের গেটে পৌঁছে গিয়েছি খেয়াল করি নি। খেয়াল হল টাঙ্গাওয়ালার কথায়। বলল, কাছেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

ললিতা বৌদি বললেন : এই হল অমর সিং গেট।

এই নাম আমার কাছে খুব বেসুরো লাগল। দিল্লী গেট লাহোর গেট কাশ্মীরী গেট শোনার অভ্যাস আছে। কিন্তু কোন মোগল দুর্গে হিন্দু নাম ব্যবহারের নজির আমার জানা নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বৌদি বললেন : আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ?

বললুম : এই নাম শুনে।

তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে !

যত দূর জানি, আকবর বাদশাহের বয়স যখন ষোল বছর, তখন তিনি এই দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানও এই দুর্গের নানা উন্নতি সাধন করেছেন। কিন্তু এই গেটের অমর সিং নাম কেন হল বুঝতে পারছি না।

ললিতা বৌদি কৌতুক বোধ করে বললেন : আপনাকে নিয়ে ভারি বিপদ তো !

কেন ?

এই সব নাম নিয়ে যদি গবেষণা শুরু করেন, তাহলে বিপদ নয় !

তার চেয়েও বেশি বিপদ, যখন উত্তর দিতে না পারলে কেউ টিটকিরি দেয়।

সে রকম মানুষও আছে নাকি ?

বললুম : দিল্লীতে আছে।

ললিতা বৌদি হেসে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার পুরাতত্ত্ব কী বলে ?

ইতিহাসে এক অমর সিংএর নাম আমি পেয়েছি। রাণা

প্রতাপের অযোগ্য পুত্র অমর সিং। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যার পিতা পর্বতে কন্দরে অনাহারে অনিদ্রায় জীবন কাটালেন, সেই রাণারই পুত্র হয়ে বিলাসী অমর সিং নিজের সুখের জন্যে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। মেবার জয়ে আকবর ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর এই অমর সিং তাঁরই পুত্র জাহাঙ্গীরকে মেবার উপঢৌকন দিয়েছিল। রাজধানীতে ফিরে এসে জাহাঙ্গীর যদি এই সিংহদ্বারের নাম রাখেন অমর সিং গেট, তাহলে আপত্তির কোন কারণ নেই। আমি সংক্ষেপে বললুম: মেবারের রাণা ছিলেন অমর সিং। জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁকে জয় করেন।

বৌদি হেসে বললেন: তবে আর স্বাতির দোষ কী?

উত্তরে আমিও হাসলুম।

তত ক্ষণে গাইডরা আমাদের ছেঁকে ধরেছিল। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস দু রকম গাইডই আছে। মন্দিরের পাণ্ডার মতো তাদের ব্যবহার। বললুম: ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে আমার চলবে না। আমার স্পেশাল ক্লাস চাই।

বলে বৌদির দিকে তাকালুম।

বৌদি গম্ভীর হয়ে বললেন: চলনসই গাইড আমাদের সঙ্গেই আছে।

বলে দৃষ্টি দিয়ে আমার রসিকতাটুকু ফিরিয়ে দিলেন।

সোজা পথ বেয়ে আমরা উপরে উঠছিলুম। বৌদি বললেন: এই ভাবে উঠে গেলেই আমরা দেওয়ান-ই-আমে পৌঁছে যাব।

আমি নূতন জিনিস দেখছি বলে আমার মনে হচ্ছিল না, অথচ আগ্রায় আমি এর আগে কখনও আসি নি। কেন এমন হল, এই কথা ভাবতে গিয়ে আমার কিছু দিন আগের কথা মনে পড়ল। পূজার পরে দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসে আমার মনে নূতন রঙ লেগেছিল। কোন নেশায় বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় নি, মাতাল হয় নি

অনুরাগে। এই দেশ যে এত সুন্দর সেই কথা প্রথম জেনেছিলুম, জীবনের দিগন্ত সহসা প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আনন্দ যখন থিতিয়ে গেল, তখন আমি গোটা দেশটা জানবার জন্যে যত্ন নিলুম। শুধু ভ্রমণ কাহিনী নয়, সরকারী বেসরকারী নানা গাইড বই সংগ্রহ করে পড়ে ফেললুম। আর কিছু প্রাচীন গ্রন্থ। অল্প দিনেই গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণা হয়ে গেল। চোখে না দেখেও এই সব জায়গা তাই পুরনো বলে মনে হচ্ছে।

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন: এই দুর্গের পরিধি কত জানেন?

না।

প্রায় দেড় মাইল। চারি দিকের দেওয়াল যে সত্তর ফুট উঁচু, না বলে দিলে তা ঠিক বোঝা যায় না। দেওয়ালও দেখুন একটা নয়, চল্লিশ ফুট তফাতে আর একটা দেওয়াল পাশাপাশি চলেছে। মাঝখনটা ভরাট। বন্দুক চালাবার ফুটো দেখছেন চারি দিকে?

তা দেখছি। কিন্তু দুর্গের দরজা কি মাত্র একটি?

বৌদি বললেন: দরজা চারটিই ছিল। এখন দুটি আছে। দিল্লী গেট আর অমর সিং গেট। একটা উত্তরে, আর এইটে দক্ষিণে।

সবাই জানে যে আকবর বাদশাহই এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেও যে এইখানে একটা দুর্গ ছিল, সে কথা অনেকেরই জানা নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে চৌহানদের প্রাসাদ বাদলগড় এই জায়গাতেই ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা ভূমিকম্পে সেই প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। আকবর সেই ভাঙা প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে এই দুর্গ নির্মাণ করেছেন। এই রকম অনুমানের সপক্ষে যুক্তি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন যে যমুনার তীরে একটি প্রাচীন দুর্গ ভেঙে ফেলে সেই জায়গাতেই তাঁর পিতা একটি লাল পাথরের দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কাবুলের শাসনকর্তা মহম্মদ কাশিম খানের উপর

আকবর এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। কাজ হয়েছিল আট বছর ধরে। খরচেরও একটা হিসাব পাওয়া গেছে। কত আকবরী-তঙ্খা জানা নেই, কিন্তু বিলাতী হিসাবে দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিঙের কম হবে না।

সব চেয়ে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে আকবরের বয়স তখন ষোল বছরের কম। পাঠানদের শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদী আগ্রায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর তাঁকে পরাজিত করে এই শহর অধিকার করেন। কোহিনুর তখন আগ্রায় ছিল, বাবর সেই কোহিনুর লাভ করেন। কিন্তু হুমায়ুন তাঁর পিতা বাবরের সৌভাগ্য ভোগ করতে পারেন না। শের শাহ তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। হতভাগ্য হুমায়ুন যখন শের শাহর ভয়ে পারস্যে পলায়ন করছিলেন, তখন সিন্ধুর মরুভূমিতে জন্ম হয়েছিল আকবরের। হুমায়ুনের গৃহহারা বেগম হামিদা বানু তাঁর নবজাত শিশু আকবরকে কালো বোরখার নিচে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই শিশুই আপন বীর্যে তখ্‌তে বসেছিলেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে। আর তার দু বছর পরেই এই দুর্গ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন

প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে দেওয়ান-ই-আম সাধারণ দরবার। প্রজারা এখানে আসত তাদের প্রার্থনা ও অনুযোগ নিয়ে। অসংখ্য লোকের সমাবেশের উপযোগী করে এই দরবার তৈরি হয়েছিল। এটি কার কীর্তি এ নিয়ে বিরোধ আছে। কেউ বলে আকবরের, কেউ জাহাঙ্গীরের নাম করে। ঔরঙ্গজেবের কীর্তিও বলেন কেউ। আবার যুক্তি দিয়ে শাহজাহানের কীর্তি বলেও অনেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। স্থাপত্য বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী তাঁরা সব কিছু পরীক্ষা করে শেষ মতটাই সমর্থন করে থাকেন। আমিও এটি ভাল করে দেখে কিছু বোঝবার চেষ্টা করছিলুম।

বৌদি বললেন: হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন?

ভাবছি।

কোন গোপন কথা না হলে জোরে জোরেই ভাবুন না। ·

বললুম : এই দেওয়ান-ই-আম কোন্ বাদশাহর তৈরি তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

বৌদি হেসে ফেললেন : এ আবার ভাববার জিনিস, না ভেবে কোন দিন ইতিহাস বোঝা যায়! আকবর যখন দুর্গ তৈরি করেছেন, তখন এটিও তাঁর তৈরি, এই কথা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন না!

বললুম : আকবরের মতো প্রজাবৎসল বাদশাহ এই রকম একটি সুন্দর জায়গায় প্রতিদিন প্রজাদের সঙ্গে মিলিত হতেন, এ খুবই সঙ্গত কথা। কিন্তু বাদশাহনামার লেখক কী বলেছেন জানেন?

না।

তাহলে ভাল করে লক্ষ্য করুন। বাহির থেকে লাল পাথরের এই সৌধটি যেমন সাদা সিধে মনে হচ্ছে, ভেতরটি তেমন নয়।

ডবল থামের উপর খাঁজ কাটা খিলান, লম্বায় নয় সারি, চওড়ার দিকে তিন। শ দুই ফুট যে দীর্ঘ হবে তাতে সন্দেহ নেই। এটি যে কোন বাদশাহর তৈরি হতে পারে। আমরা ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়ে পূর্বের দেওয়ালে বাদশাহর সিংহাসন রাখার জায়গাটির কাছে পৌঁছলুম।

প্রথমে একটি নিচু বেদীর উপরে উজীরের বসবার স্থান রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা। উজীর হলেন প্রধান মন্ত্রী। প্রজাদের দরখাস্ত নিয়ে তা পড়ে বাদশাহর দিকে বাড়িয়ে দেবেন। তাঁর আসন উঁচু বেদীর উপরে। দু ধারে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শ্বেত পাথরের ঝরোকা। অন্দরের মানুষকে দেখা যাবে না, কিন্তু তাঁরা সব কিছু পরিষ্কার ভাবে দেখবেন। সব মিলিয়ে মোগল স্থাপত্যের এমন অপূর্ব নিদর্শন যে শাহজাহানের তৈরি তাতে আর সন্দেহ থাকে না। শাহজাহান তো

শুধু বাদশাহ ছিলেন না, তিনি শিল্পীও ছিলেন। ভাল করে লক্ষ্য করে বৌদিও স্বীকার করলেন: এটি অন্য হাতের।

বললুম: পরে এটি জোড়া বলে তো মনে হচ্ছে না।

মাথা নেড়ে বৌদি বললেন: অত ভাবতে পারছি নে।

হেসে বললুম: তাহলে বার্নিয়ারের একটা গল্প বলি।

বার্নিয়ার কে?

একজন ফরাসী পর্যটক। বিদেশীরা মাঝে মাঝেই আসতেন মোগল দরবারে। তাঁদেরই ভ্রমণ-কাহিনীতে আমরা অনেক কথা জানতে পারি। বার্নিয়ার লিখেছেন যে বাদশাহ প্রতি দিন দ্বিপ্রহরে এইখানে তাঁর সিংহাসনে বসতেন। ছেলেরা বসত দুধারে, আর খোজারা বড় বড় ময়ূরপুচ্ছে পাখা দিয়ে মাছি তাড়াত। নিচে দাঁড়াতেন বড় বড় ওমরাহ আর রাজারা, আরও নিচে মনসব-দারেরা।

বড় বড় রাজা ও ওমরাহরা সব দাঁড়িয়ে থাকতেন?

শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়। মাথা নিচু করে, বোধ হয় হাত জোড় করে।

আশ্চর্য হয়ে বৌদি বললেন: তাঁরা অপমান বোধ করতেন না?

বোধ হয় এইটিই ছিল আদব কায়দা, কিংবা ভয়ে এই অপমান গায়ে মাখতেন না।

তার পর?

এই সব যুগের স্বদেশী বৃত্তান্ত আছে। সে সব পড়ি নি। একটা গাইড বইএ আর একটি গল্প পড়েছি। হেরাটের মোল্লা আবদুল্লা হরবির গল্প। দেওয়ান-ই-আমের জাঁক জমকের কথা তিনি আরও বিশদ ভাবে লিখেছেন। দু ধারে জরির ঝালর ঝুলত, দু সারি ঘোড় সওয়ার আর দু সারি তলোয়ারধারী দাঁড়াত, আর দো হাজারী আর চার হাজারীরা।

সে আবার কী?

দো হাজারী মানে যাঁদের দু হাজার ঘোড় সওয়ার আছে। যত বড় ওমরাহ তাঁর তত বেশি ঘোড় সওয়ার।

কী করবে তারা?

হেসে বললুম: বাদশাহর জন্যে লড়তে যাবে। আর শান্তির দিনে দরবারে বসবে আগে পিছনে।

বসবে আর কোথায়! সবাইকেই তো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বললুম: শুনুন তার পর। যে বেচারা আর্জি নিয়ে এসেছে, সে এগোবে মাঝখানের পথ দিয়ে। এই যে ছটা সিঁড়ি ভেঙে আমরা ওপরে এলুম, তার প্রথমটায় পৌঁছে প্রথম কুর্ণিশ করবে, দ্বিতীয়টায় পৌঁছে আর একটা কুর্ণিশ। একজন এসে এইখান থেকে তাকে উজীরের কাছে নিয়ে যাবে। সে বেচারা নিজের আর্জি উজীরের হাতে দিয়ে তৃতীয় বার কুর্ণিশ করবে। মাথা সর্বদা নিচে থাকবে, বাদশাহর মুখের দিকে চোখ তুলতে পারবে না। রক্ষী ঘোষণা করবে, তুমি এখন ত্রিভুবনের সূর্য বাদশাহর সামনে মাটির দিকে তাকিয়ে তোমার সম্মান জানাও। ইতিমধ্যে উজির সেই আর্জি পড়ে বাদশাহর সিংহাসনের পায়ে পেশ করবেন, বুঝিয়ে দেবেন বাদশাহকে।

ললিতা বৌদি হেসে বললেন: বুঝেছি, এবারে অন্যত্র চলুন। এমনি করে দেখতে গেলে দেখা আমাদের শেষ হবে না।

বেলার দিকে তাকিয়ে বললুম: সত্যি কথা।

বৌদি বললেন: ফোর্ট সারা দিন খোলা থাকে না। শীত গ্রীষ্মেও সময়ের তফাৎ আছে। এখনও শীতের সময়। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বৈশাখ থেকে গ্রীষ্মকাল, তখন বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছুটি।

বললুম: আসুন তাহলে, তাড়াতাড়ি দেখে নিই।

দেওয়ান-ই-আমের পশ্চিমে সেলিম গড়। দোতলায় নাকি সুন্দর কারুকার্য আছে, কিন্তু আমরা উপরে উঠলুম না। দাউসন সাহেব

বলেছেন যে ভাল ঘরটা নাকি ভেঙে গেছে। লোকে বলে জাহাঙ্গীর এটি তৈরি করেছিলেন। বাদশাহ যখন দেওয়ান-ই-আমে আসতেন তখন এইখান থেকে নহবৎ বাজত।

হউজ-ই-জাহাঙ্গীরী নামে একটি পাথরের স্নানের জায়গা দেখলুম। ফার্সি অক্ষরে নাকি জাহাঙ্গীরের নামে লেখা আছে। জাহাঙ্গীরের জন্মোৎসবে এটি আকবর নির্মাণ করেছিলেন, না জাহাঙ্গীর নিজে নির্মাণ করেছিলেন তাঁর নবপরিণীতা নূরজাহান বেগমের জন্যে, তা জানা যায় না।

আকবরের প্রাসাদ এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এরই উত্তরে তাঁর বাঙ্গালা প্রাসাদ। কোন্ বিখ্যাত কাব্য রচনার জন্য আসর-ই-আকবরীতে এর উল্লেখ আছে, সে গল্প আমাদের জানা নেই।

বিরাট এক অট্টালিকার নাম জাহাঙ্গীরী মহল। স্থাপত্যে যাঁদের দখল আছে, তাঁরা বলতে পারবেন, এর কতটা হিন্দু স্থাপত্য ও কতটা এসেছে মধ্য এশিয়া থেকে। একটা ঘর শুনলুম যোধ বাঈএর প্রসাধন কক্ষ, আর একটা ঠাকুর ঘর। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী ও মা দুজনেই ছিলেন হিন্দু নারী।

এই অট্টালিকারই উত্তরের অংশ শাহজাহান নূতন করে গড়েছিলেন। তাই এর নাম হয়েছে শাহজাহানী মহল। এরই মাথায় যে চূড়া আছে, সেই খান থেকে নাকি বাদশাহ হাতির লড়াই দেখতেন। কেউ অন্য কথা বলে, এক সাধু নাকি আকবর বাদশাহকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এইখানে।

এরই উত্তরে খাসমহল। পুরনো ঘর বাড়ি ভেঙে শাহজাহান এই অপূর্ব মহলটি নির্মাণ করেছিলেন যমুনার ধারে। হারেমের বেগমদের জন্য যে এটি করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শিস মহলে তাঁরা স্নান করতেন, আর আঙ্গুরী বাগে নামতেন সন্ধ্যা বেলায়। গ্রীষ্মকালে টেহ খানায় গিয়ে আশ্রয় নিতেন।

এই জায়গাগুলো দেখবার সময় বৌদি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। খাস মহলের দক্ষিণ দিকের অলিন্দটি দেখবার সময় একজন গাইড একটি পরিবারকে বলছিল যে সেই খান থেকে নাকি শাহজাহান প্রতি দিন তাঁর প্রজাদের দর্শন দিতেন। এ কথা শুনে বৌদি বললেন: সে যুগেও কি এই দর্শন দেবার রীতি ছিল?

বললুম: এ চির কালের রীতি। সে যুগে রাজা বাদশাহেরা দর্শন দিতেন, সাধক ও মহাপুরুষেরাও কোন সময় দিয়েছেন। এখন চিত্র তারকাদের দর্শন দেবার সময় এসেছে।

বৌদি বললেন: এ তো অভিমানের কথা। যে ভাবেই হোক, জনসাধারণের মন তারা জয় করেছে। পরশ্রীকাতর হলে তো পুরুষের চলবে না!

আমি চমকে উঠেছিলুম, মনে হয়েছিল যে বৌদি একটা ভাববার মতো সত্য কথা বলেছেন। জনসাধারণের নিজের কোন রুচি নেই। যে তাদের আকৃষ্ট করতে পারে, তারা তারই।

বৌদি বললেন: আবার ভাবতে লেগেছেন তো!

উত্তরে আমি বললুম: বলুন না কী জানতে চান।

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন: শিস মহল কি বেগমদের প্রসাধনের জায়গা?

এখানকার শিস মহল দেখে এটি স্নানের ঘর বলে মনে হচ্ছে। পাশাপাশি দুটো ঘরেই পাথরের চৌবাচ্চা আর ফোয়ারা দেখেছেন?

দেখেছি।

ছোট ছোট আয়না দিয়ে মোড়া দেওয়াল! এক মানুষ অসংখ্য হয়ে স্নান করছে। এ সব বাদশাহী শখ আমরা বুঝব না।

এমন অদ্ভুত শখ কোথা থেকে এল!

শুনেছি মেসোপটিমিয়া থেকে।

টেহ খানা কথাটা আমরা নূতন শিখলুম। খাস মহলেরই দক্ষিণ দিকে ধাপে ধাপে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নিচে। বসবাসের জন্য সেখানে শীতল ঘর আছে। সে যুগে পাহাড়ে যাবার সুবিধা ছিল না। হয় জলের উপর প্রাসাদ গড়, যেমন উদয়পুরে। নয় মাটির নিচে ঘর কর, যেমন এই খানে।

আঙ্গুরী বাগে আর আঙ্গুরের চাষ নেই। সেদিন হয় তো এই দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরে থাকত, কিন্তু আজ সে কথা প্রমাণ করবার জন্য একটি গাছও বেঁচে নেই।

বিদেশীরা বলেন যে মুসম্মন বুর্জ জাহাঙ্গীর বাদশাহ তৈরি করেছিলেন নূরজাহান বেগমের জন্য। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে এই আটকোণা দোতলা বুরুজটি শাহজাহান তৈরি করেছিলেন মমতাজ বেগমের জন্য। এমন সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য করা প্রকোষ্ঠ আর নেই। নকশার গায়ে আজ আর পুরনো চুনী পান্না কিছু নেই। ১৭৬১ সালে ভরতপুরের জাঠেরা সব খুলে নিয়ে গেছে। তবু একে বিদেশীরা বলেছেন, hanging like a fairy bower over the grim ramparts.

দেওয়ান-ই-খাস দেওয়ান-ই-আমের মতো বিরাট কিছু নয়। দুটি মাত্র ঘর। বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ ও বিদেশী রাজদূতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শাহজাহান এটি নির্মাণ করেন। এরই সামনে দুটি সিংহাসন আছে। একটি শ্বেত পাথরের, অপরটি কালো। ফার্সি লেখকেরা বলেছিলেন, এটি সঙ্গ-ই-মহক, মানে বোধ হয় কষ্টি পাথর। এ দেশের স্যাকরারা এতে সোনা কষতে পারে। এই সিংহাসনে বসে বাদশাহরা যমুনা দেখতেন।

বৌদি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: মচ্ছি ভবন নাম কেন হল বলতে পারেন?

আমি বললুম: মচ্ছি মানে তো মাছ।

ঠিক বলেছেন। জলের নালা দিয়ে এখানে নানা রঙের মাছ ভেসে বেড়াত।

কিন্তু এত বড় উঠোনের চারি দিকে এই সব ঘর কেন?

বৌদি বললেন: মীনা-বাজার। উৎসবের দিনে এখানে বাজার বসত হারেমের বেগমদের জন্য। দেখছেন না খাস মহলের কত কাছে, আঙ্গুরী বাগের ভেতর দিয়ে বেগমরা স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করত।

মতি মসজিদ আমরা দূর থেকে দেখেছিলুম, কাছে যেতে বৌদি রাজী হন নি। মুখে কিছুই বলেন নি, কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিলেন। আমি এই মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত। মাদ্রাজে মামীমাও দূর থেকে গির্জা দেখেছিলেন। মনে মনে আমি হেসেছিলুম, কিন্তু তাঁর সংস্কারে আঘাত দিই নি।

মতি মানে মুক্তা। মুক্তার মতো সাদা এই মসজিদটি শাহজাহান সাত বৎসর ধরে তৈরি করেছিলেন।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বৌদি বললেন: এখানে ঔরঙ্গজেবের তৈরি কিছু দেখলাম না।

বললুম: দেখবার কথা নয়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হবার আগে শাহজাহানই তাঁর রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

তারপর এই শহরের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। ভরতপুরের জাঠেরা লুঠ করেছে, মারাঠারা অধিকার করে ছিল দীর্ঘ দিন। ১৭৭৩ সালে নজফ খান এই শহরের অধিকার আবার ফিরে পান।

ঠিক এই সময়ে আমার নাগিনা মসজিদের কথা মনে পড়ল। মচ্ছি ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে এই মসজিদটি বোধ হয় ঔরঙ্গজেব নির্মাণ করেছিলেন। যাঁরা শাহজাহানের কীর্তি বলে মনে করেন তাঁরা বোধ হয় ভুল করেন। হারেমের জেনানাদের জন্যই এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

দুর্গ বন্ধ হবার সময় হয়েছিল। যাত্রীরা সবাই চলেছিলেন গেটের দিকে। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলুম।

ঔরঙ্গজেবের কথায় আমার বন্দী শাহজাহানের কথা মনে পড়েছিল। শেষ বয়সে সেই শিল্পী বাদশাহ এই আগ্রার দুর্গে বন্দী ছিলেন। মুসম্মন বুর্জ থেকে তাজমহল দেখা যায়। লোকে বলে তাজের দিকে তাকিয়েই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। হতভাগ্য বাদশাহ!

ফেরার পথে ললিতা বৌদি বললেন : আগ্রার দুর্গ আমি অনেক বার দেখেছি, কিন্তু এমন করে দেখা কোন বারও হয় নি।

কেন ?

কী জানি, আমাদের দেখবার ধারাই বুঝি অন্য রকম।

এই মন্তব্যের কারণ আমি ধরতে পারি নি। তাই বলেছিলুম : একটু বুঝিয়ে বলুন।

বৌদি বললেন : আপনাকে বাধা দিয়ে আমি নিজেরই ক্ষতি করেছি আপনি যে ভাবে দেওয়ান-ই-আম দেখছিলেন, সেই রকম করে সমস্ত দুর্গটা দেখলে আমার মোগল ইতিহাসটাই জানা হয়ে যেত।

গাইডরাও তো এই রকম করেই দেখায়। এইখানে বসে বাদশাহ দাবা খেলতেন, আর এইটে শতরঞ্জের ছক। সুন্দরী মেয়েরা সেজে গুজে ঘুঁটি হয়ে দাঁড়াত। বাদশাহ বলতেন, এইবারে নৌকোর চাল—নৌকো অমনি মহানন্দে দুলে উঠত।

সহাস্যে বৌদি বললেন : এ সব আপনি কোথায় শুনলেন ?

সত্যি নয় ?

আমিও শুনেছি।

তাহলে আরও বলি। এই যে এই উঠোনটা দেখছেন, এইখানে নেচেছিল বৈজয়ন্তীমালা। আপনারা এই ছবিটা দেখেন নি ?

বুঝেছি বুঝেছি, আপনি পুকারের গল্প বলছেন। কিন্তু তার নায়িকার নাম যে ভুল হয়ে গেছে !

হেসে বললুম : জানি না বলেই আমার ভুল হয়েছে।

বৌদি এবারে গম্ভীর হয়ে বললেন : এই দুর্গের ভেতর দুটো শতাব্দীর ইতিহাস গাঁথা আছে, ভারতের ইতিহাসে সে খুবই শক্তিশালী যুগ। আমরা সেই যুগের কীর্তি দেখে বেড়াই, কিন্তু তার ইতিহাস জানবার কোন চেষ্টা করি না।

এই ইতিহাস তো আমাদের স্কুলের পাঠ্য।

সে নিতান্ত শুষ্ক নীরস ইতিহাস। জাহানারা কেন এই দুর্গের ভেতর কেঁদে মরে গেল, আর কুমারী জেব উন্নিসার নাম কেন কলঙ্কিত হল, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

গুলবদনের নামই হয় তো নেই।

সে কে?

হেসে বললুম : মোগল হারেমের একজন আদর্শ মহিলা।

আশ্চর্য হয়ে বৌদি বললেন : আমরা এঁর নামই শুনি নি।

খুবই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে পড়ে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার শুরু হয় মাত্র। জ্ঞানের যদি কোন ভাণ্ডার থাকে, তবে সেই ভাণ্ডারে প্রবেশের দরজা কী করে অতিক্রম করতে হবে, সেই নির্দেশ শুধু পাওয়া যায়। তার পরেও গাইডের দরকার। সে মাস্টার নয়, তাঁকে আমরা গুরু বলি। ধর্ম চর্চার মতো জ্ঞানার্জনের চেষ্টাতেও গুরু অপরিহার্য।

বৌদি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : গুরুর অভাবেই তো আমাদের শিক্ষা আজকাল অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। গুরু-দক্ষিণা তো পয়সা নয়, ভক্তি। দরকার হলে একলব্যের মতো নিজের বুড়ো আঙুলটি কেটে দিতে হয়।

বৌদি শিহরে উঠে বললেন : সে বড় সাংঘাতিক দক্ষিণা। অমন শিক্ষার কোন মূল্য নেই।

আমি প্রতিবাদ করলুম না। বললুম : তার চেয়ে আমি আপনাকে গুলবদনের গল্প বলি।

উৎসাহিত হয়ে বৌদি বললেন : সেই ভাল।

গুলবদন বাবরের কন্যা, হুমায়ুনের ভগিনী ও আকবরের পিসি। হুমায়ুন-নামা লিখে শুধু সাহিত্যে নয়, ইতিহাসেও নিজের যথাযোগ্য স্থান সংগ্রহ করেছেন। মোগল হারেমের অসংখ্য বেগমের মধ্যে তিনি হারিয়ে যান নি। শুনে আশ্চর্য হবেন যে আজ আমরা যে আকবর বাদশাহর মহানুভবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি ইতিহাসের কলঙ্ক তৈমুর লঙ্গের সপ্তম পুরুষ। তৈমুর খোঁড়া ছিলেন বলে তিনি তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত। তুরস্কের চঘতাই বংশের এই নায়ক সমরখন্দের আমীর ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দী শেষ হবার বছর দুই আগে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দিল্লী ও মীরাটকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে যান। পাণিপথের যুদ্ধে মামুদ তুঘলুক তাঁকে বাধা দিতে পারেন নি। এক লক্ষ হিন্দুকে তিনি বন্দী করেছিলেন এবং খেতে দিতে না পেরে তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁকে বাধা দিতে না পেরে নিজের হাতে স্ত্রী কন্যাদের হত্যা করে তৈমুরের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। যমুনার জলে নয়, রক্তের স্রোতে সেদিন দিল্লীতে বন্যা হয়েছিল।

এই তৈমুর লঙ্গ নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিদেশে রাজত্ব করতে চান নি। অতুল ঐশ্বর্য আর কিছু কলাকুশলী শিল্পী নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর তৈমুরের শিল্প প্রীতি ছিল, তাই তাঁর বংশের শিল্প প্রীতি আজও পৃথিবীতে অমর হয়ে আছে।

তৈমুরের পঞ্চম পুরুষ বাবর আবার এলেন ভারতবর্ষে। মাতামহের দিক থেকেও বাবর বিখ্যাত মোগল চেঙ্গিস খাঁর ত্রয়োদশ পুরুষ। মুঘল বাবর শব্দের মানে বাঘ। জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর নামেই আমাদের কাছে পরিচিত। এগার বৎসর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। সারা জীবন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। শুধু সমরখন্দ ও কাবুলে নয়, পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেছিলেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে আগ্রায় তাঁর

মৃত্যু হয়েছিল। তখন কাবুল থেকে বঙ্গদেশের সীমা পর্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে।

বাবরের মৃত্যু সম্বন্ধে গুলবদন যা লিখে গেছেন, তা সত্যিই অলৌকিক। বাবরের বেগম ছিলেন চার জন—দিল্‌দার মাহম্‌ গুল্‌রুখ ও মুবারিকা। মাহম্‌ ছিলেন পাটরাণী। তাঁরই পুত্র হুমায়ুন বাবরের প্রিয়তম সন্তান। এক দিন সংবাদ এল যে মথুরায় হুমায়ুন মৃত্যু শয্যায়। তাঁর জীবনের আর কোন আশা নেই। বাবর মাহম্‌কে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন ও অচেতন পুত্রকে আগ্রায় নিয়ে এলেন। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই তার উপকার হচ্ছে না, চেতনা ফিরে এসেও আসছে না। শেষ পর্যন্ত সবাই রায় দিলেন যে এখন খোদাতাল্লারই ইচ্ছা। কিন্তু বাবর হাল ছাড়লেন না। পুত্রের শিয়রে পায়চারি করতে করতে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন তাঁর জীবনের বিনিময়ে তাঁর পুত্র নিরাময় হয়। এক সময়ে তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, পেয়েছি। আমার ছেলের জীবন আমি ফিরে পেয়েছি। বাবর সত্যিই খোদার নির্দেশ পেয়েছিলেন। হুমায়ুন চোখ মেলে চাইলেন, উঠে দাঁড়ালেন। আর বাবর শুয়ে পড়লেন, তার পর চোখ বুঁজলেন। মৃত্যুর পূর্বে বাবর হুমায়ুনকে তাঁর বাদশাহী তখ্‌তে বসিয়ে গেলেন।

ললিতা বৌদি অনেক ক্ষণ কোন কথা কইলেন না, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন: এ গল্প কি সত্যি?

বললুম: ইতিহাসেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

কিন্তু—

আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

এ যুগে বোধ হয় এই রকম ঘটনা আর ঘটে না।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে ললিতা বৌদি বিধবা। তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে স্বামীর জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁর কথা শোনেন নি। বাবরের গল্প

বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হবে বৈকি। ললিতা বৌদির কথার উত্তর আমি তাই এড়িয়ে গিয়ে বললুম: বাবরের বাহিরটা যত কঠিন ছিল, ভিতরটা ছিল ততই কোমল।

বৌদি কোন কথাই কইলেন না।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: শুনে আশ্চর্য হবেন, বাবরের চরিত্রে ছিল অসাধারণ বিরুদ্ধ ভাব। অসম সাহসী এই যোদ্ধা এক জন শক্তিমান সাহিত্যিক ছিলেন। ফার্সি ভাষায় তাঁর কবিতা যেমন রমণীয়, তেমনি সুন্দর তাঁর তুর্কী ভাষায় লেখা আত্মজীবনী। শিল্প ও সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ছিল, আর মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক অন্তরঙ্গ।

কিন্তু বাবর তাঁর বীরত্বের সৌভাগ্য ভোগ করতে পারেন নি। ভোগ করতে পারেন নি তাঁর পুত্র হুমায়ুনও। গুলবদন ছিলেন তাঁর সৎ বোন, দিলদার বেগমের কন্যা। তিনি নিজে তার ভাইকে বলেছেন, হতভাগ্য হুমায়ুন।

বৌদির অন্যমনস্কতা হঠাৎ ভেঙে গেল, প্রশ্ন করলেন: কেন?

বললুম: হুমায়ুন বাদশাহ হয়েছিলেন তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু একটা দিনও শান্তিতে কাটাতে পারেন নি। এক দিকে গুজরাটের বাহাদুর শাহ, অন্য দিকে বিহারের আফগান নায়ক শের খাঁ। তার উপর তাঁর নিজের ভ্রাতারা সারাক্ষণ বিদ্রোহ করেছেন। ক্রমাগত নয় বৎসর হুমায়ুন শত্রু দমন করে রাখবার পর শের খাঁর হাতে পরাজিত হলেন। প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এক জন ভিস্তি তার বাতাস-ভরা মশকের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার না করলে গঙ্গার জলেই তাঁর সমাধি হয়ে যেত। এই মানুষটির ঋণ হুমায়ুন ভোলেন নি। এক দিনের জন্য তাকে বাদশাহী তখ্‌তে বসিয়ে তিনি তার বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন।

প্রবল পরাক্রান্ত শের খাঁ হুমায়ুনকে তাড়িয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন শের শাহ নামে। কিন্তু বারুদের বিস্ফোরণে তাঁর অকাল

মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর বংশধরেরা বেশি দিন রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি।

শের শাহের তাড়ায় আর ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণে হুমায়ুন এ দেশ থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই পলায়নের পথেই আকবরের জন্ম হয়েছিল। গুলবদনের হুমায়ুন-নামায় সেই বিচিত্র কাহিনী পড়ে আমরা বিস্ময়ে আবিষ্ট হই।

ললিতা বৌদি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই সব প্রাচীন বিদেশী বই বুঝি আপনি পড়েছেন ?

হেসে বললুম : না।

বৌদি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : বাঙলা দেশে একটা যুগ ছিল যখন অনেকে এই সব পড়তেন। আর দু এক জন ছিলেন যাঁরা কিছু মূল্যবান গ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন। সেই সব বই পড়েই আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। বেশি প্রাচীন নয়, আপনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোগল বিদুষী পড়ুন। তাতেই গুলবদনের সব কথা জানতে পাবেন। জেব উন্নিসার জীবনীও বোধ হয় এতেই আছে।

ললিতা বৌদি বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না। বললেন : বলুন এইবারে।

বললুম : গুলবদনের মা দিলদার তখন মুলতানের কাছে। হুমায়ুন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নতুন বিপদে পড়লেন। হামিদা বানু নামে তাঁর মা মাহমের এক আত্মীয় কন্যা তখন তাঁর সৎমা দিলদারের কাছে ছিল। এই চতুর্দশী কন্যার রূপ লাবণ্যে হুমায়ুন পাগল হয়ে বললেন, বিয়ে করব।

বৌদি আশ্চর্য হয়ে বললেন : সে কি, হুমায়ুন তো তখন বুড়ো!

বুড়ো নয়। বয়স মাত্র চৌত্রিশ। তবে বেগম কজন ছিলেন জানি নে।

বৌদি হাসলেন আমার কথা শুনে।

বললুম: বিয়ে খুব সহজেই হতে পারত। কুল ভাল, সৎ মায়েরও আপত্তি নেই, বাধা দেবার মতো আর কেউ সেখানে উপস্থিত নেই।

তবে?

গোলমাল বাধালেন হামিদা বানু নিজে। বাদশাহের ইচ্ছার কথা জানতে পেরেই তিনি অদৃশ্য হলেন, হুমায়ুনের সামনে আর বেরোলেন না। অনেক সাধ্য সাধনার পরে বললেন, বিয়ে তিনি এমন লোককে করবেন যার কণ্ঠ পর্যন্ত তাঁর বাহু পৌঁছবে। কিংখাবের পোশাক পর্যন্ত হাত পৌঁছবে না, এমন স্বামীতে তাঁর প্রয়োজন নেই।

ভারি তেজস্বী মেয়ে তো!

আর বুদ্ধিমতীও বটে। নিজের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন সচেতনতা আর এমন মর্যাদা বোধ, এত কম বয়সে সকলের হয় না।

হুমায়ুন এই হামিদা বানুর কাছে ধরা দিলেন, আর এক বৎসর পরে সিন্ধুর মরুভূমির ভিতর জন্ম হল আকবরের। কিন্তু হুমায়ুনের অদৃষ্টে আরও বিড়ম্বনা ছিল। এক বৎসরের পুত্র আকবরকে পরিত্যাগ করে প্রাণের দায়ে তাঁদের পালাতে হয়েছিল।

বৌদি যেন চমকে উঠে বললেন: ছেলেকে ফেলে মায়ে পালিয়ে গেল?

কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু এ ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় ছিল না।

কেন?

তাহলে গল্পটা বলি। হুমায়ুন তখন নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য পারস্য রাজের সাহায্য চাইবেন ভাবছিলেন। এমন সময় সংবাদ পেলেন যে তাঁর সৎভাই অস্করী তাঁকে বন্দী করতে আসছে। তাঁর কাছে মাত্র একটি ঘোড়া। হামিদা বানুর জন্য দ্বিতীয় ঘোড়া তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘোড়াতেই

হামিদাকে তুলে পালিয়ে গেলেন। কেউ বলেন, প্রখর রৌদ্রে তিনি শিশু আকবরকে সঙ্গে নেওয়া নিরাপদ ভাবেন নি। কিন্তু গুলবদন লিখেছেন যে ব্যস্ততার জন্যেই তাঁরা পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

বৌদি আপত্তি জানিয়ে বললেন : মা হয়ে ছেলেকে ভুলে ফেলে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়!

বললুম : হয় তো তাঁরা সব দিক ভেবেই ফেলে গিয়েছিলেন।

কী রকম?

হামিদা বানুকে ফেলে গেলে আর তাঁকে ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তিনি সঙ্গে থাকলে অনেক আকবরের জন্ম হতে পারে।

বৌদি আমার মুখের দিকে তাকালেন বিহ্বল ভাবে।

বললুম : সে তর্ক থাক। অস্করী আকবরকে হত্যা না করে নিজের স্ত্রীর কাছে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর হুমায়ুনও তাকে যথা সময়ে ফিরে পেয়েছিলেন।

পারস্য রাজ শাহ তহ্‌মাস্প হুমায়ুনকে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্য পেয়েই তিনি একে একে কান্দাহার কাবুল ও হিন্দুস্থান অধিকার করেন। শের শাহ মারা গিয়েছিলেন ১৫৫৪ সালে, তার এক বছর পরে হুমায়ুন লাহোর অধিকার করেন, আর মারা যান তারই পরের বছর উনপঞ্চাশ বছর বয়সে। শের শাহর শের মণ্ডলে পাঠাগার দেখে নামবার সময় হুমায়ুন সিঁড়ি থেকে পড়ে যান। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আর গুলবদন?

গুলবদন অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। আশী বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখন আকবরও বুড়ো হয়ে গেছেন।

গল্পে গল্পে আমরা যে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলুম তা খেয়াল করি নি। টাঙ্গা থেকে নামবার আগে চুপি চুপি বললুম :

হুমায়ুনের সম্বন্ধে আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয় নি।

বৌদি কৌতূহলী হয়ে বললেন ঃ কী ?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম ঃ তিনি পাকা আফিঙখোর ছিলেন।

মুখে কাপড় দিয়ে বৌদি হেসে উঠলেন। কোন শব্দ হল না।

আমার মনে হল, আমি এই নিঃশব্দে হাসবার কারণ বুঝি বুঝতে পেরেছি। এ বাড়ির অন্তঃপুরে বৌদি হাসবেন না।

জ্যোৎস্না রাতে আমরা তাজমহল দেখতে গিয়েছিলুম। নানান রকমের ওজর আপত্তি ছিল মাসির। বৌদি সব সরল করে দিলেন, বললেন : ঠাকুরপো নতুন মানুষ, তার ওপর একটু ইয়ে, মানে ভালো-মানুষ গোছের লোক। লক্ষ্মীছাড়া টাঙ্গাওয়ালা এঁকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তার ঠিক নেই। আপনিই বরং সঙ্গে যান। অনেক দিন তো বেরোন নি!

মাসি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন : ও বাবা, আমি বেরোব! তা হলেই হয়েছে আর কি!

হঠাৎ তাঁর পূর্ণিমার কথা মনে পড়তেই বললেন : তার ওপর এই পূর্ণিমার রাত! বাতের ব্যথাটা বেড়ে উঠলেই গেছি আর কি!

বৌদির চোখ দেখে মনে হল যে এ সমস্ত কথাই তাঁর জানা। পূর্ণিমার কথাটা তাঁর মনে না এলে নিজেই মনে করিয়ে দিতেন। বললেন : তাহলে ঠাকুরপো, পূর্ণিমায় তাজমহল দেখা এবারে আপনার ভাগ্যে নেই।

মাসি বললেন : সে কি কথা!

তারপরেই বৌদি হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন : ঠিক আছে! বাবা বাড়ি ফিরুন, তাঁকেই একবার হাতে পায়ে ধরে দেখি।

বলে ললিতা বৌদি থামতেই মাসি একেবারে তেড়ে উঠে বললেন : তুমি পাগল হয়েছ বৌমা! সারা দিন খেটে খুটে এসে ঐ বুড়ো মানুষটা বেরোবেন তাজমহল দেখতে! তার চেয়ে ওঁকে এই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে বল না, পরিশ্রমও কম হবে, দেখবেনও নতুন জিনিস।

বলে উঠোনের দেওয়ালটা দেখালেন।

মাসির যে কবিত্ব আছে, মনে মনে আমি তা স্বীকার করলুম। এইটুকু

না থাকলে আগ্রার সব লোক পাগল হয়ে যেত, আর তাজমহল হত একটা পাগলা গারদ।

বৌদি কোন প্রতিবাদ না করে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : তা হলে থাক্ ঠাকুরপো, আপনার কপালটাই খারাপ দেখছি! পরের বার যখন আসবেন, তখন আমরা অন্য লোক ঠিক করে রাখব।

সে কি বৌমা, তুমি বলছ কী! রাত্তিরে তাজ দেখবার জন্যেই তো ছেলেটা এ ক দিন রয়ে গেল, শেষ কালে কিনা তা না দেখেই ফিরে যেতে বলছ!

করুণ ভাবে বৌদি জবাব দিলেন : আর তো কোন উপায় দেখছি না মা।

উপায় নেই কেন! পথ ঘাট তো তোমারও সব জানা! তুমিই নিয়ে যাও না ছেলেটাকে!

বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন : আমি!

কেন, তোমার আর ভয়টা কী? গোপাল তো আমাদেরই ঘরের ছেলে। দাদার ছেলে মানেই—

এই পর্যন্ত বলেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন। আর বৌদি হাসলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে।

বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিতে বৌদির সময় লাগে না। শুধু একখানা শাদা গরদের থান জড়িয়ে নেওয়া তো! আলনাতেই টাঙানো থাকে। পুজোও হয়, বেড়ানোও চলে।

টাঙ্গায় খানিকটা এগিয়ে বৌদি বললেন : দেখলেন তো, কেমন করে মত আদায় করতে হয়!

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললুম : কঠিন কাজ।

বৌদি বললেন : সত্যিই কঠিন কাজ। চালের একটু ভুল হলেই সর্বনাশ। শ্বশুরকে পাঠাব না বলে যদি বলতাম, খেটে খুটে তিনি

আসছেন, তিনি কি আর যেতে পারবেন! তা হলেই হত কেলেঙ্কারী। বুড়ো মানুষকে নির্ঘাৎ বের করে ছাড়তেন।

আমার আর একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়ল।

বৌদি হেসে ফেললেন: বেশ লোক তো আপনি! তাজমহলে না পৌঁছতেই বার বার দীর্ঘ শ্বাস পড়ছে! আপনার সঙ্গে বেরিয়ে আমিও তো বিপদে পড়লাম দেখছি!

আমি বৌদির কথা ভাবছিলুম। তাঁর বন্ধনের কথা, তাঁর ব্যর্থ জীবনের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠছিল তাঁর অন্তরের প্রসন্নতা। যে নারী তার জীবনের গরল বুকে লুকিয়ে রেখে মুখে শুধুই অমৃত পরিবেশন করে, তার সত্যকার বিচার ক জনে করতে পারে! মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তো সীমাবদ্ধ। এমন চরিত্র কে দেখেছে আমি জানি না। কোন বইএও পড়েছি কিনা হঠাৎ মনে করতে পারলুম না।

কথা কইছেন না যে?

কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছি। বলার কথা আর খুঁজে পাচ্ছি নে।

খিল খিল করে বৌদি হেসে উঠলেন। বললেন: এ সব কথা তো লোকে তাজমহলে পৌঁছে বলে, যখন যমুনার জলের মতো জ্যোৎস্নার বান ডাকে তাজের বাগানের ওপর। টাঙ্গার ঝাঁকুনিতেও যে আপনার কবিত্ব আসছে!

তাজমহলের কথা তো আমি ভাবছি নে বৌদি—

কথাটা আমায় তিনি শেষ করতে দিলেন না, বললেন: কী বিপদ! বেড়াতে বেরিয়ে আবার ভাবাভাবি কিসের!

বুঝতে পারলুম, আমার বলার কথা বৌদি বলতে দিলেন না।

কিন্তু নিজের বলার কথা বললেন তাজমহলে পৌঁছে। চারি দিকে ঘুরে আমরা সব কিছুই দেখলুম। সবই তো জানা। কত কবিতা পড়েছি, কত বর্ণনা পড়েছি, পড়েছি কত আলোচনা।

শাহজাহান আর মমতাজকে নিয়ে এমন কোন কথা বোধ হয় নেই, যা কেউ না কেউ লিখে যান নি। সে আলোচনা আমরা করলুম না। ঘাসের উপর বসে আমরা নিজেদের কথাই কইলুম। আমরা তো একা নই এখানে, কত মানুষই তো এমনি বসে বসে নানা রকমের গল্প করছে। সবাই কি আর তাজমহলের কথাই বলছে!

কী ভাবছেন বলুন তো!

যা ভাবছি, তা বলবার সাহস নেই!

আপনি কি আমাকে ভয় পান?

বৌদির হাসির উত্তরে বললুম: ভয় পাব কেন! আপনি কি বাঘ, না ভালুক?

তবে?

আমার মুখের দিকে চাইলেন ললিতা বৌদি।

বললুম: যা জানতে ইচ্ছে করছে তা বললে আপনি দুঃখ পাবেন, এই ভয়।

দুঃখ! দুঃখ তো আমি পাই নে! দুঃখ কী, সে কথা তো আমি ভুলেই গেছি!

দুঃখ ভুলে গেছেনই বটে। বাজ পড়লে যেমন গাছ পোড়ে, গভীর দুঃখও তেমনি পাথর করে হৃদয়কে, ছোটখাট দুঃখ তখন আর দুঃখ বলে মনে হয় না। আমার মনে হল যে, ললিতা বৌদির আজ সেই অবস্থা। মুখের কথায় তাঁকে আঘাত দেব, তেমনি সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমি ইতস্তত করছিলুম।

বৌদি তাড়া দিয়ে বললেন: কী বলবেন বলুন না, সঙ্কোচ করছেন কেন?

সঙ্কোচ করবার ব্যাপার বলেই করছি। মেয়েদের জীবনের কথা জানতে চাওয়া শুধু অশিষ্টতা নয়, ধৃষ্টতাও বটে। তবু আজ আপনার জীবনের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। আজকের

কথা নয়, গত কালের কথাও নয়। যে দিনের কথা আজ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই দিনের কথা।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ললিতা বৌদি, তারপর সেই শব্দেই চমকে উঠলেন। কোন কথা কইলেন না।

আমি তৎপর ভাবে বললুম : আমায় আপনি ক্ষমা করবেন বৌদি। ইচ্ছে না থাকলে আপনি কিছুই বলবেন না।

খানিক ক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।

যমুনার তীর থেকে অল্প অল্প হাওয়া আসছে। গাছের পাতা দুলছে থেকে থেকে। আকাশে তারার মেলা, মাটিতে জ্যোৎস্নার চল। এখানে ওখানে মানুষের কথা, মিষ্টি হাসি। আমরা দুজনে নিঃশব্দে বসে আছি।

এক সময় বৌদি বললেন : আমি আপনার কথা ভাবছি। কিছু না ভেবে চিন্তেই আপনি বোধ হয় রাজী হয়ে এসেছেন।

আমার পোষ্যপুত্র হবার প্রসঙ্গ উঠবে এ কথা আমি ভাবি নি। বললুম : ভাববার অবকাশ পাই নি।

তাই কি! না রাজী হবার আগে তার প্রয়োজনের কথা মনে আসে নি?

তাও বটে।

আমার শাশুড়ি কী বলেন জানেন?

জানি নে।

এ এক অভিশপ্ত পরিবার। রোগে এমন হয় না, দুর্ঘটনাতেও না। আড়ালে কোন দেবতার কোপ দৃষ্টি আছে, পূর্ব জন্মের কোন গভীর পাপ।

এ সবে আপনি বিশ্বাস করেন?

করতুম না। কিন্তু এখন সন্দেহ হয়।

এ কি আপনার দুর্বলতা নয়?

হয়তো তাই। হয়তো কেন, সত্যিই তাই। আঘাত পেলে

তো মানুষ দুর্বলই হয়। আমিও এক দিন সংস্কার মানতাম না। এখন মানি।

হঠাৎ বৌদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন: আমার একটা কথা রাখবেন ঠাকুরপো?

কী সেই কথা, আমি যেন তা অনুভব করতে পারলুম। বৌদি কি আমার হাত দুটো চেপে ধরবেন? আমার অস্বস্তি বোধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসে বসেই আমার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বললুম: প্রতিশ্রুতি কি আমায় দিতেই হবে বৌদি?

না।

সংযত উত্তর পেলুম ললিতা বৌদির। একটু আঘাতও যেন পেলুম। মনে হল, আমার উপর বৌদি যদি জোর করতেন, তা হলে সেই জোরই আমার ভাল লাগত।

বললুম: বলুন না, কী বলছিলেন আমাকে। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আমি কথা রাখব।

থাক। হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম যে আপনাকে অনুরোধ করার অধিকার আমার নেই।

তারপরেই একটু হেসে বললেন: আপনি পোষ্যপুত্র হলে তবে আমাদের সঙ্গে আপনার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

আমার উত্তর বুঝি আর্তনাদের মতো শোনাল, তবু বললুম: বৌদি, সত্যি কথা এমন শক্ত করে বলবেন না।

বৌদি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: চলুন, এবারে ফেরা যাক।

কিন্তু ফিরতে আমাদের আরও কিছুক্ষণ দেরি হল। আবার আমরা ঘুরে ঘুরে তাজমহলের রূপ দেখতে লাগলুম।

তাজমহল আমার কাছে কোন নূতন জিনিস নয়। শৈশবেই জেনেছিলুম যে এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। ছবি দেখে

দেখে তাজমহল আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে। শ্বেত পাথরের মডেল দেখেছি, দেখেছি সোপ স্টোনের ছোট ছোট মডেল। আগ্রায় বেড়াতে গেলেই লোকে এই সব মডেল কিনে এনে ঘরে রাখে।

সদর রাস্তার উপরে যে তিন তলা গেট, দর্শকেরা সেই দিক থেকেই আসে। খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি নেয়, তারপর দুই ধারের বাঁধানো পথ ধরে এগোয়। মাঝখানে জলাধার গেট থেকে তাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত, ব্রোঞ্জের ফোয়ারা। দু ধারের পথের পাশে সবুজ সাইপ্রাসের সারি। প্রখর মধ্যাহ্নেও বুঝি এই সবুজ গাছ ও শীতল জল উত্তাপকে লাঘব করে।

তাজমহলের পিছনে বইছে কালিন্দী যমুনা। সরকারী গাইড বই-এ তাজের যে ছবি দেখি, সে যমুনার বুকের উপর থেকে তোলা। পর পারে যে বাগান, তার নাম মহতাব বাগ, চাঁদের আলোর বাগান। নিকটে দাঁড়িয়ে তাজমহলকে বিরাট মনে হয়, কিন্তু ঐ মহতাব বাগে দাঁড়িয়ে যে একে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয় তাতে সন্দেহ নেই।

সত্যিই এই তাজ দেখতে হয় সারা দিন ধরে। পৃথিবী যেমন প্রহরে প্রহরে তার রূপ বদলায়, তেমনি তাজও সারা দিন সাজে। শুনেছি, প্রত্যূষে তার ধূসর রঙ, প্রদোষে গোলাপী আভা, রৌদ্রে রূপোর মতো, আর ছায়াতে সোনা। চাঁদের আলোয় যেন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে।

লোকে বলে, তাজমহল সব চেয়ে সুন্দর দেখায় একটি অনাদৃত স্থান থেকে। একটি সরু পথ এসেছে তাজ গ্রাম থেকে। সেই পথে দাঁড়িয়ে যে রূপ দেখি, তেমন রূপ আর কোন খান থেকে দেখি না।

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যাবেন নাকি ঐ দিকে ?

আমি বললুম ঃ না, দিনের আলো থাকলে যেতুম।

মসজিদের দিকেও গেলুম না। তার বদলে আর একবার আমরা তাজমহলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম।

একটা উঁচু ভিতের উপর বিরাট চতুষ্কোণ সৌধ। নিচেটা লাল পাথরের। উপরে মর্মর। মেঝেটা দেখেছিলুম দাবার ছকের মতো সাদা ও কালো পাথরের। চারি দিকে চারিটি মিনার তিন তলা উঁচু। দিনের বেলায় লোকেরা তার উপরে ওঠা নামা করে। মূল সৌধটি দেখতে দোতলার মতো। তার উপরে দুটি ছোট ছোট গম্বুজের মতো দুই পাশে। মাঝখানে সেই বিরাট গম্বুজটি চন্দ্রালোকে ঝক ঝক করছে। সামনে জলের উপর তার ছায়া অল্প অল্প দুলছে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বৌদি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন: কী ভাবছেন?

আমি বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিলুম। বললুম: এক সমালোচকের কথা।

সে কি!

বললুম: ভদ্রলোক এই গম্বুজটাকে পেঁয়াজের আকার বলে বর্ণনা করেছেন।

বৌদি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: গম্বুজের কোন্ খানটা পেঁয়াজের মতো তা জানি নে, তবে ভারতবর্ষে নাকি এই ধরনের গম্বুজ এই প্রথম। এ সব নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বলেন যে এ জিনিস উজবেকদের দেশ থেকে এসেছে। বোখারায় এখনও তৈমুরের তৈরি সৌধ এই কথার প্রমাণ দিচ্ছে।

একটু থেমে বললুম: আর একটা কথাও শুনেছি।

কী কথা?

বললুম: যে স্থপতিদের ওপর এই তাজমহল তৈরির ভার পড়েছিল, তারা নাকি মাণ্ডু দুর্গে গিয়ে হোসেন শাহর সমাধি দেখে এসেছিল। তারপর সেই আদর্শেই তৈরি করেছে এই তাজমহল।

আশ্চর্য হয়ে বৌদি বললেন: সত্যি নাকি!

বললুম: সত্যি বলেই তো শুনেছি। যাঁরা মাণ্ডু দুর্গে গিয়ে হোসেন

শাহর সমাধি দেখে এসেছেন, তাঁরা বলেন যে সেখানে একটা সরকারী ফলকে নাকি লেখা আছে—

The architect of Shajahan such as Usted Hamid associated with the Tajmahal came to pay homage at the tomb of Hoshang Shah in 1659 A. D.

বৌদি বললেন: লোকে বলে বিশ হাজার শিল্পী কুড়ি বাইশ বছর ধরে এই তাজমহল তৈরি করেছিল। খরচ হয়েছিল প্রায় চার কোটি টাকা। এখন হলে তিন শো কোটি টাকা খরচ হত।

কিন্তু এমন সুন্দর হত না।

কেন?

এ যুগে এত শিল্পী কোথায়? শিল্পের দাম থাকলে তো শিল্পী জন্মাবে।

বৌদি বললেন: আমি অন্য কথা জানতে চাইছিলাম।

বলুন।

আপনার কী মনে হয় এই সব হিসেব ঠিক আছে?

হেসে বললুম: হিসেবের কথা আজ ভুলে যাই।

বৌদি বোধ হয় লজ্জা পেলেন। বললেন: সেই ভাল।

তাজমহলের ভিতরে আমরা প্রবেশ করি নি। বাহিরের দেওয়ালে যে কোরাণের লিপি আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। গাইডরা মুখ তুলে চেয়ে দেখতে বলে। নিচের থেকে উপর পর্যন্ত সব সমান আকারের লেখা মনে হয়। আসলে তা নয়। শিল্পীরা এমন করে বড় থেকে ছোট লেখা লিখেছে যে সমান আকারের লেখা বলে সকলের ভ্রম হবে।

ভিতরে মমতাজ মহলের কবর মাঝখানে, তার পাশে শাহজাহানের। একদা নাকি সোনার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন পাথরের ঝরোকা দিয়ে ঘেরা। তবে অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ নাকি সোনা সরিয়ে এই পাথরের পর্দা তৈরি

করিয়েছেন।

এগুলো নকল কবর। আসল কবর দেখতে হলে নিচে নামতে হবে। যেমন উপরে, নিচেও ঠিক তেমনি। সে যুগে এই রকমই রীতি ছিল। লোকে নকল কবর দেখে চলে যাবে। আসল কবরে পা ঠেকবে না কারও।

শাহজাহান বিয়ে করেছিলেন অর্তুমান বানুকে। নূরজাহান বেগমের ভাই আসফ খানের কন্যা। পরে তাঁর নাম হয়েছিল মমতাজ মহল। যেমন নূরজাহান, তেমনি মমতাজ মহল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ নূরজাহানের কথা জানেন তো?

বৌদি বললেন ঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহর বেগম।

বললুম ঃ আমি তাঁর গুণের কথা বলছি। তিনি বাদলকিনারা ওড়না আর খাবার টেবিলে দস্তরখান মানে চাদরের প্রচলন করেছিলেন। নতুন করে আতরের ব্যবহারও শুরু করেন।

তাই নাকি?

এ কথার উত্তরে বললুম না যে ভারতবর্ষের মেয়েদের কাঁচুলী পরাও তিনি শিখিয়েছিলেন। বরং বললুম ঃ মমতাজ বেগমেরও এমনই অনেক গুণ ছিল। শোনা যায় যে তাঁর আয়ের প্রায় সমস্তটাই তিনি বিধবা ও অনাথ শিশুদের জন্য ব্যয় করতেন।

শাহজাহান যখন খান জাহান লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন মমতাজের অসুখ করে। বাদশাহ ছুটে এসে তাঁকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন না। মমতাজ চলে গেলেন। শাহজাহানকে যেন মেরে রেখে গেলেন। বাদশাহ-নামায় আছে যে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সমস্ত দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। রাজবেশ ছেড়ে তিনি সাদা মসলিন পরা শুরু করেন, আর উৎসাহ হারান রাজকার্যে।

তার পর?

তার পর পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে আগ্রার দুর্গে বন্দী হয়ে কাটান

শেষ জীবন। এই তাজমহলের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি চোখের জল আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন। জাহানারার আত্মকাহিনী পড়েছেন?

পড়ি নি।

আমি আন্দ্রিয়া বুটেনশনের অনুবাদ বলছি না, বলছি মাখনলাল রায় চৌধুরীর বইএর কথা। পড়ে দেখবেন। তাজমহলের পিছনে যেমন শাহজাহান, তেমনি শাহজাহানের সঙ্গে জাহানারা। মৃত্যু শয্যায় মমতাজ এই দু জনের হাত ধরে কেঁদেছিলেন। আজও তাই তাজমহল দেখতে এসে আমরা শাহজাহান ও জাহানারার জন্ম কাঁদি।

২৮

পূর্ণিমার আগেই আমরা আগ্রার বাজার দেখতে বেরিয়েছিলুম।

উত্তর প্রদেশের অন্যান্য শহরের মতোই বাজারের বসতি খুব ঘন জনাকীর্ণ। নোংরা বললে ঠিক বলা হবে না, ধোঁয়া ধুলোয় অপরিচ্ছন্ন বললেও সবটুকু বোঝা বাকি থেকে যাবে। দেশী বাজার সর্বত্র যে রকম, এখানেও তেমনিই। দিল্লীর কনট প্লেসের মতো ভাল নিশ্চয়ই নয়, আবার চাঁদনী চকের অলি গলির চেয়েও বেশি খারাপ নয়। এ রকম বাজার দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং প্রশ্ন না করলে কোন মন্তব্য করারও প্রয়োজন দেখি না।

পাথরের কাজটাই এখানে প্রধান দেখলুম। বাসনপত্র থেকে শুরু করে নানা রকমের শৌখিন জিনিস পর্যন্ত। শুধু আলো ও শ্বেত পাথর নয়, সোপ স্টোনেরও কাজ হচ্ছে। দোয়াত কাগজ-চাপা পাউডারের কৌটা তাজমহল ইৎমদ-উদ-দৌলা। সাদা বা কালো পাথরের উপরে নানা বর্ণের পাথরের কুচি বসিয়ে যে নক্সা হয়, তা আগ্রার সম্পূর্ণ নিজস্ব। পঞ্চাশ ষাট পাপড়ির একটি গোলাপকে মাইক্রস্কোপের নিচে ফেলেও নাকি তার জোড় খুঁজে পাওয়া যায় না। কারুকার্য এমনই সূক্ষ্ম।

আগ্রার কোথায় জুতো তৈরি হয়, আর কোথায় দরি, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামালুম না। দরি মানে সূতোর কার্পেট, মোটা শতরঞ্জি বললে ভাল দরির অপমান করা হবে।

বৌদি বললেন: আগ্রায় নতুন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার নাম দয়ালবাগ। আগ্রা ক্যান্টনমেণ্টের ঠিক উল্টো দিকে মাইল চার পাঁচ দূরে।

দয়ালবাগের নামটিই আমি শুনেছি, তার বেশি কিছু শুনি নি। জিজ্ঞাসা করলুম : যাবেন নাকি সে দিকে ?

ধর্মে টান থাকলে যাওয়া দরকার।

কেন ?

শুনেছি রাধাস্বামী নামে এক সম্প্রদায়ের আশ্রম সেটি। আপনি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না ?

অকপটে স্বীকার করলুম : জানি নে।

দেশে আজ কাল আশ্রম ও সম্প্রদায় এমন বেড়েছে যে কিছু না জানার জন্যে আর লজ্জা বোধ করি নে।

বৌদি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : বাঁচা গেল। আশ্রমের নামে আমার আজ কাল ভয় করে।

একটু থেমে বললেন : এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম আমি জানি নে। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তাঁর সমাধি মন্দির গড়ে উঠছে। বুড়ো বয়সে দেখতে যাবেন।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম : দয়ালবাগ আমি একটা কারখানা বলেই জানতুম। কলকাতায় দয়ালবাগের চটি বিক্রি হয়।

বৌদি হেসে বললেন : সেই দয়ালবাগ। চামড়ার সঙ্গে দুধ ঘি মাখন আছে। স্কুল হাসপাতাল টেকনিকেল স্কুল কিছুরই অভাব নেই।

জামি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে বৌদি বললেন : আগ্রা দেখা আপনার মোটামুটি সম্পূর্ণ হল। পাঁচ মাইল দূরে আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা, সে এমন কিছু অপূর্ব জিনিস নয়। তবে—

তবে কী ?

ফতেপুর সিক্রি না দেখলে সত্যিই আপনার দুঃখ থেকে যাবে।

আমিও তাই শুনেছি। যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে আকবর সাক্ষাৎ করেন শেখ সেলিম চিস্তির সঙ্গে। ফকির তখন সিক্রি

গ্রামে আস্তানা ফেলেছেন। তাঁরই আশীর্বাদে আকবরের পুত্র হল এক বছরের মধ্যে। আকবর ছেলের নাম দিলেন সেলিম, আর রাজধানা গড়লেন সিক্রিতে। গুজরাট জয়ের পর সিক্রির নাম হল ফতেপুর সিক্রি, আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর মসজিদের দরজা তৈরি হল বুলন্দ দরওয়াজা। একশো ছিয়াত্তর ফুট উঁচু, ভারতের সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে বড় দরজা। সকলের আলাদা আলাদা মহল হল—তুর্কী সুলতানার ঘর, মরিয়ম-উজ-জমানির সোনেহারা মকান, যোধা বাঈর মহল, বীরবলের বাড়ি, শেখ সেলিম চিস্তির দরগা, জ্যোতিষীদের ছত্রি, ছাত্রদের পাঁচ মহল, আরও কত কি। কিন্তু জলের কষ্ট দূর হল না, উন্নতি করা গেল না স্বাস্থ্যের। শেষ পর্যন্ত বাদশাহকে আগ্রাতেই ফিরে আসতে হল।

এই ফতেপুর সিক্রি দেখবার শখ আমারও প্রবল হল। বললুম: অনেক দূরে বুঝি?

বৌদি বললেন: দূর আর বেশি কী! ট্রেনে মাত্র কয়েকটা স্টেশন, মোটরে সাতাশ মাইল, আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে চমৎকার পথ আছে। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যে বেলায় ফিরে আসা যায়।

লোভ হল বৌদির কথা শুনে। বললুম: ব্যবস্থা একটা হয় না?

হবে না কেন! চেষ্টা করে কোন বন্ধুকে ধরতে হবে যে তার গাড়িতে আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে।

গাড়ি আছে এমন বন্ধু যোগাড় হল, কিন্তু বৌদিকে নিয়ে যাবার অনুমতি পাওয়া গেল না।

আমি বললুম: থাক তাহলে।

বৌদি বিস্মিত হয়ে বললেন: সে কি!

বললুম: ফতেপুর সিক্রি আমি অন্য সময় দেখব।

লম্বা জিভ বার করে বৌদি বললেন: ছি ছি! লজ্জায় আমার

মাথা কাটা যাবে, সবাই ছি ছি করবে চারি দিকে।

কেন ?

বুঝতে পারছেন না ? আপনার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে—

না না, এ অসম্ভব।

বৌদি বললেন : অসম্ভব কিছুই নয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো পূর্ণিমায় তাজমহল দেখাই বাতিল হয়ে যাবে। তার চেয়ে কোন আপত্তি না করে ঘুরে আসুন।

বললুম : তাহলে যেতেই হবে।

বৌদি হেসে বললেন : এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা।

পর দিন সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মেসোমশায়ের এক বন্ধুর ছেলে ব্রজেশ এসেছিল গাড়ি নিয়ে। ব্রজেশ শ্রীবাস্তব। বয়স আমারই মতো। বাপের ব্যবসা ছেড়ে আগ্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে ঢুকেছে। সাদাসিদে সরল লোক, ভাব হতে বেশি সময় লাগল না।

ব্রজেশ নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি তার পাশে বসে ছিলুম।

যমুনার পশ্চিম তীরে আগ্রা শহর, আর বড় বড় রাস্তাগুলো সব পশ্চিমেই গেছে—মথুরার দিকে, ভরতপুরের দিকে, ফতেপুর সিক্রির দিকে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে মালপুরার দিকে। গোয়ালিয়রের রাস্তা গেছে দক্ষিণে, আর যমুনার পুল পেরিয়ে আলিগড়ের পথ।

যমুনার গতি এখানে বিচিত্র। দক্ষিণে নামতে নামতে একটু পশ্চিমে হেলেই মোড় ফিরিয়ে পূর্বমুখী হয়েছে। নতুন যাত্রীদের সেইজন্যই একটু দিগ্‌ভ্রম হয়। আগ্রা দুর্গের পূর্বে যমুনা, অথচ তাজমহলের উত্তরে। আগ্রা দুর্গ থেকে তাজমহল দেখি পূর্বে প্রভাতের নবীন সূর্যের মতো কান্তিমান। কিন্তু সে দিকে আমরা গেলুম না। আমরা পশ্চিমে রেল লাইন পেরিয়ে ফতেপুর সিক্রির পথ ধরলুম।

ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছে ব্রজেশ বলল: এ দিকে তুমি আগে কখনও আস নি?

না।

কেমন লাগছে?

মনে হচ্ছে, ইতিহাস পড়ছি।

খুশী হয়ে ব্রজেশ বলল: ঠিক বলেছো। এই সব পুরনো জিনিস দেখবার সময় আমারও ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ছোট ছেলেমেয়েদের মোটা বই না দিয়ে এই সব জায়গা দেখিয়ে দিলে বোধ হয় শিক্ষা ভাল হয়! চোখ বড় বিশ্বস্ত অঙ্গ, একবার দেখলে সহসা ভোলে না।

কথাটা ভাল লাগল। বললুম: তুমি কি কবিতা লেখো?

ব্রজেশ হেসে বলল: পড়ি।

নানা কথার ভিতর কখন আমরা আকবরের কথায় এসে পড়েছিলুম মনে নেই। ব্রজেশ বলল: আকবরকে আমি মোগল বিক্রমাদিত্য বলি।

সে কি তাঁর নবরত্নের সভার জন্য?

ঠিক তাই। এক সঙ্গে এতগুলি গুণী লোকের সমাবেশ বিক্রমাদিত্যের পরে আর কোন রাজার সভায় হয় নি। আঙুলে গুণে নাও, আমি নবরত্নের নাম করতে পারি।

আমি গুণতে লাগলুম, আর ব্রজেশ বলতে লাগল: শেখ সেলিম চিস্তি বৈরাম খান টোডরমল মানসিংহ ফৈজী আবুল ফজল তানসেন বীরবল ও গুলবদন।

গুলবদন তো আকবরের পিসি!

তিনিও নবরত্নের সভায় বসবার যোগ্য ছিলেন।

এঁদের সকলের কথাই তো তুমি জান!

কিছু কিছু।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: শুনতে চাও বুঝি?

হেসে বললুম : কিছু আমারও জানা হত।

ব্রজেশ বলল : ইতিহাসের কথা আমার কাছে জানতে চেও না, ওতে আমার রুচি নেই। আমি গল্প বলতে পারি।

বেশ তো, তাই বল।

মুসলমান ফকির শেখ সেলিম চিস্তির সম্বন্ধে এইটুকুই জানি যে তাঁর আশীর্বাদে আকবর-পত্নী যোধবাঈএর পুত্র সন্তান জন্মে। তার নাম সেলিম, পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর। শুনে আশ্চর্য হবে কিনা জানি না, আকবরের বেগম ছিল আট জন। তাঁর চাচা হিন্দালের মেয়ে রকিয়া বেগম তাঁর প্রথম ও পাটরাণী। তাঁর ছেলে-পুলে হয় নি বলে তিনি নাতি শাহজাহানকে মানুষ করতেন। দ্বিতীয় বেগম জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যা। তৃতীয়, যোধপুরের রাজকন্যা যোধবাঈ। তিনটি মুসলমানের কন্যা এবং দুটি মুসলমানের স্ত্রী। তার মধ্যে বৈরাম খাঁর স্ত্রী সলিমা বেগমও একজন। সলিমা কবি ছিলেন।

বাধা দিয়ে বললুম : বৈরাম খাঁ তো তাঁর অভিভাবক ছিলেন!

ছিলেন বৈকি। বাবর ও হুমায়ুনের তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে নাবালক আকবরের অভিভাবক হয়েছিলেন। আকবর সাবালক হয়ে তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। বৈরাম বিদ্রোহী হয়েও কিছু করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে আকবর তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

হঠাৎ আমার জাহানারা ও জেব উন্নিসার কথা মনে পড়ল। আকবরের বিধানে এই দুই মোগল শাহাজাদী বিবাহ করতে পারেন নি। আকবরের কোন কন্যা ছিল কিনা আমার জানা নেই, থাকলে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল কিনা সে কথা জানবার বাসনা হল। জিজ্ঞাসা করলুম : আকবরের মেয়ে ছিল না?

ছিল। শুনেছি পাঁচটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। প্রথম দুটি যমজ পুত্র জন্মেই মারা গিয়েছিল, তারপর সেলিম মুরাদ ও দানিয়াল। মেয়েদের নাম খানুম শুক্রুন্নিসা ও আরাম বানু।

মেয়েদের তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন ?

জানি নে। তবে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মত আমি জানি। তিনি বলতেন, কাকে বিয়ে করব ? যারা বয়সে বড়, তাদের আমি মায়ের মতো দেখি। যারা ছোট, তাদের দেখি মেয়ের মতো। যারা সমবয়সী, তাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি। তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বলতেন, অল্প বয়সে বিয়ে হলে ছেলে-মেয়েরা রুগ্ন ও দুর্বল হয়।

ব্রজেশ একটু থেমে বলল : টোডরমল ও মানসিংহের কথা তো তুমি ইতিহাসেই পড়েছ। রাজা টোডরমল তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। রাজস্ব ব্যাপারে তিনি কী সংস্কার করে যশস্বী হয়েছিলেন তা না জানলে ক্ষতি নেই। শুধু এইটুকু জেনো রাখো যে আজ আমরা চাকরি করে যে বেতন পাচ্ছি, তা টোডরমলেরই কাজ। সে যুগে চাকরির জন্যে জায়গীর দেওয়া হত। টোডরমল বললেন, না, তা চলবে না। পদ অনুযায়ী নগদ টাকা দেওয়া হবে।

সত্যি নাকি !

ব্রজেশ খুশী হয়ে বলল : জয়পুরের রাজা মানসিংহ ছিলেন সেনাপতি। এই দুজন হিন্দুকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে আকবর হিন্দুদের কাছেও প্রিয় হয়েছিলেন।

রাস্তার উপরে দু তিনটি ছেলে মেয়ে খেলা করছিল। ব্রজেশ একটু সাবধান হয়ে তাদের পেরিয়ে গেল। তার পর বলল : ফৈজী আর আবুল ফজল দুই ভাই। ফৈজী বেনারসে ব্রাহ্মণের বেশে সংস্কৃত চর্চা করেছিলেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে নল দময়ন্তীর কাহিনী নলদমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু হিন্দু কাব্য ও দর্শন নয়, ভাস্করাচার্যের বীজগণিত ও লীলাবতীর গণিতের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি কোরাণেরও একখানি অনুবাদ করেছিলেন।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : নোক্তা বিন্দি বোঝ ?

না।

কেন, বিন্দি তো হিন্দী বাংলা দুই ভাষার অক্ষরেই আছে! নোক্তা লাগে উর্দু ভাষায়। আটাশটি অক্ষরের মধ্যে তেরটিতে নোক্তা নেই, অর্থাৎ পড়তে কষ্ট কম। ফৈজী এই তেরটি অক্ষরে কোরাণের অনুবাদ লিখে সাধারণের পাঠ্য করে দিয়েছিলেন।

বললুম: বুঝেছি, এ গ্রন্থ বোধ হয় যুক্তাক্ষর বর্জিত হয়েছিল, তাই না?

ঠিক তাই। একশো একখানি গ্রন্থ রচনার পর কবি ফৈজী হাঁপানিতে মারা যান।

বললুম: ফৈজীর পরে আবুল ফজল।

আবুল ফজলের মতো অকৃত্রিম বন্ধু আকবরের গৌরব ছিলেন। তুমি তাঁর আইন-ই-আকবরীর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। রাজনীতি থেকে দাবা খেলা, ধর্মতত্ত্ব থেকে পাখি পোষা পর্যন্ত এই যুগের সামগ্রিক ইতিহাস তিনি লিখে রেখে গেছেন। আকবর ও আবুল ফজলকে নিয়ে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। মুকুন্দরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগে তপস্যা করতেন। এক শিষ্য তাঁর সেবা করত। এক দিন সেই শিষ্য যে দুধ খেতে দিল, তার সঙ্গে একটি লোম গুরুর মুখে গেল। গুরু ভাবলেন যে তাঁর ধর্ম নষ্ট হয়েছে এবং তিনি যবন হয়ে গেলেন। তার পর ভাবলেন যে পরজন্মে যদি যবন হয়েই জন্মাতে হয় তো দিল্লীর বাদশাহ হয়েই জন্মানো ভাল। এই ভেবে একটি তামার ফলকে এই কথা লিখে রেখে অলক্ষ্যে দেবীর সামনে মাটিতে সেই ফলক পুঁতলেন। তার পর প্রয়াগের কামকূপে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শিষ্য ভাবল, তার জন্যই গুরুর এই অবস্থা। সেও পরজন্মে গুরুর সেবা করবার জন্যে সেই কূপেই লাফিয়ে পড়ল। কোন বাসনা নিয়ে কামকূপে প্রাণ দিলে সেই বাসনা সফল হয় এবং গুরুশিষ্য দুজনেরই বাসনা সফল হয়েছিল।

কী রকম ?

ব্রজেশ হেসে বলল : আকবর বাদশাহ নাকি জাতিস্মর ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রয়াগে অলক্ষ্যে দেবীর সামনে মাটি খুঁড়ে আমার পূর্বজন্মের পরিচয় দেখ। মাটি খুঁড়ে সত্যিই সেই তামার ফলকটি পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম ও তাঁর শিষ্য আকবর ও আবুল ফজল হয়ে জন্মেছেন।

গল্প শুনে আমিও হাসলুম।

ব্রজেশ বলল : গল্পটি যে কাল্পনিক তাতে সন্দেহ নেই। আকবরের হিন্দু প্রীতির জন্যেই এই সব গল্পের প্রচার হয়েছিল। হিন্দুরা বলত, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। বলত তাঁর সকল ধর্মে সমান আস্থা দেখে। কোরাণের সব কথা না মানার জন্যে মুসলমানরাই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি মানতেন না যে ভগবানকে পেতে হলে ইসলামই একমাত্র ধর্ম। এই হল আবুল ফজলের মত। আকবরের নূতন ধর্ম দীন ইলাহির পিছনে আবুল ফজলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

ব্রজেশ এইবারে হাসতে লাগল।

বললুম : হাসছ যে ?

ব্রজেশ বলল : আবুল ফজলের খাবার গল্প মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক খাইয়ে লোক ছিলেন।

তাই নাকি ?

বেশি নয়, দিনে মাত্র বাইশ সের খেতেন।

সর্বনাশ !

তাঁর ছেলে আবদুর রহমান তাঁকে সামনে বসে খাওয়াতেন। রান্নার ভাল মন্দ তিনি বলতেন না। ভাল লাগলে এক জিনিস দুবার নিতেন, পর দিন আবার তা রান্না হত। ভাল না লাগলে ছেলেকে চাখতে দিতেন, ছেলে তা চেখে খানসামাকে চাখাতেন। তার শিক্ষা হত।

হেসে বললুম : বাদশাহর সভাসদ হবার যোগ্য লোক।

ব্রজেশ বলল : আবুল ফজলের মৃত্যুর গল্প নিশ্চয়ই জান।

বললুম : সেলিম তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

ব্রজেশ এবারে একটু সময় নিয়ে বলল : মিঞা তানসেনের গল্পও তোমার জানা। বামুনের ছেলে রামতনু পাণ্ডে প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আর একজন বিখ্যাত গায়ক মাণ্ডুর সুলতান বাজ বাহাদুর। তাঁরও প্রেমের গল্প সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। গুল-বদনকে সভায় বসাতে তুমি আপত্তি করেছিলে, কিন্তু তানসেনের সঙ্গে আরও অনেক গায়ক গায়িকা সভায় গান গাইত। বাদ্য যন্ত্র ও ওস্তাদদের নাম মুখস্থ করতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল। গোয়ালিয়রের বীর মণ্ডল খাঁ স্বরমণ্ডল বাজাতেন, তানপুরা বাজাতেন ইউসুফ-লাসিম মুহম্মদ আমিল ও মুহম্মদ হুসেন। কাসিম রুবাব বাজাতেন—

রুবাব কী?

প্রশ্ন কোরো না। এর পরে আছে বীণ করনা নাই ঘিচক কুবজ সুর্ণা। বীণ কী বলতে পারলেও বাকি একটারও পরিচয় দিতে পারব না।

হেসে বললুম : থাক, তাহলে আর কষ্ট কোরো না।

ব্রজেশ হেসে বলল : সকলের শেষে বলি বীরবলের কথা। কেন না তাঁর কথারই শেষ নেই।

কেন?

অফুরন্ত গল্প। বীরবলের গল্প শুনিয়ে তোমাকে পাগল করে দেওয়া যায়। নির্মল আনন্দে তুমি পাগল হবে। শুনবে কিছু?

বল না।

ব্রজেশ বলল : বীরবলেব সঙ্গে আকবরের পরিচয়ের গল্পটাই প্রথমে বলি। বীরবল শেঠ তখন এক জমিদারের কাছে ছিলেন। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ও রহস্যপ্রিয়তার কথা শুনে আকবর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। দিন কয়েক পরে বীরবল আকবরের দরবারে ঢুকতে

গিয়ে বাধা পেলেন। প্রহরী বলল, সেলামী কই? মানে? দরবারে ঢুকতে হলে কি অমনি ঢোকা যায়! কিছু দিয়ে যাও। বীরবল এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, বেশ, বাদশাহর কাছে আজ যে ইনাম পাব তার অর্ধেক তোমার।

তার পর?

তারপর বীরবল দরবারে ঢুকলেন। পরিচয় হবার পর আকবর বাদশাহ ভারি খুশী। বললেন, শেঠজীকে আসরফি দাও। না না জাঁহাপনা, সোনা দানা আমার চাই নে। আকবর বললেন, তা হয় না, কিছু আপনাকে নিতেই হবে। বীরবল মাথা চুলকে বললেন, যদি কিছু নিতেই হয় তো আমার পিঠে কুড়ি ঘা বেত মারুন। সে কি! শুধু বাদশাহ নন, সভার সকলেই আশ্চর্য হলেন, এ আবার কী কৌতুক! কিন্তু বীরবল নাছোড়বান্দা। পিঠ পেতে দিয়ে বললেন, মারুন। বাধ্য হয়ে বাদশাহ বললেন, মার।

গল্পটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তবু বললুম: তার পর?

তার পর আর কী! একটা দুটো করে দশ ঘা বেত পড়বার পর বীরবল চেঁচিয়ে বললেন, থামো, আমার এক জন ভাগিদার আছে। আকবর বললেন, কে? বীরবল বললেন, আপনার দরজার প্রহরী। বিনে পয়সায় আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। তার সঙ্গে এই ভাগের বন্দোবস্ত করে এসেছি। বাদশাহের যেন মাথা কাটা গেল, বললেন, আমার চোখের সামনে ঘুষ! শূলে দাও তাকে। বীরবল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, শূল নয় জাহাপনা, মাত্র ঐ দশ ঘা বেত তার প্রাপ্য। আকবর বাদশাহর মনে হল যে ঐ দশ ঘা বেত তাঁর প্রহরীর পিঠে পড়ছে না, পড়ছে তাঁর নিজের পিঠে। সুশাসনের অহংকার তাঁর ফুরলো, সেই দিন থেকেই তাঁর দরবারে ঘুষের প্রথা উঠে গেল।

বীরবল তাঁর পুরনো মনিবের কাছে আর ফিরে যেতে পারেন নি। বাকী জীবনটা কাটিয়েছিলেন আকবরের দরবারেই। সুরসিক বীরবল এইখানেই শেঠ থেকে রাজা হয়েছিলেন।

ফতেপুর সিক্রি এখন একেবারে পরিত্যক্ত। আগ্রার মতো সুন্দর শহর থেকে আকবর কেন তাঁর রাজধানী সরিয়ে এখানে এনেছিলেন, আর কেনই বা আবার আগ্রায় ফিরে গিয়েছিলেন সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আকবরের যে ছেলে বাঁচত না, জন্মেই মারা যেত, তা আমাদের জানা। শেখ সেলিম চিস্তির অলৌকিক খ্যাতি যে অনেক দূর দেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তাও আমরা জানি। তাঁর দয়াতেই ছেলে হল বলে কি রাজধানী সরিয়ে আনতে হবে! সেলিম চিস্তি হয় তো আগ্রায় যেতে চান নি, আর পর্বত অমনি মহম্মদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন!

সে যুগে কল কারখানা ছিল না। চাষ-বাস করে সংসার চালাবার উপায় যার ছিল না, তাকে বেকার বসে থাকতে হত। রাজারা তাদের জীবিকার জন্য কোন উপায় খুঁজে পেতেন না। শেষ পর্যন্ত অরাজকতার আশঙ্কা দেখে বলতেন, একটা সমাধি সৌধ গড়, কিংবা একটা তাজমহল। বিশ হাজার লোক বিশ বছর ধরে খেয়ে পরে বাঁচবে। বোধ হয় এমনিই কোন উদ্দেশ্য ছিল মোগল স্থাপত্যের ইতিহাসে।

সিক্রিতে এখন অল্প লোকের বাস, আর পরিত্যক্ত সৌধগুলি কিছু উপরে। প্রথমেই আমরা দেওয়ান-ই-আমের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলুম। কিন্তু ভাল করে দেখতে ইচ্ছা হয় নি। ললিতা বৌদির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। সত্যিই আমার মন খারাপ হয়েছিল তাঁকে আনতে পারি নি বলে। বাহিরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা মাসিমা পছন্দ করেন না। ব্রজেশের সঙ্গে আসতে দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। আমি ট্রেনের কথা জিজ্ঞাসা করি নি। আমার সঙ্গে ট্রেনে আসতে দিতেও কি তাঁদের আপত্তি হত!

দেওয়ান-ই-খাসের একটি স্তম্ভ আমরা খানিক ক্ষণ সময় নিয়ে দেখলুম। থামটি সরু, তার মাথায় একটা বিরাট আকৃতির কারুকার্য। সহসা এটি অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

এরই নিকটে জ্যোতিষীর ছত্রি আর আঁখ মিচৌলি। ব্রজেশ জিজ্ঞাসা করল: জ্যোতিষীর ছত্রির কেন দরকার হয়েছিল জান তো?

না।

জ্যোতিষীর গণনা না শুনে আকবর এক পাও নড়তেন না! এমন কি জামা-কাপড় পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ মাফিক ব্যবহার করতেন। বৃহস্পতি তাঁর লগ্নাধিপতি এবং প্রতি দিন তাঁর রাজকার্যের জন্য ঠিকুজি তৈরি হত। তিনি গলায় পান্না পরতেন, আর বাহুতে নীলা। এও জ্যোতিষীর নির্দেশ। আকবর তাঁর পোশাকে তিনটি রঙ ভালবাসতেন—হলদে, হাল্কা ও গাঢ় বেগনি। সাধারণত তিনি গুজরাটি কায়দায় বেগনি পাগড়ি মাথায় বাঁধতেন, আর আঁটসাঁট কামিজের ওপর হলদে কোমরবন্ধ। প্রতি দিন সকালে জ্যোতিষী এই রঙের বাহারও অদল বদল করতেন।

আশ্চর্য!

এ সবে আকবরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বিপদে পড়ে বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস করে তিনি নিরাপদ ভাবতেন। তাঁর পোশাক ও কপালের তিলক দেখে তাঁকে হিন্দু বলে মনে হত এবং তিনি দাড়ি রাখার বিরোধী ছিলেন। আঁখ মিচৌলির সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্রজেশ বলল: আঁখ মিচৌলি হল কানামাছির মতো এক রকম খেলা। এ নাম কেন হল জানি নে। তবে এর ভেতরের গড়ন দেখে অনেকে এটিকে অলঙ্কারের ঘর মনে করেন।

যোধবাঈর প্রাসাদে একটা জিনিস চোখে পড়ে। মোগল স্থাপত্যের সঙ্গে রাজপুত স্থাপত্য রীতি একেবারে অঙ্গাঙ্গী মিলে আছে। যোধবাঈএর সঙ্গে ছেলের বিবাহ দেবেন ভেবেই আকবর এই

মহলটি তৈরি করেছিলেন। পুত্রবধূর প্রীতির জন্য একটি তুলসি মঞ্চ পর্যন্ত গড়েছিলেন। কিন্তু ছেলে-বউ এখানে বাস করেছিলেন কিনা জানা যায় নি। ঠিক এই সময়েই ফতেপুর সিক্রি জলের অভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

তুর্কী সুলতানার বাড়ি বলে যে বিরাট ঘরখানি পরিচিত, তা তাঁর পাটরাণী ব্যবহার করতেন, না নিজে তাতে বিশ্রাম নিতেন, বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন যে আকবর এই ঘরে পড়াশুনা করতেন।

ব্রজেশ বলল: আকবরের বাতি জ্বালাবার নিয়ম বড় বিচিত্র ছিল। এক সঙ্গে ছত্রিশটি বাতি জ্বলত, তার মধ্যে বারটি সাদা আলো। সোনার শামাদানে জ্বলত বারোটি মোমবাতি, আর বারোটি রুপোর শামাদানে। ছ হাত লম্বা মোমবাতির কথা কখনও শুনেছ?

সে তো ছুটো মানুষের সমান?

শুনেছি তাঁর মোমবাতি হত ছ হাত লম্বা। রাজা বাদশাহের ব্যাপার! হতেও পারে, কী বল?

কী উত্তর দেব আমি ভেবে পেলুম না।

ব্রজেশ বলল: পিলসুজে সলতের বাতিও জ্বলত। এক এক তিথিতে তার এক এক সংখ্যা। সে সব মনে রাখা অসম্ভব ব্যাপার।

মরিয়মের মকান নামে পরিচিত মহলটি কার ছিল, এই নিয়ে তর্ক আছে। কেউ বলে এক খ্রীষ্টান মহিলার, কেউ বলে সেলিমা বেগমের, আবার কেউ রাজা বিহারী মলের কন্যা মরিয়ম জমানির মহল বলে নিশ্চিন্ত হয়েছে। দেওয়ালের ছবি ও স্থাপত্যের নমুনা দেখে হিন্দু মহিলার ঘর বলেই সন্দেহ হয়।

পাঁচতলা পাঁচমহল দেখে আজও সবাই আশ্চর্য হয়। এই অদ্ভুত বাড়িটি কেন তৈরি হয়েছিল তা ভেবে পায় না। কেউ বলে, এটি পাহারার টাওয়ার, কেউ বলে হারেমের বেগমরা এখানে

হাওয়া খেতেন। জাহানারার আত্মকাহিনীতে আমি অন্য কথা পড়েছিলাম। বৌদ্ধ স্থাপত্য-রীতিতে তৈরি এই মহলটি আকবরের নূতন ধর্ম দীন ইলাহির শিষ্যদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। নিচের তলায় তাঁর শিষ্যরা ধর্মালোচনা করত। পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করে তাঁর শিষ্যরা সন্ন্যাসী হবে না, সকল সম্পদ তারা বাদশাহকে নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। দোতলার শিষ্যরা বাদশাহের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করবে না। এই পাঁচ মহলের পাঁচ তলায় পাঁচ স্তরের ইলাহি শিষ্য সাধনা করত।

জাহানারা আকবরকে তাঁর আদর্শের জন্য শ্রদ্ধা করত। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে আকবর ভালবাসতেন, ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ দেশের মানুষের ভক্তি ও সৌন্দর্যবোধ তাদের ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে। আকবর তাই তাঁর নূতন ধর্মে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন।

জাহানারার কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ল। ঔরঙ্গজেবকে বলেছিল, 'হে শক্তিমান, তুমি ভগবানকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস না। তোমাকেও মানুষ ভয় করবে, ভালবাসবে না। যখন সম্রাট আকবর এক খণ্ড তাম্র মুদ্রা দান করতেন, সে মুদ্রা স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু তুমি যা দান কর, তা কণ্টকে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। সম্রাট আকবর মিলনের প্রয়াস করেছিলেন, আর তুমি ধ্বংসের অভিযান করে চলেছ।'

আকবর বলতেন, 'মানুষের অন্তর সহস্র পথে লক্ষ্যের সন্ধান করে।' তাই তিনি সবাইকে তার আপন আপন পথে লক্ষ্যে পৌঁছবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন।

জাহানারা বলেছিল, 'ঔরঙ্গজেব হিন্দুকে ঘৃণা করেন। আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম বিশ্বাসকে ঘৃণা করেন। আর স্বর্গকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। কোরাণের দুই মলাটের অভ্যন্তরে যারা এই পৃথিবীকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেব স্বর্গের

একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কোরাণকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁদের শাসন কালে হিন্দু প্রজাগণ নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব আপনাকে ঈশ্বরের মতো নির্ভুল মনে করেন।'

ঔরঙ্গজেব ভাবতেন যে ইসলামের সেবা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কিন্তু কেউ তাঁকে বলে নি যে অপরের ধর্মকে ঘৃণা হল ভগবানের বিধানে নিকৃষ্ট অধর্ম।

জাহানারা সেদিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা সত্যে পরিণত হয়েছে। রাজ্য নিয়ে ঔরঙ্গজেব শতরঞ্চ খেলছিলেন। 'যদি তিনি জয় লাভ করেন তবে সম্রাট আকবরের মহানুভব রাজ্যে যা কিছু ভাল ছিল, সবই নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুস্থান আবার সেই অন্ধকারে ডুবে যাবে। সম্ভবত শত শত বর্ষ ব্যাপী—'

ব্রজেশ আমাকে বাধা দিয়ে বলল: ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি?

আমি চমকে উঠে বললুম: কেন বল তো?

একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেছ!

এ কথা অস্বীকার করতে পারলুম না। বললুম: আর ভাল লাগছে না।

ব্রজেশ মেনে নিয়ে বলল: তবে চল। গাড়িতে খাবার আছে, খেতে বসি।

বীরবলের বাড়ির ভিতরে আমরা ঢুকলুম না। ব্রজেশ বলল: এ বাড়ি আদৌ বীরবলের ছিল কিনা সন্দেহ। বরং আকবরের কোন হিন্দু বেগমের বাড়ি বলে মনে হয়।

সেখ সেলিম চিস্তির দরগা আমরা দেখলুম না, জামি মসজিদও না। তার দক্ষিণে বুলন্দ দরওয়াজা না দেখে উপায় নেই। এত বড় দরজা পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঘুরে সামনের দিকে আর গেলুম না। গাড়িতে ফিরে এসে আমরা খেতে বসলুম।

ব্রজেশ বলল: এই খাবার কে দিয়েছে জানো?

বললুম ঃ জানি নে।

তোমার ভাবি।

সব জিনিস গুছিয়ে দেবার যত্ন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে এ নিশ্চয়ই ললিতা বৌদির কাজ। কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে বললুম ঃ ও।

ফেরার পথে ব্রজেশ আমাকে আকবরের সমাধি সিকান্দ্রা দেখাল। একটি সুন্দর দরজা পেরিয়ে প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাগান। তার পরে চার-তলা সমাধি সৌধ। সবচেয়ে উপরের তলাটি মর্মরের। এর কোন্ প্রকোষ্ঠে আকবর নিদ্রিত আছেন, তা আমি দেখতে যাই নি।

তাঁর একটি বিধানের আমি মানে খুঁজে পাচ্ছিলুম না। শাহ-জাদীদের বিবাহ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। হয়তো তাতে সিংহাসনের দাবিদার কয়েকজন কম হয়েছিল, কিন্তু জীবন ব্যর্থ হয়েছিল অনেক জনের। দুজনের নাম আমরা জানি—জাহানারা ও জেব উন্নিসা। শাহজাহান-কন্যা জাহানারা তাঁর আত্মকাহিনীতে নিজের ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘ শ্বাস রেখে গেছেন, আর ঔরঙ্গজেব-নন্দিনী জেব উন্নিসা তাঁর সুন্দর কবিতার জন্য আজও বেঁচে আছেন। তাঁর কলঙ্কের কথা তো সত্য নয়, সত্য তাঁর কবিতা।

জাহানারা বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে যে আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেছে, তুমি সেই আনন্দের কণাগুলি স্বর্গে সংগ্রহ কর। আবার সেই আনন্দকে পরিশোধিত করে নূতন জগতে মানুষকে ফিরিয়ে দাও।'

ললিতা বৌদিও কি তাঁর আনন্দের কণাগুলি ফিরে পাবেন!

যমুনার পুল পেরিয়ে ট্রেন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবু দেখতে পাচ্ছি শাহজাহানের তাজমহল। আর মনে পড়ছে ললিতা বৌদিকে। গরদের সাদা থান পরা বিধবা ললিতা বৌদি। ঐ তাজমহলের মতো সাদা সুন্দর ও পবিত্র। আমার স্মৃতির খাতায় নাম তাঁর পাকা হয়ে গেছে।

৩৩

তাজমহল মিলিয়ে যেতেই আবার দিল্লীর কথা মনে পড়ল। মিস্টার ব্যানার্জির বাড়িতে আহার সেরে আমরা যখন ফিরে এলুম, নর্থ অ্যাভেন্যুর সরকারী কোয়ার্টার তখন থম থম করছে। রাণাকে আমরা নামতে বললুম না, তবু সে নামল।

বসবার ঘরে বাতি নেই। তাতেই বোধ হয় একটু দমে গেল। বলল: অনেক রাত হয়েছে, আজ আর ওঁদের বিরক্ত করব না। চলি, কেমন!

বলে স্বাতির দিকে চাইল।

হাত জুড়ে স্বাতি তাকে নমস্কার করল। আমি বললুম: আসুন।

অন্য দিন হলে গাড়ি পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতুম। কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত মনে হল। দেহটাকে বয়ে বেড়ায় যে মন, সেই মনই বেশি ক্লান্ত হয়েছে।

রাস্তার উপর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই মামা বেরিয়ে এলেন। মামীও এলেন তাঁর পিছনে।

বললুম: এখন ভাল বোধ করছেন তো মামীমা?

বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। অসুস্থতার জন্য যে মামী যান নি, সেই কথাটাই মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। সত্য কথাটাও ভুলে গিয়েছিলুম।

আমার উত্তর দিলেন মামা নিজে। বললেন: তুমিই হাসালে গোপাল, তুমিই হাসালে।

আমি লজ্জা পেলুম।

মামী এগিয়ে এসে বললেন: ও সব থাক্, এখন তোমাদের গল্প বল। কী খেলে কী দেখলে এই সব।

বললুম : স্বাতিকে জিজ্ঞেস করুন, যে খেয়েছে খুঁটে খুঁটে, আর দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

স্বাতি হঠাৎ হেসে উঠল। বলল : গোপালদার যে বিয়ে হচ্ছে মা।

মামী আশ্চর্য হলেন অপরিমিত, বললেন : ওমা, তাই নাকি! তবে যে তুমি বলছিলে—

বলে মামার দিকে চাইলেন।

কী বলছিলুম আমি?

গোপাল সব ভেস্তে দিল বলছিলে!

এবারে মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন : তা তুমি যাই বল, ও কাজটা তুমি ভাল কর নি বাপু!

কোন্‌টা মামাবাবু?

নীতীশ হাজার হলেও একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তাকে তোমার অমন করে বলা উচিত হয় নি।

মামা কোন্ কথাটির উল্লেখ করলেন, আমি বুঝতে পারলুম। কিন্তু স্বাতি পারল না। সে তখন উপস্থিত ছিল না। বলল : কী কথা গোপালদা?

বললুম : দিল্লী দেখা হল কিনা, সন্ধ্যে বেলায় মিস্টার ব্যানার্জি জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে সত্যি কথাই বলেছিলুম। দিল্লী তো দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে দিল্লীর জাদুঘর আর চিড়িয়াখানা। বুঝতে না পেরে তিনি বলেছিলেন, সে কি! অসাবধানতায় আমি বলে ফেলেছিলুম, ঠিকই বলছি। দিল্লীতে মানুষ দেখতে এখনও বাকি আছে।

মামা আপত্তি করে বললেন : কথা যাই বলে থাক, মানেটা তার অন্য রকম দাঁড়িয়েছিল। পরিচয় যাদের সঙ্গে হয়েছে তাদের তুমি মানুষ মনে কর না, এমনি একটা উদ্ধত ভাব।

আমি আপত্তি করে বললুম : না না, এ আপনি ভুল বলছেন। এমন কথা আমি বলতে চাই নি।

মামী বললেন : ভদ্রলোকের গরজ কিসের বলতে পার ?

গরজ হবে না ? অত বড় সম্পত্তির মালিক যে হবে, তার গোলাম হতেও নীতীশের আপত্তি হবে না।

শুধু কি তাই ?

কিন্তু মামা এ কথার উত্তর দিলেন না।

মামী আবার বললেন : মিত্রা মেয়েটা প্রথম যেদিন এসেছিল, বেশ একটু নাক উঁচু দেখেছিলাম। কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কাল থেকে তাকে আর এক রকম দেখছি। আজ তো অন্য মেয়ে বলেই মনে হল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে। মামী বললেন : আমি তো কথাবার্তা বুঝি না। আমি তার নাক ভ্রূ আর কপাল দেখেই এই সব বলছি। এখন ওসব আমাদেরই মতন। চোখের চাহনিও আগের মতন তীক্ষ্ণ নয়।

আমি আরও একটু বলতে পারতুম। ওখলায় আমি তার হাসি দেখেছি, মিষ্টি হাসি। কিন্তু সে কথা বলতে পারলুম না।

মামার মুখে খানিকটা পুলকের চিহ্ন দেখে মামী হঠাৎ লজ্জা পেলেন। কিন্তু তার পরেই মামার পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। দেখতে দেখতে ঝিমিয়ে গেলেন। তাঁর পুলক গেল মিলিয়ে।

স্বাতিও আর অপেক্ষা করল না। কথা না বলে ভিতরে চলে গেল।

মামা আমায় বসতে বললেন। নিজেও বসলেন। বললেন : তোমাকে দুটো কথা বলবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি।

কিন্তু কথা না বলে মামা তাঁর পাইপ ধরাতে লাগলেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম সেই কথা শোনবার জন্য।

পাইপ ধরিয়ে কিছু ধোঁয়া নিতেই মামার মুখ খুলল, বললেন : স্বাতির সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ আছে।

আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই বটে। স্বাতির সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবে দেখেছ কি ?

আমি! আমি ভাবব স্বাতির সম্বন্ধে!

মামীও বসে ছিলেন মামার পাশে। অসহায় ভাবে আমি মামীর দিকেই তাকালুম। কিন্তু মামী আমাকে সাহায্য করলেন না।

মামা বললেন: স্বাতিকে রাণা বিয়ে করতে চায়, নীতীশেরও সেই ইচ্ছে। পাত্র হিসেবে রাণা তো মন্দ নয়। কিন্তু স্বাতি যে আমার একমাত্র মেয়ে, সে কথা আমি কী করে ভুলি!

কিন্তু কেন ভুলতে হবে ?

উত্তর দিতে গিয়ে মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: চোখ বুজে ঘুমের ভান কোরো না গোপাল। তোমাকে স্নেহ করি বলে তোমার অর্বাচীনতার প্রশ্রয় আমি দিতে পারি নে।

তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিলুম।

ঘন ঘন পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন: আমার কাছে সাহায্য নিতে তোমার কিসের আপত্তি ? সরলাদির ছেলে না হয়ে তুমি আমার ছেলেও তো হতে পারতে ?

তা পারতুম। কিন্তু বলতে পারলুম না যে এ সমস্যার সমাধান তাতে হত না, বরং জটিল হত, ধিক্কৃত হতে হত সভ্য সমাজে।

মামা বললেন: তুমি চুপ করে থেকো না গোপাল, কিছু বল। উত্তর দাও আমার কথার।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না। যা বললে মামা খুশী হন, তা বলতে পারি না। কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় বসে স্বাতির কাছে অঙ্গীকার করেছি, মামার কাছে সাহায্য নেব না। স্বাতির মনের কথা আমি বুঝি। যে সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আছে, সে সুযোগ আমি চেয়ে নেব না, কেড়ে নেব। আদর্শ থাকবে না শুধু কথায়, জীবনটাই আমার আদর্শ হয়ে উঠবে। পার্থিব সুখের বদলে স্বাতি আত্মিক তৃপ্তি চায়। সেই আশা থেকে

তাকে বঞ্চিত করলে সে আমায় ক্ষমা করবে না। মামার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মামা বললেন: বুঝেছি, তুমি আমার কাছে সাহায্য নেবে না। তুমি সাহায্য নেবে জ্ঞানশঙ্করের কাছে, অনাত্মীয়ের কাছে।

মামা উঠে গেলেন। মনে হল, অস্পষ্ট ভাবে বলে গেলেন যে মেয়েকে তিনি বিধবা দেখতে পারবেন না।

মামী আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর বললেন: ভাল করে তুমি ভেবে দেখ বাবা, স্বাতির সঙ্গেও কথা বল।

একটু থেমে বললেন: সবই তো তোমাদের, শুধু দু দিন আগে আর দু দিন পরে। আপত্তি করে তুমি আমাদের দুঃখ দিও না।

ভেবে দেখবার কিছুই নেই, তবু আমি মামীকে আশ্বাস দিলুম, বললুম: আচ্ছা, ভেবে দেখি।

উৎসাহ পেয়ে মামী বললেন: আমরা বেঁচে থাকতে তোমরা কষ্ট করবে, এ কিছুতেই সইতে পারব না। সেই জন্যেই তো এত চিন্তা।

এবারে মামীও উঠে গেলেন।

অন্য দিনের মতো বাহিরেই আমার খাট পড়েছিল। জামা খুলে আমি বাহিরেই শুয়ে পড়লুম।

রাত গভীর হয় নি। গভীর হল আমার চিন্তা। এ কোন্ সমস্যা আমার জীবনে আজ ঘনিয়ে উঠল! কত সুখী ছিলুম কয়েকটা মাস আগে। উত্তরপাড়ায় আমার ছোট ঘরখানি, নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিস। তারপর ফিরে এসে কী অবাধ স্বাধীনতা! লাইব্রেরির রাশি রাশি বই, লাইব্রেরিয়ান মুকুন্দবাবু, হারানিধির হোটেল। কোথাও কোন সমস্যা নেই। পাহাড়ি নদীর মতো তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল আমার স্বাধীন জীবন। হঠাৎ এক দিন হাওড়া স্টেশনে এঁদের সঙ্গে দেখা হল। এঁরা রামেশ্বর

যাচ্ছিলেন, যাচ্ছিলেন কন্যাকুমারী। আমার পুজোর ছুটি সে দিন শুরু হয়েছিল, আমিও সঙ্গে গেলুম তাঁদের চাকর রামখেলাওনের বদলি হয়ে। সেই আমাদের পরিচয়। আর আজ কয়েকটা মাস পরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে জীবনে ঘিরে।

এই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে সাধারণের ভিতর আমি অসাধারণ হয়ে উঠলুম কী করে? ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে কেন আমায় সিংহাসনে বসানো হচ্ছে? আমার মতো মানুষে তো বাঙলা দেশ ছেয়ে আছে। কই, তাদের তো কারও এমন সুযোগ আসছে না!

সুযোগই তো বলব। সুযোগ ছাড়া আর একে কী বলা যায়? আমি ভাবতে লাগলুম, এমন না হোক, সামান্য সুযোগও কেন সকলের ভাগ্যে জোটে না। একা না নিয়ে ভাগ করেই না হয় নেব। কিন্তু তাই বা আজ কোথায়!

শিরশির করে হাওয়া আসছিল দক্ষিণ থেকে বামে। খাটের নিচে কয়েকটা শুকনো পাতা খসখস করে উঠল। আমি চমকে উঠলুম। ভেবেছিলুম, স্বাতির আঁচলের শব্দ: আমি কি তারই অপেক্ষায় জেগে আছি?

মনে হল, ঘরের ভিতর মামীর গলার স্বর শুনলুম। অস্পষ্ট শব্দ। চাপা গলায় ভর্ৎসনার মতো শোনাচ্ছে। মামী কি স্বাতিকে ভর্ৎসনা করছেন?

কিন্তু কেন করবেন! সে তো কোন অন্যায় করে নি। ভাবতে ভাল লাগল যে স্বাতি আমার কাছে আসছে, মামী সেই নির্দেশই দিলেন স্বাতিকে। তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, স্বাতির সঙ্গে কথা বলতে। তবে কেন তাকে আমার কাছে পাঠাবেন না?

মনে হল, আজকের বাতাসে কিছু উত্তাপ আছে। উত্তাপ উঠছে নিচের জমি থেকেও। নয়া দিল্লীর নর্থ অ্যাভেন্যুএ সারা বছরই গরম থাকে। এখনও আছে। প্রতিদিন বাড়বে।

কিন্তু স্বাতি আসছে না কেন? এতক্ষণ তো তার আসা উচিত

ছিল। রোজই তো সে আসে। আজ তার প্রয়োজন আছে বলেই কি সে আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে? জানি না তার মনের কথা, তার ছলাকলাও বুঝি নে। আমি যে আজ বিপন্ন, শুধু এইটুকুই যেন বুঝতে পারছি।

ইচ্ছে হল, এক বার উঠে গিয়ে স্বাতিকে ডেকে আনি। ডেকে এনে আমার ভাবনার ভার তারই উপর চাপিয়ে দিই। আমি ভেবে মরব, আর সে আরামে ঘুমোবে, এ আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। সেও ভাবুক, সেও বুঝুক, সেও বলুক। আমাকে দেখুক তার নিজের মন দিয়ে।

আশেপাশের বাতিগুলো একটা একটা করে নিবে গেল। থেমে গেল চারি দিকের কোলাহল। নয়া দিল্লী ঘুমিয়ে পড়ছে। কয়েক ঘণ্টার মতো আর তার সাড়া পাওয়া যাবে না।

তবু স্বাতি এল না।

৩১

সকাল বেলায় চাওলার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল, চোখ রগড়ে উঠে বসেই আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম।

তুমি এত সকালে!

ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে চাওলা বলল: চুপ। সবাই জেগে যাবেন।

ভোরের আলোয় চারি দিক ঝকঝক করছে, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের উদয় হয় নি। আশেপাশের আরও কয়েকখানা খাড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে আরও অনেকে শুয়ে আছেন। তাই দেখেই বুঝতে পারলুম যে ঘুম ভাঙতে আমার বেশি বিলম্ব হয় নি। চুপিচুপি চাওলা বলল: তুমি পালিয়ে গেছ কিনা দেখতে এসেছি।

পালাব কেন?

চিন্তিত ভাবে চাওলা বলল: তা হলে কি আমারই ভুল হল? কিন্তু চাওলা তো সহজে ভুল করে না!

আমি তার গর্ব দেখে হাসলুম।

হাসছ কেন? আমি ঠিক কথাই বলছি। যে রকম পরিস্থিতির ভেতর পড়েছ, তাতে তোমার পালানোই উচিত ছিল। না পালিয়ে তুমি তোমার বোকামির পরিচয় দিয়েছ।

সে কি!

বলে আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

চাওলা বলল: তুমি যে ইচ্ছে করে বোকা সাজছ! তোমাকে বোঝাই কী করে?

সত্যি বলছি, আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

তবে কি রাণার অনুমানই মিথ্যে?

দুর্বলের ঐটুকুই তো আশ্বাস।

দুর্বলের কেন, সবলেরও। তোমারও থাকা উচিত।

আমি তো তোমার মতো ভীরু নই, সত্য বলতে কোন দিন ভয় পাই নে। মিত্রার আশা আমি আজও ছাড়ি নি। কেন ছাড়ি নি জান?

জানি না তো।

চাওলা বলল: পেছনে তুমি যে আত্মীয়ের ডাক শুনছ, সেও তাই শুনছে। তোমার অনুভূতি স্পষ্ট বলে তুমি তা বুঝতে পারছ, সে পারছে না। আজ না পারলেও কাল পারবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। চাওলা বলল: তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই কথা, না?

আশ্চর্য লাগছে।

লাগবে বৈকি। যত ক্ষণ তুমি কোন সিদ্ধান্ত না নিচ্ছ, তত ক্ষণই লাগবে। তার পর আমার কথা স্বীকার করবে। ভালবাসা তো বুদ্ধির কথা নয়, যুক্তিরও নয়। ভালবাসা অনুভবের কথা, বিশ্বাসের কথা।

সত্যি কথা।

খুশী হয়ে চাওলা বলল: আমার আর একটা প্রশ্ন আছে।

সেটাও বল।

চাওলা একটু সঙ্কোচ করে বলল: কিছু স্থির করেছ?

না।

আরও কিছু শোনবার অপেক্ষা করে চাওলা বলল: তোমার আত্মীয় কী বলেন?

বিপদ তো সেইখানেই। তার মুখে কথা নেই, ব্যবহারে প্রভেদ নেই, মনে কী আছে তা জানি নে।

চাওলা গম্ভীর হয়ে রইল খানিকক্ষণ, কিন্তু মিত্রার সম্বন্ধে

আমার মনোভাব কী তা একবারও জিজ্ঞাসা করল না। বড় স্বস্তি পেলুম তাতে।

এবারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

অন্যমনস্ক ভাবে চাওলা জবাব দিল: বল।

আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

এক নিমেষে চাওলার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল। হেসে উঠল উচ্চ স্বরে।

বললুম: কী হল?

তুমি আমায় কী সাহায্য করবে?

আমি লজ্জা পেলুম অপরিসীম। বললুম: আমাকে তুমি কি এতই অপদার্থ ভাব?

চাওলা হেসে বলল: ঠিক উল্টো। কাজে তুমি আমায় অপদার্থ প্রমাণ করে দিয়েছ। আমি আজ দু তিন বছরে যা পারলাম না, তুমি দু তিন দিনে তাই করলে!

তবে কেন ভাবছ যে সাহায্য করতে পারব না?

মিত্রাকে কিছু অনুরোধ করবে তো! আমার প্রতি সদয় হতে বলবে?

দোষ কী!

চাওলা উত্তর দিল: ছি ছি! আমায় তা হলে যমুনায় ডুবে মরতে হবে।

আর আমি যদি বিয়ে না করি?

আমার জন্যে না করলে আমার উপকার হবে না, হবে আর কারও। অর্থাৎ হাতি জিরাফে যখন গলাগলি জড়াজড়ি করে বলবে আপ খাইয়ে, আপ খাইয়ে, তখন ও ফল খেয়ে যাবে বাঁদরে।

আমি হেসে ফেললুম তার কথার ধরনে। বললুম: তবে কী করতে পারি বল!

চাওলা বলল: কিছুই না, শুধু সত্যি কথাটা বললেই আমার উপকার হবে।

কী কথা বল তো?

আর কোন ভূমিকা না করে চাওলা জিজ্ঞাসা করল: স্বাতিকে তুমি ভালবাস?

সমস্ত শরীরটা আমার কেঁপে উঠল। ভোরের বাতাসে এত শীত তখনও লেগে আছে!

চাওলার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে আমি ধরা পড়ে গেলুম। হেসে বলল: থাক্, ওতেই হবে। আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। মুখের উত্তর শুনে কী করব!

অত্যন্ত প্রসন্ন মেজাজে চাওলা উঠে দাঁড়াল। বলল: চলি এবারে। ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, ক্ষমা কোরো।

হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিয়ে বললুম: নিজের কাজ সেরেই তুমি চলে যাবে, তা হবে না। আমাদেরও কিছু কাজ আছে।

আপত্তি না করে চাওলা বসে পড়ল।

আমি পালিয়েছি কিনা দেখতে এসেছিলে, কিন্তু কেন পালাব ভেবেছিলে তা তো বললে না!

লোকে পালায় কেন? ভয় পেলেই তো পালায়!

ভয় পাবার আবার কী হল? আমি কি বাঘের হাতে পড়েছি, না ভালুকের?

বল কি, নারী কি বাঘ ভালুকের চেয়েও সাংঘাতিক নয়!

বলেই চাওলা আঁৎকে উঠল।

কী হল?

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়েই সে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে স্বাতি এই দিকেই আসছে। প্রসন্ন তার দৃষ্টি, মুখে স্মিত হাসি, উদ্বেগের চিহ্ন

নেই কোনখানে।

চাওলা নমস্কার করল। উত্তরে স্বাতি বলল : আজ দিনটা আমাদের ভাল যাবে।

কেন বলুন তো ?

কেন আবার, সকাল বেলাতেই আজ মিস্টার চাওলার মুখ দেখলাম।

তবেই হয়েছে ! আমি মানুষটাই যে অপয়া। আমার মুখ দেখে আবার বিপদ না ঘটে। আজ আপনি শিবের মাথায় একটা বেলপাতা বেশি চড়াবেন।

আমিও হাসলুম।

স্বাতি বলল : গোপালদার বেড টী আজ মারা গেল।

কেন ?

কেন আবার ! সকাল বেলায় চোখ বুঁজে বুঁজে চা খান, আজ আর তা হল না।

চাওলা আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনি কি রোজ এই চা যোগান ?

কী করি বলুন, এই চাটুকু না পেলে সারা দিন মনটা এঁর অপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

তাই বলে এই আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে হবে ?

দু দিনের জন্যে দিল্লী এসেছেন, দেশে ফিরে গিয়ে বদনাম করবেন যে !

চাওলা বলল : শুনেছি তো একলা থাকেন, সেখানে এই কাজটি কে করে ?

বোধ হয় কোন চাকর-বাকর।

হেসে বললুম : ও সব বালাই নেই, তবে চা ঠিক পাই।

দু জনেই আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : মোড়ের ওপর হারানিধির চায়ের দোকান। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে।

দোকানের একটা ছোকরা আসে চা নিয়ে। মাথার জানালার কাছে তিপাই আছে, হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁড় রাখে, শীতের দিনে দু ভাঁড়, বাদলার দিনেও।

দু জনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

স্বাতি বলল: হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে চল। বাবাও আজ উঠে পড়েছেন।

বল কি, মামাবাবু তো এত সকালে ওঠেন না!

স্বাতি বলল: আজ উঠেছেন। ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন জোরে জোরে।

রাতে কি তিনি তাহলে ঘুমোন নি? মনে মনেই আমি এই কথা ভাবলুম। স্বাতি তখন ঘরের ভিতরে ফিরে গেছে।

চাওলা বলল: আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

আবার কি কথা?

তোমার মামা মামী কি তোমাদের কথা জানেন না? তাঁরা কেন চুপ করে আছেন?

না থেকে আর উপায় কী! সমাজে তাঁদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এক জন সামান্য কেরানীর সঙ্গে তো তাঁদের এক মাত্র মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না।

চাওলা এ কথা চট করে স্বীকার করল, বলল: এ মনোভাব আমাদের শীঘ্র যাবে না! কিন্তু—

কিন্তু কী?

তাঁদের তো অনেক সম্পত্তি আছে শুনেছি, ব্যবসাও আছে। আর মেয়ে ঐ একটি।

আমি তার কথার মাঝেই মন্তব্য করলুম: তাতে আমার পদমর্যাদা তো বাড়ে না!

আমি অন্য কথা বলছি। বলছি, তোমার আর কেরানী থাকার কী প্রয়োজন? আমার মতো একটা বিজনেসম্যান হতে পার। বিজনেস

বাঁ হাতের, না রাতের, তা নাই বা কাউকে বললে।

চাওলার বলার ভঙ্গিটি ভাল। না হেসে থাকা যায় না। বললুম: সে চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন।

তুমি ছেড়ে দিলে?

ছেড়ে দিই নি। তাঁদের সে প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি নি।

কেন?

আমার আদর্শে বাধল।

আর কিছু?

স্বাতি আমার দারিদ্র্যকে ভয় পায় না, ভালবাসে আমার আদর্শকে। মামার দান নিয়ে স্বাতির চোখে নিজেকে ছোট করতে পারলুম না।

তবে অন্যত্র কেন করলে?

তুমি কি এলাহাবাদের কথা বলছ? জ্ঞানশঙ্করবাবুর সম্পত্তি লাভের কথা?

ঠিক তাই।

আমি সহসা এর উত্তর দিতে পারলুম না।

চাওলা বলল: বুঝেছি।

না, বোঝ নি তুমি।

চাওলা যা বুঝেছে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করল। বলল: এক সঙ্গে দুটো চাও নি, রাজত্ব আর রাজকন্যা। রাজকন্যার দৌলতে রাজা, এই চিন্তার ভেতর একটা মানসিক গ্লানি আছে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: আমি জানি, তুমি এই ভুল করবে। যারা নিতান্ত সংসারী তারাই এই সব ভাবে।

চাওলা বিচলিত হল না, বলল: তুমি ঠিকই বলেছ। প্রয়োজন বোধের ব্যাপারে আমি একটু বেশি প্র্যাকটিকাল এবং আমার বিশ্বাস যে আমি কিছুই হারাব না। আমার দাবীর মধ্যেও সে দৃঢ়তা আছে।

আমি হেসে তার উত্তর দিলুম: আমার ঠিক উল্টো। আমার মধ্যে

দৃঢ়তারই একান্ত অভাব। পাওয়া জিনিসও আমায় হয়তো হারাতে হবে শেষ পর্যন্ত।

চাওলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল: এ সব আলোচনার শেষ নেই ভাই। তার চেয়ে আজ চলি।

আমাকেও নিয়ে চল।

কোথায় যাবে?

অসতর্ক ভাবে আমি উত্তর দিলুম: কলকাতায়।

সে কি! কবে যাবে, কেন যাবে?

চাওলা এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করল।

বললুম: এই গোলমালের ভেতর থেকে আমি পালাতে চাই।

মিষ্টি হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে স্বাতি এল কাছে, বলল: পরে পালাবে, তার আগে চা খেয়ে নাও।

চায়ের টেবিলে বসে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। সত্যিই বড় ঝিমিয়ে গেছি। স্বাতির নিশ্চিন্ত আচরণই সব চেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছে। রাণাকে সে বিয়ে করবে করুক, কিন্তু অতীতটা তার জন্যে মুছে যাবে? মনটাকে তৈরি করতেও কিছু সময় নেবে না?

পরিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে মামা প্রথম কথা কইলেন, বললেন আমাকে: ব্যবহারে প্রকাশ কর যে তোমার একটা আদর্শ আছে। কিন্তু সেই আদর্শটা কী, তা আজও বল নি।

বিশ্বাস করুন, আমিও তা জানি না। আর জানি না বলেই আমার শান্তি নেই।

মামার দৃষ্টিতে কিছু বিস্ময় ছিল। তাই যুক্তি দিয়ে নিজের কথাটা প্রমাণের চেষ্টা করলুম: দেশে আজ নানা রকমের আদর্শ, সংঘাত দেখি আদর্শের সঙ্গে আদর্শের। তাদের ভেতর ত্রুটি আছে বলেই তো সংঘাত।

দুধ আর চিনি মিলিয়ে মামা পরিজ মুখে তুলছিলেন। চাওলা চুপ করে সব শুনছিল। বাঙলায় কথা সে কিছু বোঝে।

বললুম : এমন একটা আদর্শের দরকার যা সবার শ্রেয় হবে, প্রিয় হবে, সংঘাত বাধবে না কারও সঙ্গে। সমস্ত আদর্শের লোক তাকে আপন বলে গ্রহণ করবে।

তা কি সম্ভব ?

কেন সম্ভব নয়! মানুষের কল্যাণ যদি লক্ষ্য হয় তো মানুষ তা বুঝবে না ?

আমার কথার ভিতর বুঝি খানিকটা আবেগ এসে পড়েছিল। নিজেকে তাই সামলে নিলুম।

চাওলা হেসে বলল : সব আদর্শের লক্ষ্যই তো মানুষের কল্যাণ, তবু কেন আদর্শের সংঘাত ?

তার পর নিজেই উত্তর দিল : কল্যাণের ধারণা সবার সমান নয়, আর এই কল্যাণ সাধনের পথও অনেক। রোজই তো নতুন কথা শুনছি।

আমি কী ভাবছিলুম জানি না। বললুম : আজ আমার ছুটি চাই মামাবাবু।

মামা আশ্চর্য হলেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। বললেন : সে কি !

বললুম : সত্যি, আজ সকালের গাড়িতেই আমি ফিরতে চাই। বেলা বোধ হয় এগারটায় তুফান এক্সপ্রেস দিল্লী ছাড়ে।

মামী টেবিলে ছিলেন না, স্বাতি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

মামার মুখ আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললেন : হুঁ।

৩২

কাঠের বেঞ্চিতে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। পাশের ভদ্রলোক আমায় ঠেলে জাগিয়ে দিলেন: একটু সামলে বসুন। পড়ে যাবেন।

সোজা হয়ে বসে বললুম: কত দূর এলুম আমরা?

ভদ্রলোক মারওয়াড়ী। হিন্দীতেই উত্তর দিলেন: কথা কইলেন শেষ পর্যন্ত!

ওঁদের আশ্চর্য হবারই কথা। গাড়িতে উঠে অবধি আমি কথা কই নি। কার সঙ্গে কইব? কী বা কইব?

আমি উত্তর দিলুম না দেখে নিজেই বললেন: কানপুর পেরিয়ে গেছি, ফতেপুরও।

কানপুর আমি দেখি নি। শুনেছি, এই শহর নাকি উত্তর প্রদেশের আমেদাবাদ। যত কল কারখানা, তত বাজার হাট। যুগীলাল কমলাপতের অনেক মিল চলছে। সাহেবদের মিলও আছে অনেক। চামড়ার কারখানাও বিখ্যাত। শহর বেড়ে বেড়ে চারি দিকে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। শহরের এক ধারে অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি। অন্য ধারে ক্যান্টনমেন্ট। গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে উত্তরে। এই গঙ্গা পেরিয়ে ছোট বড় দু রকম লাইনই লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত গেছে।

কালী নদী যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে, সেই সঙ্গমের নিকট কনৌজ শহর। কানপুর থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক উত্তর পশ্চিমে। পুরাকালে গাধি রাজার রাজধানী ছিল এবং বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়েছিল এইখানে। কনৌজের প্রাচীন নাম কান্যকুব্জ কেন হয়েছিল, পুরাণে তার একটি গল্প আছে। রাজা কুশনাভের এক শত সুন্দরী কন্যা বায়ুকে প্রত্যাখ্যান করে শাপগ্রস্ত হয়েছিল।

তারা কুব্জ হয়েছিল বলেই এই স্থানের নাম হয়েছিল কন্যাকুব্জা বা কান্যকুব্জ।

বৌদ্ধ যুগে কনৌজ দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল। হিউএন চাঙ এখানে এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে। তাঁর ভগিনী রাজ্যশ্রীর গল্প আমরা ইতিহাসে পড়েছি।

কানপুর থেকে সগর যাবার পথে কাল্পি নামে একটি শহর আছে যমুনার তীরে। ফেরিস্তার মতে এই শহর পত্তন করেন কনৌজের রাজা বসুদেব। এই শহরের নিকটেই ব্যাসদেবের জন্মস্থান। সম্প্রতি শুনেছি কাল্পিতে বেদব্যাসের একটি সমাধি নির্মিত হয়েছে।

মারওয়াড়ী ভদ্রলোক এবারে আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন: আবার ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? এলাহাবাদ পৌঁছতে যে আর দেরি নেই!

এলাহাবাদ!

আমি চমকে উঠলুম। আমার এলাহাবাদের টিকিট, এলাহাবাদে নামতে হবে আমাকে। জ্ঞানশঙ্করবাবুর বাড়ি যেতে হবে, সেই কুকুর আর চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে, সেই বৈচিত্র্যহীন নিষ্প্রাণ টানাটানির মধ্যে।

মন্দ কি! আমার মনে হল উত্তরপাড়া আর ডালহৌসি স্কোয়ারের চেয়ে এ খারাপ কিসে? মুকুন্দবাবুর লাইব্রেরির জন্য সেখানে বেঁচে ছিলুম। এখানে কর্তার লাইব্রেরি আছে। সেখানে কোনও বই না পেলে দুঃখ করতে হত, এখানে তা কেনবার সঙ্গতি হবে।

এই জীবন!

বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস উঠল।

তার পর হয়তো মিত্রা আসবে। কিংবা তারই মতো আর কেউ। বুদ্ধির জীবন, তর্কের জীবন। কৃত্রিম জীবন। হৃদয়টাকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে। পাছে তার দুর্বলতা কারও কাছে প্রকাশ

হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে। সভ্য যুগে সভ্য হয়েই থাকতে হবে। মন জানাজানি তো বন্য যুগের রীতি।

পাশের ভদ্রলোক বেশি ক্ষণ চুপ করে রইলেন না। বললেন: কানপুরে তো ঘুমিয়েই রইলেন। এলাহাবাদে কিছু খেয়ে নেবেন।

খাবার আমার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু খাবার ইচ্ছা ছিল না। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললুম: আচ্ছা।

এলাহাবাদ আসছে। জ্ঞানশঙ্করবাবুর এলাহাবাদ। সেখানে লাইব্রেরি আছে, আর আছে কুকুর আর চন্দ্রমল্লিকা। আরও কিছু আছে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম।

কালিন্দী যমুনা! যে যমুনা দিল্লীতে দেখেছি, দেখেছি বৃন্দাবন ও আগ্রায়, সেই যমুনা। জ্ঞানশঙ্করবাবু যে যমুনা দেখেছিলেন যমুনোত্তরীতে, সেই যমুনা। শীতের শেষে শীর্ণ হয়ে আছে তার ধারা। তবু কালিন্দী নীল। দূর্বাদলশ্যামের মতো প্রসন্ন নয়, নীলকণ্ঠের মতো ভয়ার্ত। শরীরের ভিতর শিরশির করে উঠল ভয়ের বিষ।

শীত করছে?

পাশের ভদ্রলোক আমায় প্রশ্ন করলেন।

শীত! তা একটু করছে বৈকি।

ভদ্রলোক বললেন: তা যা বলেছেন! শেষ রাতে বেশ শীত করে।

শেষ রাতে আমিও একখানি চাদর টেনে নিতুম। এই চাদরখানি দিতে স্বাতি কোন দিন ভুলত না। বলত: বাইরে শোও, একটু ঢেকে শুয়ো।

শেষ রাতে চাদর ঢেকে আমি তার স্নেহের স্পর্শ পেতুম। বাহিরের দূরত্ব যতই থাক, মনে হত মনের দূরত্ব আমাদের কমে আসছে। কিন্তু—

রাণার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। তাকে বিয়ে করতে হবে জেনে স্বাতি মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হতেই তার পরিবর্তন

দেখেছিলুম। কিন্তু সে যেন ক্ষণিকের, পরে তার আচরণে আর কোন প্রভেদ দেখলুম না। সহজ ভাবেই তার ভাগ্যকে সে যেন মেনে নিল।

সত্যিই কি মেনে নিল ? মেনে নিয়েছে বৈকি! কোন প্রতিবাদ তো সে জানায় নি!

গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। দু পাশের ঝোপঝাড়ের উপর বিজলীর আলো পড়েছে। তার বাহিরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐখানেই কি পৃথিবীর শেষ ? ওর বাহিরে কি আর কিছু নেই ? মনের চোখ মেলে কি এর চেয়ে বেশি কিছু দেখা যায় না ?

হঠাৎ মনে হয়, চোখের কাজ যেখানে শেষ, মনের কাজের শুরু সেইখানে। তার বিচরণের ক্ষেত্র অবাধ। আমার দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছ হয়ে গেল। মনে হল, স্বাতিকে আমি ভুল বুঝেছি। নীরব থেকেও সে তার নিশ্চিন্ততার পরিচয় দিয়েছে, তার নির্ভরতার, তার দৃঢ়তার। তাকে ভুল বুঝলে নিজেকে ভুল বোঝা হবে।

দিল্লী ছাড়ার সংকল্প যখন নিয়েছি, হাতে তখন সময় ছিল না। রাণা মিত্রাদের খবর দিতে পারি নি। খবর দেবার ইচ্ছাও ছিল না। মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন, মামী বিশ্বাস করেন নি, হেসেছিল স্বাতি।

বললুম : হাসছ কেন ?

তার উত্তরেও স্বাতি হেসেছিল। বড় মিষ্টি হাসি। কিন্তু আমার পৌরুষে যেন আঘাত লাগল। বললুম : হাসলে চলবে না, উত্তর তোমাকেই দিতে হবে।

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল : এত অল্পেই ভয় পেয়ে গেলে গোপালদা ? কবে শক্ত হবে ?

উঃ, কী সাংঘাতিক মেয়ে! ঠিক আমার দুর্বলতার জায়গাটা ধরে ফেলেছে। তবু আপত্তি করলুম : কে বললে আমি ভয় পেয়েছি ?

তোমার মনের কথাও আমায় জিজ্ঞেস করে জানতে হবে!

হাসি মুখে স্বাতি সরে গেল।

কিন্তু আমি আমার মত পরিবর্তন করলুম না।

স্টেশনে পৌঁছে দিতে এলেন মামা মামী। স্বাতিও এল। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটলুম না, কাটলুম তৃতীয় শ্রেণীর। মামা আশ্চর্য হলেন, বললেন : এখনও এই থার্ড ক্লাসে চড়বে!

বললুম : চির দিন যাতে এই ক্লাসে চড়তে পারি, সেই আশীর্বাদ আপনি করুন।

মামা আরও একটু বিস্মিত হলেন।

স্বাতি বলল : কোথাকার টিকিট কাটলে?

এলাহাবাদের!

স্বাতি হাসল।

বললুম : হাসলে যে?

নিজের কর্তব্য স্থির করতে এত দেরি হয় তোমার!

কোথায় দেরি হল?

এর উত্তরেও স্বাতি হাসল।

পাশের ভদ্রলোক হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলেন, বললেন : এলাহাবাদে এসে গেলাম।

আমিও চমকে উঠে বললুম : তাই নাকি!

ভদ্রলোক জবাব দিলেন : দেখছেন না, বামরৌলি এয়ারোড্রোমের আলো।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে সেই আলো দেখলুম। তারপরেই আবার গভীর অন্ধকার। এলাহাবাদে কি অন্ধকার বেশি?

ভদ্রলোক নিজের বিছানা বাক্স সামলাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন : আপনি তো অনেক দূর যাবেন?

আমি?

হ্যাঁ আপনি!

আমারও তো এলাহাবাদের টিকিট! কিন্তু কাঠগড়ার কয়েদীর মতো বুকের ভিতরটা আমার ঢিপ ঢিপ করছে। পাথরের মতো ভারী মনে হচ্ছে নিজের দেহটা।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ কিছু ভেবে না পেয়ে বললুম: উত্তোরপাড়া।

ভদ্রলোক কী বুঝলেন জানি না, আমাকে তিনি নিষ্কৃতি দিলেন।

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা তাতে কমল না। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে। যাত্রীদের অনেকেই এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দরজার দিকেও এগিয়ে গেছেন অনেকে।

পেটের ভিতরটা আমার মুচড়ে উঠল। এক রকমের অদ্ভুত যন্ত্রণা বোধ করলুম। সেই যন্ত্রণা বুকের ভিতর দিয়ে গলা অবধি ঠেলে উঠল। কেমন এলোমেলো হয়ে গেল আমার চিন্তার ধারা।

চোখ বন্ধ করে দেখলুম, যমুনার ধারা নামছে বন্দরপুঁছ পর্বতের গা বেয়ে। মহাদেবের ত্রিশূলের মতো তিনটি ধারা এসে মিলিত হয়েছে যমুনোত্তরীতে। তার পর পাঞ্জাবের উপর দিয়ে পাণিপথ প্রান্তরের পূর্ব দিয়ে দিল্লীর গা ঘেঁষে বৃন্দাবনের পা ধুইয়ে আগ্রার মনোহরণ করে নেমে আসছে। একদা আরও একটি শহর ছিল যমুনার তীরে। তার নাম কৌশাম্বী। আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এলাহাবাদে নামলে আমিও কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না! সেই যমুনার ধারা কি আমার জীবনের উপর দিয়েও বয়ে যাবে না? স্বাতি আমাকে পরিত্যাগ করবে ঘৃণায়। আদর্শভ্রষ্ট পুরুষকে সে তো ঘৃণাই করে। মামীও আমার মুখ দর্শন করবেন না। মামার সংস্কারে তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস। অভিশপ্ত পরিবারভুক্ত হয়ে আমার জীবন যে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তাতে তাঁদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বদলে কিছু পাবও—অর্থ, প্রতিপত্তি, হয়তো মিত্রাকেও পাব। আর পাব একটা কৃত্রিম জীবন।

যদি না নামি, যদি এ সমস্তকে অস্বীকার করে চলে যাই, তা হলে কী পাব জানি নে। কিছুই কি পাব না?

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। গাড়ি এসে এলাহাবাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। কত লোক উঠছে কত নামছে, সে দিকে আমার দৃষ্টি গেল না। আমার শরীরে আর যেন শক্তি নেই, বেঞ্চির সঙ্গে সেঁটে গেছে দুর্বল দেহটা। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে, চারি দিকে চেয়ে কোনখান থেকে কোন ভরসা পেলুম না।

দিল্লীতে গাড়ি ছাড়বার আগে স্বাতি যেন কী বলেছিল? মনে আসছে না। কিন্তু কেন মনে আসছে না? ভাল লেগেছিল সেই কথাটি। মনে হয়েছিল, আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি, ভবিষ্যতের সমস্যা আমার সরল হয়ে গেছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কাজের সময়েই তা ভুলে গেলুম! ডায়েরিতে কেন লিখে রাখলুম না! এমন প্রয়োজনীয় কথা কি কেউ না লিখে রাখে!

বড় কর্কশ শব্দে স্টেশনের ঘণ্টা পড়ল। বাঁশি বাজল। আবার ঘণ্টা, আবার বাঁশি। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলুম। এলাহাবাদের আলোকিত প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন আবার অন্ধকারে যাত্রা শুরু করল। একেবারে অন্ধকার নয়। এখানে ওখানে আলো ছড়িয়ে আছে। আলো জ্বলছে নিচের রাস্তায়। রাস্তার লোক চলাচল একেবারে শেষ হয় নি। হঠাৎ মনে হল, আমার হৃৎপিণ্ডটা একেবারে থেমে যায় নি। অল্প ক্ষণের জন্য হয়তো একটু থেমে গিয়েছিল, গাড়ির সঙ্গে সে যন্ত্রটাও এখন চলছে।

শব্দ করে ট্রেন উঠল লোহার পুলে। যমুনার পুল। শেষ পুল যমুনার উপর। আর একটু এগিয়ে যমুনা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু আমি কি যমুনার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি?

জানালা দিয়ে বাহিরটা দেখবার চেষ্টা করলুম। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে যমুনার জলে। কালিন্দী যমুনা! ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। কত জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আমার জানা নেই। আমারও উপর দিয়ে বইত। আমি কি পালিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালুম!

তবে আমি এলাহাবাদের টিকিট কেন কেটেছিলুম? ভয় তো আগেই আমার পাওয়া উচিত ছিল। ভয় পেয়েই যদি পালিয়ে যাব তো আগেই কেন মন স্থির করলুম না!

স্বাতি ঠিকই বলেছিল। নিজের কর্তব্য স্থির করতে বড় বেশি দেরি হয় আমার। দিল্লীর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি আপত্তি করেছিলুম: কোথায় দেরি হল?

এর উত্তরে স্বাতি শুধুই হাসল। সে যেন আজ অকারণে হাসছে!

ট্রেন ছাড়তে তখন আর দেরী ছিল না। মামা মামীকে প্রণামটা আমি সেরে নিলুম।

স্বাতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে বললুম: তুমি কিছু বলবে না?

স্বাতি হাসল।

হাসি নয় স্বাতি, তোমার কি কিছুই বলবার নেই? কিছু জানবার, কিছু শোনবার—

এর উত্তরেও স্বাতি হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি।

আমি তার মুখের দিকে চাইলুম।

অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি জবাব দিল: গোপালদা, তোমার মন কি কোন কথা দেয় নি আমার মনের কাছে, যে আজও আমার মুখের কথার প্রয়োজন আছে!

কী আশ্চর্য! চাওলাও যে এই কথাই বলেছে। এরা কি আমার

কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিত্তাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গল-গিরতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বে তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিনিচপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্নকুলম কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে **কর্ণাটক** রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল **হায়দ্রাবাদে**। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লীমথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জীর সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারপই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউসবোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে— সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাংলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত

বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব···

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

মরুভারত পর্বে ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপরে আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর **কিষ্কিন্ধ্যা পর্বে** রামায়ণের যুগ থেকে শুরু করে বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত হায়দ্রাবাদের গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে বিদর, বিজাপুর ও গুলবর্গার ইতিহাস, বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গুহামন্দিরের পরিচয় এবং প্রাচীন বিদর্ভের পৌরাণিক কথাও আলোচিত হয়েছে।

অরণ্য পর্বে সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চলের কথা আলোচিত হয়েছে দাক্ষিণ ভারতের অরণ্য ভ্রমণের পথে। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও কুর্গের অধিবাসী কোডাভাদের জীবন চিত্র এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক